Presented to the Asiatic Library by Mr. S. K. Roy, Regt. Superintendent

Banga
891.4405
S118P

সবুজ পত্র

ঘরে-বাইরে

মাগো, আজ মনে পড়চে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লাল-পেড়ে সাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেচি আমার চিত্তাকাশে ভোর-বেলাকার অরুণরাগ-রেখার মত। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মত ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখ্‌ল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সেই যে উষা-সতীর দান, দুর্য্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?

আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্ব্বকে লজ্জা দিত।

3963.
THE ASIATIC SOCIETY 5.11.66 CALCUTTA-16

আমি মায়ের মত দেখ্‌তে এই কথা সকলে বলে। তা নিয়ে ছেলেবেলায় একদিন আয়নার উপর রাগ করেচি। মনে হত আমার সর্ব্বাঙ্গে এ যেন একটা অন্যায়,—আমার গায়ের রং এ যেন আমার আসল রং নয়, এ যেন আর কারো জিনিষ, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

সুন্দরী ত নই কিন্তু মায়ের মত যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম। বিবাহ সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুর-বাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল,—এ মেয়েটি সুলক্ষণা, এ সতী-লক্ষ্মী হবে।—মেয়েরা সবাই বল্লে, তা হবেই ত, বিমলা যে ওর মায়ের মত দেখতে।

রাজার ঘরে আমার বিয়ে হল। তাঁদের কোন্ কালের বাদসাহের আমলের সম্মান। ছেলেবেলায় রূপকথায় রাজপুত্রের কথা শুনেছি,—তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল।—রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একাগ্রমনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কি চোখ, কি নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মত—যেমন কালো, তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখ্‌লুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন কি, তাঁর রং দেখ্‌লুম আমারি মত। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সঙ্কোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় না হয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখ্‌তে পেলুম না কেন?

কিন্তু রূপ যখন চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয় সেই বুঝি ভালো। তখন সে যে ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়—সেখানে তাকে কোনো সাজ করে আস্‌তে হয় না। ভক্তির আপন সৌন্দর্য্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেচি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে ক্যাওরা জলের ছিটে দেওয়া কাপড়ের টুক্‌রোয় আলাদা জড়িয়ে রাখ্‌তেন, তিনি খেতে বস্‌লে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষীর হাতের আদর, তাঁর সেই হৃদয়ের সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।

সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না? ছিল। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্বনির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর। সমস্ত জীবনকে যদি জীবনবিধাতার মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি স্তব-গান করে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ করেছিল।

মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধূলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মত জ্বলে উঠ্‌ল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বল্লেন, ওকি বিমল, করচ কি? আমার সে লজ্জা ভুল্‌তে পারব না। তিনি হয় ত ভাবলেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জ্জন করচি। কিন্তু নয়, নয়, সে আমার পুণ্য

নয়,—সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়।

আমার শ্বশুর পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা কানুন মোগল পাঠানের, কতক বিধিবিধান মনু পরাশরের। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে। এ বংশে তিনিই প্রথম রীতিমত লেখাপড়া শেখেন, আর এম, এ, পাশ করেন। তাঁর বড় দুই ভাই মদ খেয়ে অল্পবয়সে মারা গেছেন—তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই—এ বংশে এটা এত খাপছাড়া যে, সকলে এতটা পছন্দ করে না, মনে করে যাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই অত্যন্ত নির্ম্মল হওয়া তাদেরই সাজে; কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

বহুকাল হল আমার শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যু হয়েছে। আমার দিদিশাশুড়ীই ঘরের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁর বক্ষের হার, তাঁর চক্ষের মণি। এই জন্যেই আমার স্বামী কায়দার গণ্ডি ডিঙিয়ে চল্‌তে সাহস করতেন। এই জন্যেই তিনি যখন মিস্ গিল্‌বিকে আমার সঙ্গিনী আর শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত রস বিষ হয়ে উঠ্‌ল, তবু আমার স্বামীর জেদ বজায় রইল।

সেই সময়েই তিনি বি, এ, পাশ করে এম্ এ পড়ছিলেন। কলেজে পড়বার জন্যে তাঁকে কলকাতায় থাক্‌তে হত। তিনি প্রায় রোজই আমাকে একটি করে চিঠি লিখ্‌তেন, তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল

গোল অক্ষরগুলি যেন স্নিগ্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকৃত।

একটি চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম, আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম। তখন আমার সেই রূপকথার রাজপুত্র অরুণালোকে চাঁদের মত মিলিয়ে গেছে। সেদিন আমার সত্যকার রাজপুত্র বসেছে আমার হৃদয়সিংহাসনে। আমি তাঁর রাণী, তাঁর পাশে আমি বসতে পেরেচি; কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ—তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান।

আমি লেখাপড়া করেছি সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিত্বের মত শোনাচ্চে। এ কালের সঙ্গে যদি কোনো একদিন আমার মোকাবিলা না হত তাহলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম—মনে জানতুম মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘরগড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেমনি-সহজ কথা—এর মধ্যে বিশেষ কোনো একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য্য আছে কিনা সেটা এক মুহূর্ত্তের জন্যে ভাববার দরকার নেই।

কিন্তু সেই কিশোর বয়স থেকে আজ এই যৌবনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে আরএক যুগে এসে পড়েছি। যেটা নিশ্বাসের মত সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মত করে গড়ে তোলবার উপদেশ আসচে। এখনকার ভাবুক

পুরুষেরা, সধবার পাতিব্রত্য এবং বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে যে কি অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বল্‌চেন। তার থেকে বোঝা যাচ্চে জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে?

মেয়ে মানুষের মন সবই যে এক ছাঁচে ঢালা তা আমি মনে করিনে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিষটি ছিল—সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজভাব তা আজকের স্পষ্ট বুঝতে পারচি যখন সেটা বাইরের দিক্ থেকে আর সহজ নেই।

এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিল তাঁর মহত্ত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।

কিন্তু এত সেবা আমার জন্যে কেন? সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিষপত্রের মধ্যে দিয়ে যেন আমার দুই কূল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে বইল। এই সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন্ ফাঁকে? আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল। প্রেম যে স্বভাব-বৈরাগী, সে যে পথের ধারে ধূলার পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে ত বৈঠকখানার চিনের টবে আপনার ঐশ্বর্য্য মেলতে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরে যে সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিল আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেল্‌তে পারতেন না। দিনে-দুপরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হতে পারত না। আমি জান্‌তুম ঠিক কখন তিনি আস্‌বেন—তাই যেমন তেমন এলোমেলো হয়ে আমাদের মিলন ঘটতে পারত না। আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল—সে আসৃত ছন্দের ভিতর দিয়ে যতির ভিতর দিয়ে। দিনের কাজ সেরে, গা ধুয়ে, যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদূরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো সাড়িটি পরে, ছড়িয়ে-পড়া দেহমনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম। সেই সময়টুকু অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।

আমার স্বামী বরাবর বলে এসেচেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ। এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনোদিন তর্ক করিনি। কিন্তু আমার মন বলে, ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না। ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান করতে চায়। তাই, সমান হতে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়—কোনোদিন তা চুকে গিয়ে হেলার জিনিষ হয়ে ওঠে না। প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা আরতির আলোর মত,—পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুইয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে। আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা করেই পূজিত হয়—নইলে সে ধিক্, ধিক্! আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন

জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে—প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাওনি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাইনি তা দিয়ে ভালোবেসেছ,—আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়েনি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি;—আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এম্‌নি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য। এতে আমার মনে গর্ব্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারি ঐশ্বর্য্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রাণীর সিংহাসনে বসে মানের দাবী করি, সে দাবী কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্ব্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শঙ্কর ত ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন?

আজ মনে পড়চে সেদিন আমার সৌভাগ্যে সংসারে কত লোকের মনে কত ঈর্ষ্যার আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছিল। ঈর্ষ্যা হবারই ত কথা—আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি।

কিন্তু ফাঁকি ত বরাবর চলে না,—দাম দিতেই হবে নইলে বিধাতা সহ্য করেন না—দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হয় তবেই স্বত্ব ধ্রুব হয়ে ওঠে। ভগবান আমাদের দিতেই পারেন কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। পাওয়া জিনিষও আমরা পাইনে এমনি আমাদের পোড়া কপাল!

আমার সৌভাগ্যে কত কন্যার পিতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল। আমার কি তেম্‌নি রূপ, তেমনি গুণ, আমি কি এই ঘরের যোগ্য, এমন কথা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে উঠেচে। আমার দিদিশাশুড়ি, শাশুড়ি সকলেরই অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিল। আমার দুই বিধবা জায়ের মত এমন সুন্দরী দেখা যায় না। পরে পরে যখন তাঁদের দুজনেরই কপাল ভাঙল তখন আমার দিদিশাশুড়ি পণ করে বস্‌লেন যে তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর রূপসীর খোঁজ করবেন না। আমি কেবলমাত্র সুলক্ষণের জোরে এই ঘরে প্রবেশ করতে পারলুম—নইলে আমার আর কোনো অধিকার ছিল না।

আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই না কি এখানকার নিয়ম, তাই, মদের ফেনা আর নটীর নূপুর-নিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড় ঘরের ঘরণীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী মদও ছুঁলেন না, আর নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে ফিরলেন না এ কি আমার গুণে? পুরুষের

উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত মনকে বশ করবার মত কোন্ মন্ত্র বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন? কেবলমাত্রই কপাল—আর কিছুই না! আর তাঁদের বেলাতেই কি পোড়া বিধাতার হুঁস ছিল না—সকল অক্ষরই বাঁকা হয়ে উঠ্‌ল! সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল—কেবল রূপ-যৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিছে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল! কোথাও সঙ্গীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা।

আমার স্বামীর পৌরুষকে তাঁর দুই ভাজ অবজ্ঞা করবার ভান করতেন। এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো? কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি! আমি যেন আমার স্বামীর সোহাগ কেবল চুরি করে করে নিচ্চি। কেবল ছলনা, তার সমস্তই কৃত্রিম; এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা! আমার স্বামী আমাকে হালফেশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন—সেই সমস্ত রং বেরংঙের জেকেট সাড়ী শেমিজ পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বল্‌তে থাক্‌তেন। রূপ নেই, রূপের ঠাট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুল্লে গো—লজ্জা করে না!

আমার স্বামী সমস্তই জান্‌তেন। কিন্তু মেয়েদের উপর যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরা। তিনি আমাকে বারবার বল্‌তেন রাগ কোরো না!—মনে আছে আমি একবার তাঁকে বলেছিলুম, মেয়েদের মন বড়ই ছোট, বড় বাঁকা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীন দেশের মেয়েদের পা যেমন ছোট, যেমন বাঁকা! সমস্ত সমাজ যে চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোট করে

খাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলচে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে!

আমার জা'রা তাঁদের দেওরের কাছে যা দাবী করতেন তাই পেতেন। তাঁদের দাবী ন্যায্য কি অন্যায্য তিনি তার বিচারমাত্র করতেন না। আমার মনের ভিতরটা জ্বল্‌তে থাক্‌ত যখন দেখ্‌তুম তাঁরা এর জন্যে একটুও কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এমন কি, আমার বড় জা, যিনি জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ঙ্কর সাত্বিক, বৈরাগ্য যাঁর মুখে এত বেশি খরচ হত যে মনের জন্যে সিকি পয়সার বাকি থাকত না,—তিনি বারবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তেন, যে, তাঁকে তাঁর উকিল দাদা বলেছেন যদি আদালতে তিনি নালিশ করেন তাহলে তিনি—সে কত কি সে আর ছাই কি লিখ্‌ব। আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে, কোনোদিন কোনো কারণেই আমি এঁদের কথার জবাব করব না, তাই জ্বালা আরো আমার অসহ্য হত। আমার মনে হত, ভালো হবার একটা সীমা আছে—সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। আমার স্বামী বল্‌তেন আইন কিম্বা সমাজ তাঁর ভাজেদের স্বপক্ষ নয় কিন্তু একদিন স্বামীর অধিকারে যেটাকে নিজের বলেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মত পরের মন জুগিয়ে চেয়ে চিন্তে নিতে হচ্চে এ অপমান যে বড় কঠিন। এর উপরেও আবার কৃতজ্ঞতা দাবি করা? মার খেয়ে আবার বখশিশ দিতে হবে?—সত্য কথা বল্‌ব? অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর একটু মন্দ হবার মত তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।

আমার মেজ জা অন্য ধরণের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প—তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্ত্তা হাসি-ঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না—কেননা এবাড়ির ঐ রকমই দস্তুর। আমি বুঝতুম, আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য। তাই তাঁর দেওরের যাতায়াতের পথে ঘাটে নানারকম ফাঁদ পেতে রাখতেন। এই কথাটা কবুল করতে আমার সব চেয়ে লজ্জা হয় যে, আমার অমন স্বামীর জন্যেও মাঝে মাঝে আমার মনে ভয়-ভাবনা ঢুকত। এখানকার হাওয়াটাই যে ঘোলা—তার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ জিনিষকেও স্বচ্ছ বোধ হয় না। আমার মেজ জা মাঝে মাঝে এক-একদিন নিজে রেঁধে বেড়ে দেওরকে আদর করে খেতে ডাক্‌তেন। আমার ভারি ইচ্ছে হত, তিনি কোনো ছুতো করে বলেন, না, আমি যেতে পারব না।—যা মন্দ তার ত একটা শাস্তি পাওনা আছে। কিন্তু ফি বারেই যখন তিনি হাসিমুখে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতেন আমার মনের মধ্যে একটু কেমন—সে আমার অপরাধ—কিন্তু কি করব, আমার মন মান্‌ত না—মনে হত এর মধ্যে পুরুষ মানুষের একটু চঞ্চলতা আছে। সে সময়টাতে আমার অন্য সহস্র কাজ থাক্‌লেও কোনো একটা ছুতো করে আমার মেজ জায়ের ঘরে গিয়ে বস্‌তুম। মেজ জা হেসে হেসে বল্‌তেন, বাস্‌রে, ছোটরাণীর একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই—একেবারে কড়া পাহারা! বলি,

আমাদেরও ত একদিন ছিল, কিন্তু এত করে আগলে রাখ্‌তে শিখিনি।

আমার স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখ্‌তেন, দোষ দেখতে পেতেন না। আমি বল্‌তুম, আচ্ছা, না হয়, যত দোষ সবই সমাজের, কিন্তু অত বেশি দয়া করবার দরকার কি। মানুষ না হয় কিছু কষ্টই পেলে, তাই বলেই কি—কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারবার জো নেই। তিনি তর্ক না করে একটুখানি হাস্‌তেন। বোধ হয় আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু তাঁর অজানা ছিল না। আমার রাগের সত্যিকার ঝাঁজটুকু সমাজের উপরেও না, আর কারো উপরেও না, সে কেবল—সে আর বল্‌ব না।

স্বামী একদিন আমাকে বোঝালেন—তোমার এই যে-সমস্তকে ওরা মন্দ বল্‌চে যদি সত্যিই এগুলিকে মন্দ জান্‌ত তাহলে এতে ওদের এত রাগ হত না।

তাহলে এমন অন্যায় রাগ কিসের জন্যে?

অন্যায় বলব কেমন করে? ঈর্ষ্যা জিনিষটার মধ্যে একটি সত্য আছে সে হচ্চে এই যে, যা কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।

তা, বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করলেই হয় আমার সঙ্গে কেন?

বিধাতাকে যে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

তা ওঁরা যা পেতে চান তা নিলেই হয়। তুমি ত বঞ্চিত করতে চাওনা। পরুন না সাড়ি জ্যাকেট গয়না জুতো মোজা, মেমের কাছে পড়তে চান ত সে ত ঘরেই আছে, আর বিয়েই যদি করতে চান তুমি ত বিদ্যেসাগরের মত অমন সাতটা সাগর পেরতে পার তোমার এমন সম্বল আছে!

ঐ ত মুস্কিল—মন যা চায় তা হাতে তুলে দিলেও নেবার জো নেই।

তাই বুঝি কেবল ন্যাকামি করতে হয় যেন যেটা পাইনি সেটা মন্দ, অথচ অন্য কেউ পেলে সর্ব্বশরীর জ্বলতে থাকে!

যে মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই সে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌তে চায়—ঐ তার সান্ত্বনা।

যাই বল তুমি, মেয়েরা বড় ন্যাকা! ওরা সত্যি কথাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।

তার মানে ওরা সব চেয়ে বঞ্চিত।

·

এমনি করে উনি যখন বাড়ির মেয়েদের সব রকম ক্ষুদ্রতাই উড়িয়ে দিতেন আমার রাগ হত। সমাজ কি হলে কি হতে পারত সে সব কথা কয়ে ত কোনো লাভ নেই কিন্তু পথেঘাটে চারদিকে এই যে কাঁটা গজিয়ে রইল, এই যে বাঁকা কথার টিটকারি, এই যে পেটে এক মুখে এক, এ'কে দয়া করতে পারা যায় না।

সে কথা শুনে তিনি বল্লেন, যেখানে তোমার নিজের একটু কোথাও বাজে সেইখানেই বুঝি তোমার যত দয়া—আর যেখানে ওদের জীবনের এপিঠ ওপিঠ ফুঁড়ে সমাজের শেল বিঁধেছে সেখানে দয়া করবার কিছু নেই? যারা পেটেও খাবেনা তারাই পিঠেও সইবে?

হবে, হবে, আমারি মন ছোট! আর সকলেই ভালো কেবল আমি ছাড়া! রাগ করে বল্লুম, তোমাকে ত ভিতরে থাক্‌তে হয়

না, সব কথা জান না।—এই বলে আমি তাঁকে ও মহলের একটা বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করতেই তিনি উঠে পড়লেন, বল্লেন, চন্দ্রনাথ বাবু অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছেন।

আমি বসে বসে কাঁদতে লাগ্‌লুম। স্বামীর কাছে এমন ছোট প্রমাণ হয়ে গেলে বাঁচি কি করে? আমার ভাগ্য যদি বঞ্চিত হত তাহলেও আমি যে কখনো ওদের মত এমনতর হতুম না সেত প্রমাণ করবার জো নেই।

দেখ, আমার এক একবার মনে হয় রূপের অভিমানের সুযোগ বিধাতা যদি মেয়েদের দেন তবে অন্য অনেক অভিমানের দুর্গতি থেকে তারা রক্ষা পায়। হীরে জহরতের অভিমান করাও চল্‌ত কিন্তু রাজার ঘরে তার কোনো অর্থই নেই। তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের। সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে এটা আমার মনে ছিল। কিন্তু যখনি সংসারের কোনো খিটিমিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেছি তখনি বারবার এমন ছোট হয়ে গেছি যে সে আমাকে মেরেচে। তাই তখন আমি তাঁকেই উল্টে ছোট করতে চেয়েচি। মনে মনে বলেচি, তোমার এসব কথাকে ভালো বলে মান্‌ব না, এ কেবলমাত্র ভালোমানুষী। এ ত নিজেকে দেওয়া নয়, এ অন্যের কাছে ঠকা।

২

আমার স্বামীর বড় ইচ্ছা ছিল আমাকে বাইরে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বল্লুম, বাইরেতে আমার দরকার কি?

তিনি বল্লেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাক্‌তে পারে।

আমি বল্লুম, এতদিন যদি তার চলে গিয়ে থাকে আজো চল্‌বে, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে না।

মরে ত মরুক না, সে জন্যে আমি ভাবচিনে—আমি আমার জন্যে ভাবচি।

সত্যি নাকি, তোমার আবার ভাবনা কিসের?

আমার স্বামী হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। আমি তাঁর ধরণ জানি, তাই বল্লুম, না, অমন চুপ করে ফাঁকি দিয়ে গেলে চল্‌বে না, এ কথাটা তোমার শেষ করে যেতে হবে।

তিনি বল্লেন, কথা কি মুখের কথাতেই শেষ হয়? সমস্ত জীবনে কত কথা শেষ হয় না।

না, তুমি হেঁয়ালি রাখ, বল।

আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকি আছে।

কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কম্‌তি হল কোথায়?

এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে,—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েচ তাও জাননা।

খুব জানি গো খুব জানি!

মনে করচ জানি, কিন্তু জান কি না তাও জান না।

দেখ তোমার এই কথাগুলো সইতে পারিনে।

সেই জন্যেই ত বল্‌তে চাইনি।

তোমার চুপ করে থাকা আরো সইতে পারিনে।

তাই ত আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না চুপও করব

না, তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকন্নাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হওনি আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।

পরিচয় তোমার হয় ত বাকি থাক্‌তে পারে কিন্তু আমার কিছুই বাকি নেই।

বেশ ত, আমারি যদি বাকি থাকে সেটুকু পূরণ করেই দাওনা কেন?

একথা নানা রকম আকারে বারবার উঠেছে। তিনি বল্‌তেন, যে পেটুক মাছের ঝোল ভালোবাসে সে মাছকে কেটেকুটে সাঁৎলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভরতি করতে চায় না—সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে ত ভালো, না পারে ত ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে,—তারপরে যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি কিন্তু নিজের সখের বা সুবিধার জন্যে তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করি নি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

এ সব কথা আমার একেবারেই ভালো লাগ্‌ত না কিন্তু সেই জন্যেই যে তখন বের হই নি তা নয়। আমার দিদি-শাশুড়ি তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর অমতে আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর প্রায় বিশ আনা দিয়েই ঘর ভরতি করে তুলেছিলেন, তিনিও

৩
৩৭৫৫
5.11.66

সয়েছিলেন; রাজবাড়ির বউ যদি পর্দ্দা ঘুচিয়ে বাইরে বেরত, তা হলেও তিনি সইতেন;—তিনি নিশ্চয় জান্‌তেন এটাও একদিন ঘটবে—কিন্তু আমি ভাবতুম এটা এতই কি জরুরি যে তাঁকে কষ্ট দিতে যাব। বইয়ে পড়েচি আমরা খাঁচার পাখী কিন্তু, অন্যের কথা জানি নে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেচে যে বিশ্বেও তা ধরে না! অন্তত তখন ত সেই রকমই ভাবতুম।

আমার দিদিশাশুড়ি যে আমাকে এত ভালবাস্‌তেন তার গোড়ার কারণটা এই, যে, তাঁর বিশ্বাস আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা টান্‌তে পেরেছিলুম সেটা যেন কেবল আমারি গুণ, কিংবা আমার গ্রহ নক্ষত্রের চক্রান্ত। কেন না, পুরুষমানুষের ধর্ম্মই হচ্চে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া। তাঁর অন্য কোনো নাতীকে তাঁর নাতবৌরা সমস্ত রূপযৌবন নিয়েও ঘরের দিকে টান্‌তে পারে নি—তাঁরা পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারলে না। তাঁদের ঘরে পুরুষ মানুষের এই মরণের আগুন আমিই নেবালুম এই ছিল তাঁর ধারণা। সেই জন্যেই তিনি আমাকে যেন বুকে করে রেখেছিলেন—আমার একটু অসুখ বিসুখ হলে তিনি ভয়ে কাঁপতেন। আমার স্বামী সাহেবের দোকান থেকে যে সমস্ত সাজসজ্জা এনে সাজাতেন সে তাঁর পছন্দসই ছিল না কিন্তু তিনি ভাবতেন, "পুরুষ মানুষের এমন কতকগুলো সখ্‌ থাকবেই যা নিতান্ত বাজে, যাতে কেবলি লোকসান। তাকে ঠেকাতে গেলেও চলবে না অথচ সে যদি সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত না পৌঁছয় তবেই রক্ষে। আমার নিখিলেশ বউকে যদি না সাজাত আর কাউকে সাজাতে যেত।" এইজন্যে ফি বারে যখন আমার

জন্যে কোনো নতুন কাপড় আসত তিনি তাই নিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে কত ঠাট্টা কত আমোদ করতেন। হতে হতে শেষকালে তাঁরও পছন্দর রং ফিরেছিল। কলিযুগের কল্যাণে অবশেষে তাঁর এমন দশা হয়েছিল যে নাতবৌ তাঁকে ইংরিজি বই থেকে গল্প না বল্লে তাঁর সন্ধ্যা কাটত না।

দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পর আমার স্বামীর ইচ্ছা হল আমরা কলকাতায় গিয়ে থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমার মন উঠ্‌ল না। এ যে আমার শ্বশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ি কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে এ'কে এতকাল আগ্‌লে এসেচেন, আমি সমস্ত দায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কলকাতায় চলে যাই তবে যে আমাকে অভিশাপ লাগ্‌বে এই কথাই বারবার আমার মনে হতে লাগ্‌ল। দিদিশাশুড়ির শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।—সেই সাধ্বী আট বছর বয়সে এই ঘরে এসেচেন, আর উনআশি বছরে মারা গেছেন। তাঁর সুখের জীবন ছিল না। ভাগ্য তাঁর বুকে একটার পর একটা কত বানই হেনেচে কিন্তু প্রত্যেক আঘাতেই তাঁর জীবন থেকে অমৃত উছ্‌লে উঠেচে। এই বৃহৎ সংসার সেই চোখের জলে গলানো পুণ্যের ধারায় পবিত্র। এ ছেড়ে আমি কলকাতার জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে কি করব?

আমার স্বামী মনে করেছিলেন এই সুযোগে আমার দুই জায়ের উপর এখানকার সংসারের কর্ত্তৃত্ব দিয়ে গেলে তাতে তাঁদের মনেরও সান্ত্বনা হত আর আমাদেরও জীবনটা কলকাতায় একটু ডালপালা মেলবার জায়গা পেত।

আমার ঐখানেই গোল বেধেছিল। ওঁরা যে এতদিন আমাকে

হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছেন,—আমার স্বামীর ভালো ওঁরা কখনো দেখতে পারেন নি। আজ কি তারি পুরস্কার পাবেন?

আর রাজসংসার ত এইখানেই। আমাদের সমস্ত প্রজা, আমলা, আশ্রিত, অভ্যাগত, আত্মীয় সমস্তই এখানকার এই বাড়িকে চারিদিকে আঁকড়ে। কলকাতায় আমরা কে তা জানি নে, অন্য ক'জন লোকই বা জানে? আমাদের মান সম্মান ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ মূর্ত্তিই এখানে। এ সমস্তই ওঁদের হাতে দিয়ে সীতা যেমন নির্ব্বাসনে গিয়েছিলেন তেমনি করে চলে যাব? আর ওঁরা পিছন থেকে হাসবেন? ওঁরা কি আমার স্বামীর এ দাক্ষিণ্যের মর্য্যাদা বোঝেন, না, তার যোগ্য ওঁরা?

তারপরে যখন কোনো দিন এখানে ফিরে আসতে হবে তখন আমার আসনটি কি আর ফিরে পাব? আমার স্বামী বলতেন, দরকার কি তোমার ঐ আসনের? ও ছাড়াও ত জীবনের আরও অনেক জিনিষ আছে—তার দাম অনেক বেশী।—

আমি মনে মনে বল্লুম, পুরুষ মানুষ এ সব কথা ঠিক বোঝে না। সংসারটা যে কতখানি তা ওদের সম্পূর্ণ জানা নেই—সংসারের বাহির মহলে যে ওদের বাসা। এ জায়গায় মেয়েদের বুদ্ধিমতেই ওদের চলা উচিত।

সব চেয়ে বড় কথা হচ্চে একটা তেজ থাকা চাইত! যাঁরা চিরদিন এমন শত্রুতা করে এসেচেন তাঁদের হাতে সমস্ত দিয়ে-থুয়ে চলে যাওয়া যে পরাভব। আমার স্বামী যদি বা তা মানতে চান আমি ত মানতে দিতে পারব না। আমি মনে মনে জানলুম এ আমার সতীত্বের তেজ।

আমার স্বামী আমাকে জোর করে কেন নিয়ে গেলেন না? আমি জানি কেন। তাঁর জোর আছে বলেই জোর করেন নি। তিনি আমাকে বরাবর বলে এসেচেন, স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলি মেনে চল্‌বে তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না। আমি অপেক্ষা করে থাক্‌ব আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে ত ভালো, যদি না মেলে ত উপায় কি।

কিন্তু তেজ বলে একটা জিনিষ আছে—সেদিন আমার মনে হয়েছিল ঐ জায়গায় আমি যেন আমার—না, এ কথা আর মুখে আনাও চলবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার গান

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করেনি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে,
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।
বাসা নাই নাইক সঞ্চয়,
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইক নিশ্চয়।

যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,
আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি-আমি

যেদিন তুমি আপ্‌নি ছিলে একা
আপ্‌নাকে ত হয়নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিলনা পথ-চাওয়া,
এপার হতে ওপার চেয়ে
বয়নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।

আমি এলেম, কাঁপ্‌ল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন মরণ তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই ত তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোম্‌টা পড়ে রয়,—
দেখতে তোমায় বাধে বলে' পড়ে চোখের জল।
ওগো আমার প্রভু,
জানি আমি তবু
আমায় দেখবে বলে' তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে ত এই সূর্য্যতারা সকলি নিষ্ফল॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডায়ারি

[পঁচিশ বছর পূর্ব্বেকার একখানি ডায়ারির কয়েকটি পাতা আমার হাতে পড়িয়াছে। তখনকার দিনের একজন কলেজের ছাত্রের লেখা। সবুজ পত্রের সম্পাদকের দরবারে এই পাতা কয়খানি দাখিল করিলাম। আমার মতে ছাপার অক্ষরে ইহা প্রকাশ করা যাইতে পারে। একটা প্রধান কারণ এই, ছাপিবার জন্য ইহা লেখা হয় নাই।

নবীন জীবনের একটা ব্যাকুলতা ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। সেইটে একটু ঠাহর করিয়া দেখিবার বিষয়। আনন্দের চাঞ্চল্যই যে যৌবনের একমাত্র লক্ষণ তাহা নহে, তাহার সঙ্গে বিষাদের গাঢ়তাও আছে। ভিতরকার শক্তিগুলি যখন একরকম অস্পষ্টভাবে বাহিরের আলোর একটা ডাক শুনিয়াছে অথচ তার অর্থ বোঝে নাই; যখন তারা আপনার ভিতরে প্রাণের তাগিদ পাইয়াছে অথচ আপনার পরিচয় পায় নাই; যখন তারা বীজকে দুইখানা করিয়াছে অথচ মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে নাই, তখন সেই আলো আঁধারের দ্বন্দ্বের অবস্থায় একটা বিষাদের ঘোর ঘনাইয়া ওঠে। এটা কেবলমাত্র অনির্দ্দিষ্টতার বিষাদ।

নবযৌবনের প্রথম আবেগে কিছু একটা করিবার জন্য যখন আমাদের মধ্যে বেদনা জাগে; অথচ যখন কিছু একটা করিবার অভিজ্ঞতাও নাই উপকরণও নাই, কেবলমাত্র করিবার উদ্যম আছে,—সেই সময়ে নূতন সাঁতার শেখার হাত পা ছোঁড়ার মত আমাদের কথা এবং কাজে আতিশয্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই সময়ে আমরা পরের নকল করিতে যাই, আপনাকে অন্য কেহ বলিয়া কল্পনা করি, এবং এতদিনের মুখস্থ করা পুঁথির তালে পা ফেলিতে গিয়া পদে পদে বেতালা হইয়া উঠি।

অন্য দেশের যুবকদের সাম্‌নে হাজার রাস্তা খোলা আছে। জীবনের ক্ষেত্র কোথায় তাহা তাহাদিগকে খুঁজিতে হয় না। আর এক মস্ত সুবিধা

এই যে, যাহারা ভাবিয়াছে, বুঝিয়াছে, পাইয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা চারিদিকেই। তাই ভাব, কথা ও কাজের ওজন বুঝিতে দেরি হয় না। অযথা বাড়াবাড়ি করিতে গেলে চারিদিকেই ঠেকিতে হয়। আমাদের দেশে যৌবনের উদ্যম বিধাতা দিয়াছেন, কিন্তু কাজের পন্থা মানুষে তৈরি করে নাই। কি সমাজতন্ত্রে, কি রাজ্যতন্ত্রে, আমাদের চেষ্টার পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাহাতে বুদ্ধি এবং শক্তি খাটাইবার জায়গা পাই না। সমাজে হাজার বছরের পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া কিছুই করিবার নাই, সমাজের বাহিরে কেবল গোটাকতক চাকুরির পথ আমাদের অভ্যস্ত পথ। তাই আমাদের দেশ প্রৌঢ়দেরই পক্ষে সুখের ;—বাঁধা অভ্যাসের আরামের মধ্যে গট্ হইয়া বসিয়া সমস্ত নবীনতার চাঞ্চল্যকে ধিক্কার দিবার পক্ষে এ দেশের হাওয়া অনুকূল। জগতের নিয়মে যৌবনটা এ দেশেও আসে, কিন্তু কোথায় যে তার স্থান তাহা খুঁজিয়া পায় না। বুঝিতে পারে সে ভুল করিয়াছে। তাই যত শীঘ্র পারে বৃদ্ধ হইয়া উঠিয়া ভ্রম সংশোধনের চেষ্টায় থাকে।

এই ডায়ারি পড়িলে বুঝিতে পারিব যুবকের যে শক্তি স্বভাবতঃই বাহিরের দিকে সার্থকতা খোঁজে, তাহা প্রতিহত হইয়া নিজের মধ্যে কেবলই পাক খাইয়া বেড়াইতেছে। নিজেকে নানা দিকে নানা চেষ্টায় যাচাই করিয়া নিজের দর বুঝিবার উপায় নাই বলিয়া যৌবনের উদ্যম আত্মপরিচয়ের অস্পষ্টতার মধ্যে বিকার পাইতে থাকে। আমাদের দেশের যুবকদের এই দুঃখ এবং এই বিপদ। এই ডায়ারির মধ্যে আমাদের দেশের যৌবনের মনস্তত্ত্বের সেই আভাস অকৃত্রিম আকারে পাওয়া যাইবে বলিয়া সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করিলাম।]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ই অগষ্ট, ১৮৯০।

আবার ডায়ারি লিখিব মনে করিয়াছি। দাসীসঙ্কুল অন্তঃপুর-ঘেঁসা ঘরে বসিয়া কিছু লেখা বড় কঠিন, তাই পূর্ব্বে বিশেষ ইচ্ছা থাকা সত্বেও কিছু লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। এক বৎসর

পূর্ব্বে আমি যেরূপ ছিলাম, তাহা হইতে এখন আমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। এখন আর আগের মত অকারণ মনের অশান্তি এবং অসুখ ততটা নাই। হৃদয় মন অনেকটা সুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আগে শান্তির জন্য লালায়িত হইতাম। এখন মনে হয় শান্তি অপেক্ষা সুখ ভাল। যখন জগতের সকলই অনিত্য মনে হয়, হৃদয়ের প্রিয় আকাঙ্ক্ষাসকল মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, অতিজগৎকে মরীচিকাস্বরূপ মনে হয়; যখন, জগতে যাহা কিছু আমাদের নিকট সুন্দর, মহান এবং প্রিয় বলিয়া মনে হয়, সে সকলের প্রতিষ্ঠাভূমি খুঁজিয়া পাই না,—তখনই আমরা জগৎজোড়া নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়ি, এবং মনের অস্থিরতা ও হৃদয়ের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য কত না উপায় অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই। দুঃখকে ফাঁকি দেওয়াই তখন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়, সুখের কথা ভাবিবার অবকাশমাত্রও হয় না। কোনও প্রকারে শান্তি লাভ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাই। সুখের বিষয় এরূপ মনের ভাব চিরস্থায়ী নহে। অন্ধকারের পর আলোক দেখা দেয়। সংসার সময়ে সময়ে মায়াময় বলিয়া মনে হয়, আবার কখনও বা সত্যস্বরূপ মনে হয়।

১৫ই মে, ১৮৯১।

অনেকের পক্ষে ডায়ারি লেখা অভ্যাসটা অত্যন্ত ক্ষতি-জনক। যাহারা নিজের সামান্য মনের ভাবকে বাহিরের জিনিষ অপেক্ষা অধিক আদর, অধিক প্রাধান্য দেয়, যাহাদের মনের

গঠন সঙ্কীর্ণ,—নিজেকে ছাড়িয়া অপরের দিকে যাইতে যাহাদের মন স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক, সেরূপ লোকদের পক্ষে ডায়ারি লেখার অর্থ,—সকল প্রকার চিন্তা ও উদার মনের ভাব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার ক্ষুদ্রতাকেই প্রধান করিয়া তোলা। এরূপ লোকেদের যাহাতে করিয়া নানা বিষয়ে interest জন্মায়, বহুলোকের প্রতি কিম্বা নূতন নূতন ভাবের প্রতি অনুরাগ হয়, হৃদয় মনের প্রসারতা লাভ হয়, সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। কিন্তু মনের কথা লিপিবদ্ধ করিবার অভ্যাসটা ঠিক সেরূপ কার্য্য নহে। আমার নিজের বিশ্বাস আমি নিজসম্বন্ধে ছোটখাট বিষয়ের চিন্তাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। যদি বড়-রকম কোন সুখ কিম্বা কোন দুঃখ আমার থাকে, তাহা হইলেও আমি আজ পর্য্যন্ত সে বিষয় কিছু আপনার নিকটও স্পষ্ট করিয়া বলিতে শিখি নাই। মনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করিবার অক্ষমতাই আমার স্বভাবের বিশেষত্ব। চেষ্টা করিলে আমার চিন্তা আমি অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারি, কিন্তু হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিবার ভাষা আজ পর্য্যন্তও আমি জানি না। প্রত্যহ খানিকক্ষণ করিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিলে আমার প্রচ্ছন্ন হৃদয় যে অনাবৃত হইয়া পড়িবে, সে আশঙ্কা আমার নাই। কালিকলম দিয়া আমার হৃদয়ের একটি অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ অযথার্থ ছবি আঁকিবার আমার ইচ্ছাও নাই, অথচ ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু করিবার শক্তিই বা কোথায়? নিজের নিজের মুখের প্রতিকৃতি আঁকা সাধারণের পক্ষে যেরূপ সহজ, হৃদয়ের ছবি আঁকা আমার পক্ষেও তদ্রূপ।

কিন্তু তাই বলিয়া আমি যে আমাকে লইয়া ব্যস্ত নহি, তাহা নহে। হৃদয় ছাড়িয়া দিয়া আমার প্রকৃতির আর সকল অংশের প্রতি আমার মন সর্ব্বদা পড়িয়া থাকে। আমার স্বভাব কিরূপ, আমার ক্ষমতা কিরূপ, কোন কার্য্যের জন্য আমি উপযোগী, আমার চিন্তার কতটুকু শিক্ষালব্ধ এবং কতটুকুই বা স্বাভাবিক, এই সকল খাঁটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার নিয়তই বিশেষ চেষ্টা আছে। সুতরাং আমার পক্ষেও ডায়ারি লেখা নিতান্ত নিরাপদ নহে। অহং চর্চ্চা করিয়া ক্রমে হয়ত ঐ বিষয়ে আমি এত বেশি পারদর্শী হইব, যে অপর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা দিনে দিনে খর্ব্ব হইয়া আসিবে, অনভ্যাসবশতঃ নূতন বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি সহজে পরিচালিত হইতে চাহিবে না। যদি তাহাও না হয় ত অন্ততঃ এই কুফল দাঁড়াইবে যে, কি করিতে পারি তাহা নির্ণয় করিতে সময় চলিয়া যাইবে, কিছু করা হইবে না। আমার মত লোকে সর্ব্বদা এই সত্যটি ভুলিয়া যায়, যে কেবলমাত্র অন্তর্দৃষ্টিতে মানবস্বভাব জানা যায় না। কর্ম্মের ভিতর ফেলিয়া না দিলে স্বভাবের সকল দিক দেখা যায় না। অনেক-গুলি মানবশক্তি কর্ম্মেতেই কেবল প্রকাশ পায়, আবার মনের অনেকগুলি ভাব ব্যবহারিক আবশ্যকবশতঃই জাগিয়া উঠে, হৃদয়ের অনেকগুলি ভাব এই উপায়েই সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। কর্ম্মক্ষেত্রে যাচাই না করিয়া লইলে, কিরকম করিয়া মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্য অবগত হওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, জীবনের উদ্দেশ্য কি? নিজেকে ভাল করিয়া জানা, না নিজেকে শ্রেষ্ঠ করা? যতটুকুমাত্র অহং জ্ঞান নিজেকে শ্রেষ্ঠ করিবার পক্ষে

উপযোগী, ততটুকু মাত্রই লাভ করিবার চেষ্টা স্বার্থক, তাহার অতিরিক্ত জানা কেবলমাত্র বিড়ম্বনা। কিন্তু কোনও বিষয় আমি এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইব, ইহার পর আর নয়,—এ কথা বলিলে চলে না, কারণ মনের গতি এবং শক্তি সর্ব্বদাই স্বায়ত্তাধীন নহে। এই সকল কারণে, আমি কেবল যে-সকল বিষয় সর্ব্ব-সাধারণ, যাহাতে মানবমাত্রেরই সমান interest এবং অধিকার আছে, যাহা অনেকেরই পক্ষে আবশ্যক এবং একহিসাবে সকলেরই অতি নিকট, অথচ যাহা কোনও একজনের নিজসম্পত্তি নহে,—সেই সকল বিষয়ে যদি কিছু বলিবার থাকে তাহাই এই ডায়ারিবদ্ধ করিব। কিন্তু এই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে একটি কথা মনে হইতেছে। কাহারও কাহারও স্বভাব অপেক্ষা শিক্ষা ভাল, কাহারও বা ঠিক তাহার বিপরীত। শেষোক্ত ব্যক্তিরা যদি নিজের কথা বলে, তাহা হইলে তাহাতে অনেক নূতনত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। প্রথমোক্ত লোকেরা শিক্ষালব্ধ বিষয়ের আলোচনা করতেই বুদ্ধির পরিচয় দেয়। নিজের হৃদয়ের কথা না বলিলে, নিজের কিছু বিশেষত্ব আছে কি না জানা যায় না। অতএব এক সময়ে না এক সময়ে নিজের ভিতর কি আছে জানিতে চেষ্টা করা সকলেরই উচিৎ। নিজের মনকে নিজের কাছ হইতে লুকাইয়া রাখা সকল সময়ে সুবিবেচনার কার্য্য নহে।

১৮ই মে, ১৮৯১।

রাত্রি ১০ ঘটিকা

খানিকক্ষণ হ'ল বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে,—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তবু বিছানায় শুয়ে ঘুম হল না, তাই সময় কাটাবার জন্য শয্যা

ছেড়ে টেবিলে এসে লিখ্‌তে বসেছি। সম্মুখের জানালা খোলা রয়েছে, বাহিরে আকাশ এখনও মেঘে আচ্ছন্ন রয়েছে। মধ্যে মধ্যে মেঘের অন্তরাল দিয়ে এক একবার চাঁদের বিমর্ষ মুখচ্ছবি দেখা যাচ্ছে, সবসুদ্ধ জড়িয়ে রাত্তিরটি মন্দ দেখ্‌তে হয়নি। আমি ভাবাছ যে আমি দিন দিন অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ছি কেন? আমার সকল বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ঔদাসীন্যের মূল কোথায়? আমার নিজের মনোমত কার্য্য করবার অক্ষমতা, স্বীয় শক্তির উপর অবিশ্বাস, কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্মের মহৎ ফলের উপর অবিশ্বাস হতে উৎপন্ন? আমি জানিনে যে আমি কোন্ কার্য্যের জন্য সম্যক্ উপযোগী, তাই একাগ্রচিত্তে সম্পূর্ণরূপে কোনও কার্য্যে আত্মসমর্পণ করতে পারিনে। এতদিন আমি নিজেকে এই পৃথিবীর রঙ্গভূমিতে কেবলমাত্র দর্শক হিসেবে দেখেছি। মনে করতুম কোন কার্য্যে নিজে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা নির্লিপ্তভাবে, কেবল সমালোচকের চক্ষে, মনুষ্যের নানাবিষয়ে শতসহস্র প্রকার চেষ্টা এবং অবিরত পরিশ্রম দর্শন করাই অধিক বুদ্ধিমানের কাজ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অন্ধভাবে উদ্দেশ্যহীন খাটুনি, সামান্য ফললাভের জন্য অসামান্য পরিশ্রম, মহৎ ফললাভের নিস্ফল প্রয়াস, এই সকল সত্য আমার স্বাভাবিক মনের গতিকে আরও অধিক বলবান করেছে। কিন্তু এখন আর এই আলস্যপ্রসূত শান্তি আমার কাছে যথেষ্ট মনে হয় না। আমার আভ্যন্তরিক শক্তির রুদ্ধ প্রবাহ মুক্তিলাভের জন্য উতলা হয়ে উঠছে। কেবলমাত্র প্রকৃতির ও মানবের অসংখ্য শক্তির বিবিধ বিচিত্র বিকাশ তফাৎ হতে দেখায় নহে, নিজ প্রকৃতির শক্তিসকলের উপযুক্ত বিকাশেই সুখের অনেকাংশ নির্ভর করে।

এই পৃথিবী যদি সম্পূর্ণরূপে সুন্দর ও সুখময় হত, যদি এখানে কিছু পরিবর্ত্তন করবার আবশ্যক না থাকত, যদি এখানে কোনরূপ উন্নতি কিম্বা অবনতির অবসর না থাকত, অর্থাৎ যদি এ পৃথিবী মানবকল্পনার আদর্শ জগৎ হত, কিম্বা যদি এই অসম্পূর্ণ, সুখদুঃখ সৌন্দর্য্যকদর্য্যতাময় সংসারের উপর মানবের ইচ্ছানুরূপ কতকটা অবস্থা-পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা না থাকত,—তাহলে আমাদের চিরদর্শক হওয়া শোভা পেত। কিন্তু আমরা দেখ্‌তে পাই যে, সকলেই পৃথিবীর অবস্থা কতকপরিমাণে ভাল করবার চেষ্টা করছেন, দু চারজন বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হয়েছেন, তাঁহারা সকলের নিকটই পরিচিত,—বাদবাকি সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা এবং পরিশ্রমের অনুরূপ ফল সাধারণের অলক্ষিতে পৃথিবীতে রেখে গেছেন। কর্ম্মতেই জীবনের উদ্দেশ্য লাভ হয়, এবং কর্ম্মে ও কর্ম্মহীন চিন্তায় জীবনের সুখ লাভ হয়।

প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর আগে আমি মানব-জীবনটাকে সঙ্গীতের মত মনে করতুম। সঙ্গীতে যেমন শব্দসকলের মধ্যে শুধু সামঞ্জস্য ও মাধুর্য্য বিদ্যমান, কোন প্রকার বিরোধ কিম্বা বাধা যেমন তাহাতে অবর্ত্তমান, সেইরূপ আমাদের সকল কার্য্য সকল সম্বন্ধে কেবল মিল ও সৌন্দর্য্য, কেবল শান্তি ও সুখ আছে, এইরূপ মনে হত। কোন বাধা অতিক্রম করা, কোন কষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে যে একান্ত আবশ্যক, এ কথা একবারও মনে হত না। একরকম নির্ব্বিবাদ শান্তির ব্যাঘাতজনক সকলপ্রকার পদার্থ থেকে, সকল প্রকার কর্ত্তব্য থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন রাখতে ইচ্ছে করত। মনে হত মানুষ

নিজের অভাব নিজে রচনা করে, সেই অভাব দূর করবার জন্ত শান্তি ও সৌন্দর্য্য বিসর্জ্জন দিয়ে, কর্ম্মক্ষেত্রের গোলমালের ভিতর, আরামময় বিশ্রামের বহির্দ্দেশে গিয়ে, অসীম চেষ্টা, নিয়ত উত্তমের দ্বারা, অপরিচিত সুখের অতৃপ্ত পিপাসা নিবারণের বৃথা চেষ্টা করে! মনে হত বুঝিবার ভুল হতেই মানুষের এই স্বরচিত কষ্টের সৃষ্টি। তখন পার্থিব জীবনকে কেবলমাত্র beautiful বলেই মনে করতুম। যাঁহারা নিজের জীবনকে কতক পরিমাণে সুন্দর করে তুলতে পেরেছেন, তাঁদের জীবনই সার্থক বলে মনে হত। তখন Sublimity জিনিষটে ভালরকম বুঝতে পারতুম না, ইতিহাসের কিম্বা কাব্যের sublime চরিত্রের প্রতি তেমন ভালবাসাও ছিল না। কারণ পৃথিবীর কদর্য্যতা, পৃথিবীর দুঃখ, পৃথিবীর পাপ দূর করবার অভিপ্রায়ে বৃহৎ চেষ্টা এবং বিপুল শক্তির পরিচয় দানেই Sublimity প্রকাশ পায়। ক্ষুদ্রতার মধ্যে সৌন্দর্য্য থাকতে পারে, কিন্তু মহত্বই Sublimityর লক্ষণ। পৃথিবী সুন্দর নয় বলিয়াই তাহাকে সুন্দর করবার জন্ত Sublimityর আবশ্যক। Sublime ব্যক্তিদিগকে চিরকাল বড় বড় বাধা অতিক্রম করতে, জগৎজোড়া দুঃখ দূর করতে, মনুষ্য জীবনের উন্নতির পক্ষে ক্ষতিজনক বিষয় সকল দূর করতে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, সুতরাং চিরন্তন বিরোধের মধ্যেই Sublimity ফুটে উঠে। শান্তির সুখ sublime ব্যক্তিরা জানে না। এখন বুঝতে পারি সৌন্দর্য্যলাভই জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য-লাভের জন্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য, পৃথিবীর পরস্পর-বিপরীত শক্তিসকলের মিল না করাইলে সম্ভবে না। সেই

বিপরীত শক্তির বিরোধ দূর করবার জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রমের আবশ্যক। যিনি এই বিষয়ে বিশেষরূপ সামার্থ্য এবং বীর্য্যের পরিচয় দেন, তাঁহাকেই আমরা sublime মানবের ভিতর পরিগণিত করি। Sublimity বুঝিতে না পারায় মানবজীবনের যথার্থ অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়।

২১শে মে, ১৮৯১।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সকলের চক্ষে কিছু সমান দেখায় না। সৌন্দর্য্য ভোগের জন্য শিক্ষা আবশ্যক। দারজিলিংএর শোভা ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে শিক্ষিত ইংরাজ কিম্বা বাঙ্গালীর যতটা জ্ঞান আছে, দারজিলিংবাসী ভুটিয়াদের অবশ্য তার শত অংশের এক অংশও নেই। যেমন বর্ত্তমান সময়ে উচ্চশিক্ষাবিহীন লোকদের প্রকৃতির মর্য্যাদা বুঝিতে অক্ষম দেখা যায়, সেইরূপ আবার বর্ত্তমান সময়ের সহিত অতীতের তুলনা করলে দেখা যায় পুরাকালে মানবজাতি প্রাকৃতিক দৃশ্যে ততটা আকৃষ্ট হতেন না। যাঁহারা গ্রীক কিম্বা সংস্কৃত সাহিত্যে সম্যক আলোচনা করেছেন তাঁহারা বলেন, গ্রীক এবং সংস্কৃত কবি এবং অন্যান্য লেখকেরা শুদ্ধমাত্র বাহ্য দৃশ্য বর্ণনা করেন না। তাঁহারা কোন বিশেষ ঘটনার বর্ণনা ভাল করে ফুটিয়ে তোলবার জন্য, কিম্বা উপমাস্বরূপে প্রকৃতির নানা বিভিন্ন অবস্থার কথা কাব্যে স্থান দেন। গ্রীক Artএতেও landscape, প্রস্তরে খোদিত কিম্বা রংয়ে আঁকা দেখা যায় না। মানবজাতির বহুদিনের শিক্ষা এবং অনেক শত বৎসরের সভ্যতার ফলস্বরূপ প্রকৃতির শোভা সম্বন্ধে চোখ ফুটেছে। বর্ত্তমান মানবের সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রাচীন মানবদের অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। এরূপ হবার দুটি কারণ আছে:—

(১) বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক উন্মেষের সহিত বুঝিবার ক্ষমতা অনেক বেড়েছে, এবং সহানুভূতি-বৃদ্ধির সঙ্গে যে বস্তু মানবের অতি ঘনিষ্ঠ এবং তার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহা ব্যতীত অন্যান্য বস্তুতেও লোকে interest বোধ করে। (২) প্রত্যেক কবি ও লেখকে জগৎসুদ্ধ লোককে নিজের নিজের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করে গেছেন। ক্রমে এই সূত্রে প্রচুর সৌন্দর্য্যজ্ঞান আজকাল সাহিত্যে এবং Artএতে বদ্ধ রয়েছে, ইচ্ছা করিলেই তাহার আস্বাদ গ্রহণ করা যায়। সাহিত্য চর্চ্চা দ্বারা আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আমরা নূতন চোখে পৃথিবী দেখ্‌তে শিখি। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদী, গাছপালা, ফুলফল, সকলেই আমাদের নিকট নব নব আকৃতি ধারণ করে। সুতরাং যে দেশে ভালরকম আধুনিক সাহিত্য অবর্ত্তমান, সেদেশীয় লোকদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ততটা প্রস্ফুটিত নয়। আমরা বঙ্গসন্তান বাস করি বাঙ্গলায়, পড়ি ইংরাজি সাহিত্য। রক্তমাংসগঠিত চক্ষে দেখি বাঙ্গলার দুর্ব্বাদলমণ্ডিত সমতলক্ষেত্র, কানে কোকিল পাপিয়ার গান শুনি, নাসিকা দ্বারা বেল জুঁই চাঁপার গন্ধের পরিচয় গ্রহণ করি,—কিন্তু মনশ্চক্ষুতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ইটালীর নদীপর্ব্বতখচিত বিচিত্র বিভিন্ন শোভা সন্দর্শন করি। অন্তঃকর্ণে নাইটিঙ্গেল, কুকু, স্কাইলার্কের অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, ভায়লেট, জেরেনিয়ম, হেলিয়ট্রোপের নাম শুনলে তাদের সৌরভের ক্ষীণ স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠে। পাশ্চাত্য পাখীর গান, পাশ্চাত্য ফুলের গন্ধ, পাশ্চাত্য নদীগিরিবনের দৃশ্য, মনের মধ্যে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির ন্যায় অত্যন্ত মৃদুভাবে বিরাজ করছে, সর্ব্বদাই

মনে হয় যেন এ সকলের সঙ্গে পূর্ব্বে সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল, কিন্তু সময়ে এখন স্মৃতিটুকুমাত্রই অবশিষ্ট আছে, শত চেষ্টাতেও ঠিক জিনিষটির ধারণা হয় না। পূর্ব্বোক্তকারণে আমাদের দেশীয় ইংরাজিশিক্ষিত বাঙ্গালীদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান একটু নূতন ভাব ধারণ করেছে। সুন্দর বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ স্থলে নির্দ্দিষ্ট এবং বিশেষত্বযুক্ত জ্ঞান নেই। ইংরাজী জ্যোৎস্না, ইংরাজী আকাশ, দেশী জ্যোৎস্না, দেশী আকাশের মত নয়, সুতরাং বিলাতী সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা আমাদের জ্যোৎস্না ও আকাশ ইত্যাদির সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা কিছু অধিক সাহায্য লাভ করে না। সাহিত্যে বর্ণিত প্রকৃতি আমাদের নিকট অশরীরী ideal মাত্র, সুতরাং আমাদের চতুঃপার্শ্বের realityর মধ্যে আমরা সে সৌন্দর্য্য খুঁজে পাইনে। ফলে এই দাঁড়ায়, আমাদের বাহ্যদৃষ্টি দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, মস্তিষ্কে সঞ্চিত প্রকৃতির ছবির প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপ আমাদের কাছে বাস্তবিক বেশি যথার্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু কেবল ভাষার দ্বারা কোন বস্তুরই যথার্থ জ্ঞান অন্যকে দেওয়া যায় না। ভাষায় বর্ণিত বস্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লে তবে সে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মে। আমাদের ইউরোপ সম্বন্ধে জ্ঞানে শেষোক্ত উপকরণের অভাববশতঃ, আমরা জেরেনিয়ম, ভায়লেট, হেলিওট্রোপের গন্ধকে গন্ধ বলিয়াই জানি, একের সহিত অন্যের পার্থক্য কি তা জানিনে। এইরূপে আমাদের কাছে ইউরোপীয় প্রকৃতি কেবলমাত্র কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট বর্ণ, গন্ধ, এবং শব্দের সমষ্টিমাত্র,— নানা বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন গন্ধের, বিভিন্ন শব্দের বস্তুসকলের

সমষ্টি নয়। সুতরাং আমাদের কৃত বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনায় অস্পষ্টতা ও অনির্দ্দিষ্টতার ভাব আসিবারই অধিক সম্ভাবনা। তবে আমাদের মধ্যে যাঁহারা বাল্যকালে, অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্যে অধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বে যখন সকল ইন্দ্রিয়ই আপন আপন জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্পূর্ণরূপে উপভোগের পক্ষে উপযোগী ছিল সেই সময়ে, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যজ্ঞানদ্বারা বাহ্য প্রকৃতির বৈচিত্র্য হৃদয়ে প্রবল ভাবে অনুভব করেছেন, তাঁরা যদি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করে থাকেন, তাহলে সেইরূপ লোকেরা দেশীয় প্রকৃতির যথার্থ বর্ণনায় পারগ হবেন। এইরূপ দেশীয় দৃশ্যের বর্ণনার পক্ষে উপযোগী ব্যক্তিরা যদি ইউরোপীয় সাহিত্যের সম্যক চর্চ্চা করে থাকেন, তাহলে ideal ইউরোপের' ছায়া তাঁদের বর্ণনায় লিপ্ত হয়ে থাকবে, তাতে করে তাঁদের বর্ণনা সৌন্দর্য্য লাভ ছাড়া লোকসানগ্রস্ত হবে না।

সম্বন্ধ

আমার কোন একটি পূজনীয় আত্মীয় বলিতেন যে, মানুষ বিবাহ-পূর্ব্বে দ্বিপদ, বিবাহান্তে চতুষ্পদ, এবং সন্তানাদি হইলে ষট্পদ হইতে ক্রমশঃ অষ্টপদ হইয়া অবশেষে মাকড়শার জালে জড়াইয়া পড়ে।

এক এক সময় আমার মনে হয় এই মাকড়শার সঙ্গে মানুষের অনেক মিল আছে। আমরা সকলে তেমনি "আপন রচিত জালে আপনি জড়িত," তেমনি সংসারবৃক্ষে সুখদুঃখের ছায়ালোকে দোদুল্যমান, তেমনি অদ্ভুত অধ্যবসায় ও নিপুণতার সহিত এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনজাল বুনিতে ব্যস্ত। সাদৃশ্য-তালিকা এইখানেই সমাপ্ত করিলাম, এবং আমরা অন্যান্য মানুষ-মাছিকে ঠিক তেমনি করিয়া নিজের জালের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া শুষিয়া খাইতে সর্ব্বদা উৎসুক কিনা, সে কথা উহ্য রাখিলাম! অন্ততঃ সকলের সে বদ্-অভ্যাসটি নাই, ইহাই মনুষ্যজাতির সৌভাগ্য এবং শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ।

মাকড়শা কি কারণে জাল বিস্তার করে, তাহা পোকাতত্ত্ব-বিৎরাই বলিতে পারেন। কিন্তু আমার কল্পিত মানুষ-মাকড় অদৃশ্য তন্তুদ্বারা এইরূপে অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। সে যেন নিজে একটি কেন্দ্র, এবং নানা লোকের সঙ্গে নানা সূত্রে তাহার যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহার জীবনজাল। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা জন্মাবধি এই জাল বুনিতেছি। শিশু ভূমিষ্ঠ না হইতেই তাহার কত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মৌমাছির

চাক অথবা মাকড়শার জাল যেরূপ রেখাগণিতের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে গঠিত, মানুষের সমগ্র জীবনজাল তত সুনির্দ্দিষ্ট না হউক, অন্ততঃ তাহার গোড়া পূর্ব্ব হইতেই বাঁধা থাকে। যিনি অদৃষ্টবাদী তিনি বলেন আমরণ সম্পূর্ণ নক্সাই জন্মপূর্ব্বে প্রস্তুত থাকে, আমাদের অঙ্গুলি চালনার ক্ষমতা আছে মাত্র। আবার যিনি পুরুষকারে বিশ্বাস করেন, তিনি বলেন ভালমন্দ বুনানি আমাদের হাতে;—উপকরণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমরা যন্ত্রী, যন্ত্র নহি। দৈবশক্তি যদি প্রবল হয়, তাহলে মানুষের জীবন য়ুরোপীয় লিখিত-সঙ্গীতের ন্যায় আগাগোড়া বিধিবদ্ধ, এবং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে বাধ্য,—মানুষ উপলক্ষ বই নয়। আর আত্মশক্তিই যদি প্রবল হয়, তাহলে প্রতি জীবনের রাগিণী ও ঠাট আদ্যাশক্তির হাতে বাঁধা হইলেও তাহা আমাদের দেশের সঙ্গীতের ন্যায় বহু বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাপূর্ণ, গায়কের ক্ষমতা ও ইচ্ছানুসারে বিস্তারিত, এবং পুনঃপুনঃ পুনরাবদ্ধ।

সে যাহা হউক, আমার মাকড়শা অত তত্ত্বজ্ঞানের ধার ধারে না। তত্ত্বকথায় তাহার চতুর্দ্দিকের বাতাস অনুরণিত বটে, কিন্তু তাহার এক কান সে দিকে থাকিলেও, জালবোনা স্থগিত রাখিয়া সে-সব কথার মীমাংসা করিতে বসা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আমরা আজ আছি কাল নাই সত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা চাই, এবং আশপাশের সঙ্গে দেনাপাওনার সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাহার একমাত্র উপায়। পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়াকে সাধারণতঃ বলে চুরি। কিন্তু যাহা কিছু অপরকে দিতে পারিতাম, অথচ দিই নাই,— সে-প্রকার চুরির জন্য স্বতন্ত্র ধারা ও কারা আবশ্যক নহে কি?

শৈশবকালে আমাদের দেনা অপেক্ষা পাওনার ভাগই বেশি। তখন আমরা গ্রহণ করিতেই ব্যস্ত, দান করিবার ক্ষমতা তখনো জন্মায় নাই। পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, আলো বাতাস, খাদ্য পানীয় সবই আমাদের শরীর মন গড়িয়া তুলিবে, তবে ত আমরা কিঞ্চিদপি প্রতিদান দিতে সমর্থ হইব। আগে আহরণ, পরে বিতরণ; আগে সংকোচন, পরে প্রসারণ। জ্ঞানোদ্‌গমের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক হইতে “দাও” “দাও” রব উত্থিত হয়, এবং চিরজীবন সেই প্রার্থনা অল্পবিস্তর পূর্ণ করিতেই কাটিয়া যায়। পিতামাতা বলেন ভক্তি দাও, শিক্ষক বলেন মন দাও, প্রণয়ী বলে প্রেম দাও, বন্ধু বলে প্রীতি দাও, সমাজ বলে সৌজন্য দাও, দেশ বলে কাজ দাও, সুখী বলে হাসি দাও, দীনদুঃখী বলে করুণা দাও, সন্তান বলে স্নেহ দাও,—পাওনাদার বলে টাকা দাও! অবশেষে মৃত্যু বলে প্রাণ দাও,—না দিলেও প্রাণ কাড়িয়া লইয়া যায়! আর বুঝি বা ভগবান বলেন সব দাও।

মাকড়শা বেচারি কি করে, গরু যেমন ঘানিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তেল যোগায়, সেও তেমনি অহরহ স্বীয় জীবনচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে মর্ম্মজাল ও কর্ম্মজাল বুনিতে থাকে। মর্ম্মইত কর্ম্মের প্ররোচক ও নিয়ন্তা, এবং কর্ম্মস্রোত ও চিন্তাস্রোত বরাবর পাশাপাশি বহিয়া পরস্পরকে শোধন করিতেছে বলিয়াই মনুষ্য-জীবনে ক্রমোন্নতির আশা করা যায়। কেহ কেহ আজকাল সত্যই বিশ্বাস করেন যে, কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রশ্মিদ্বারা মানুষ পরস্পরের উপর মানসিক প্রভাব বিস্তার করে, এবং কর্ম্মযোগ অপেক্ষা নিগূঢ় যোগে একের চিন্তা অপরকে স্পর্শ করে। সে

যোগ চর্ম্মচক্ষে না হউক, দিব্যচক্ষে দ্রষ্টব্য। অবশ্য এস্থলে আমরা বহির্মুখী রশ্মির কথাই বলিতেছি, কিন্তু বলা বাহুল্য যে বাহির হইতে অন্তর্মুখী রশ্মিজালও ক্রমাগত আসিতেছে। এই আদানপ্রদান টানাপোড়েনেইত জীবন-নক্সা এত বিচিত্র, এবং কপাল ও হাতযশ অনুসারে এত সুন্দর হয়। নিজের সহিত নিজের পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইতে দূর দূরতর দূরতম সম্বন্ধ পর্য্যন্ত গড়াইয়া ছড়াইয়া গাঢ়বর্ণ কেমন অলক্ষিতে ফিকা রংয়ে মিলাইয়া আসে, তাহা সহজেই পরিকল্পনা করা যায়। আত্মবৎ সম্বন্ধই প্রত্যেকের নিকট বেশি প্রকট,—তাহা নিশ্চয়ই হৃদয়ের রক্তরাগে লাল। তারপরে যে যতদূর পহুঁছিতে পারে। গোড়া যেমন অহংয়ে স্পষ্ট প্রোথিত, মাঝখান যেমন অসংখ্য চিত্রবিচিত্র নানামুখী সূত্রে গ্রথিত, শেষটা তেমনি কোন্ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা অপেক্ষাকৃত অনির্দ্দিষ্ট। প্রকৃতিভেদে এই সীমা কমবেশি স্পষ্ট। এমন সীমাবদ্ধ স্বার্থপর জীব বোধহয় কেহ নাই, যাহার মন কোন-না-কোন সময়ে নিজের জীবন-কোটর হইতে অজানা অসীমে দূত না পাঠায়। আবার এমন ক্ষণজন্মা পুরুষও আছেন, যাঁহারা অহমিকার লাল হইতে সুরু করিয়া, আত্মীয়তা সামাজিকতার গোলাপী আভার মধ্য দিয়া, বিশ্বপ্রেমের শেষ শ্বেত আলোক পর্য্যন্ত অটুটভাবে জীবনজাল বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন,—যেখানে সাধারণ মানুষের মন দূরবীণ না কষিয়া কিছু দেখিতেই পায় না, হৃদয়ঙ্গম করা ত দূরের কথা।

কিন্তু তন্তুজাল ও রশ্মিজালে মিলিয়া মিশিয়া উপমা ক্রমে

ঘোরাল হইয়া পড়িতেছে, অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার মাকড়শা সরল প্রকৃতির সহজ লোক,—অসাধারণ বড়লোক বা ভাবুক নহে। শেষ পরিণাম ভাবিতে সে সময় নষ্ট করে না, কারণ তাহার অবসর কম ও কাজ অনেক। তাহার সাদা চোখের দৃষ্টি যতদূর যায়, সেই গণ্ডির মধ্যে আপনাহতে যাহারা আসিয়া পড়ে, তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে ও রক্ষা করিতে পারিলেই সে যথালাভ মনে করে। সম্বন্ধের সংখ্যা বা দূরত্বের উপর মহত্ব নির্ভর করে হয়ত, কিন্তু সামঞ্জস্য রক্ষার উপর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে, সে কথা অন্ততঃ স্ত্রীমাকড়শার মনে রাখা উচিত। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় আমরা পরের দেখাদেখি এই সম্বন্ধসূত্র অনর্থক বেশি লম্বা ও জটিল করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহাকে এক-প্রকার দীর্ঘসূত্রতা বলা যাইতে পারে! শিরা উপশিরা যত দূরে ছড়াইবে, ততই হৃৎকেন্দ্র হইতে রক্ত পহুঁছাইয়া দেওয়া শক্ত হইবে,—এবং যেখানে মন দিতে পারিব না, সেখানে শুধু শুষ্ক কাজ দিয়া কি ফল? এই হৃৎপদার্থের অভাবেই পৃথিবীর বড় বড় ধর্ম্ম গোঁড়ামীতে, এবং বড় বড় কথা বাঁধিগতে ক্রমশঃ পরিণত হয়; এবং বারম্বার পুনরাবৃত্তিতে জীর্ণ সংস্কারকে এই হৃদামৃতে সরস ও সতেজ করিবার নিমিত্তই যুগে যুগে মহাত্মার সম্ভাবনা আবশ্যক হয়। মৌচাকে যতক্ষণ মধু থাকে ততক্ষণই তাহার সার্থকতা,—নহিলে সে রিক্ত পরিত্যক্ত নিরর্থক কোষমাত্র। সেকালে মেয়েদের কাছে অনাত্মীয় যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারাও আত্মীয়ের পাতানো-সম্পর্ক ও স্নেহ লাভ করিতেন। এখন কি আমরা সেই ব্যক্তিগত সম্বন্ধের বদলে সভাসমিতির নীরস শাখা প্রশাখা

বিস্তার করা শ্রেয় মনে করিব? চিঠির সঙ্গে টেলিগ্রামের যে তফাৎ, ব্যক্তিগত ও সমিতিগত সম্বন্ধে সেই তফাৎ। একটি সরস, সজীব ও স্বপ্রকাশ,—আর একটি শুষ্ক, কঙ্কালসার ও কাজের নির্ব্বাহক কিন্তু ভাবের হন্তারক। আজকাল হয়ত আমরা পাড়াপ্রতিবেশীর বিপদে আপদে খোঁজ লই না, অথচ আফ্রিকার দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর হওয়া উন্নতির লক্ষণ মনে করি। মেয়েদের সঙ্কীর্ণ পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে তাহা বলি না, কিন্তু মেয়ে পুরুষ উভয়েরই উচিত নিকট হইতে দূরের সব পথটুকু মাড়াইয়া চলা, ডিঙাইয়া যাওয়া নয়। পুত্রকে ত্যাজ্য করিয়া পৌত্রের জন্য প্রাণ দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। কেবলমাত্র একটি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিলে বাতাস দূষিত হয় বলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেলুনে উড়িবার দরকার দেখি না, জানালা খোলা রাখিলে এবং মধ্যে মধ্যে বায়ু পরিবর্ত্তন করিলেই যথেষ্ট। তেমনি অতিসঙ্কীর্ণতা জীবনমনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল বলিয়া, অতিপ্রসারতাও কিছু অনুকূল নহে। এই ঘর ও পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা আজকালকার দিনের একটি প্রধান সমস্যা। কেননা পূর্ব্বাপেক্ষা পরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা অনেক সহজসাধ্য হইয়াছে, অথচ সেই কারণেই মন বিক্ষিপ্ত এবং জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া সাবধান থাকা আবশ্যক। প্রত্যেকের হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতার একটি স্বাভাবিক সীমানা আছে, সেটি লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিলে অনর্থক বলক্ষয় হয়। অবশ্য সেই সীমানা অগ্রসর করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত, নহিলে জড়তার অন্ধকূপে

পড়িবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু হৃদয় যাহাতে পিছাইয়া না পড়ে, হাত বাড়াইবার সময় সেদিকে যেন লক্ষ্য থাকে। জীবনযাত্রাও একটি শোভাযাত্রা হইতে পারে, যদি আমরা তাহার শিল্পচাতুর্য্য আয়ত্ত করিতে পারি—এবং এই শিল্পকার্য্যের মত মহৎ ও সুন্দর শিল্প আর নাই। বাঙ্গালী পুরুষে যদি সেই মধুচক্র রচনা করিতে পারেন, "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"; এবং বাঙ্গালী স্ত্রীলোকে যদি "পৌরজন"কে সেই আনন্দ বিতরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধহয় তাঁহাদের জীবন যথেষ্ট সার্থক হয়। পুরুষরা অবশ্য সংসারের অনেক নীরস কাজ করিতে বাধ্য,—কাহারো না কাহারো ত করিতেই হইবে। কিন্তু তাঁহাদেরও জীবনের সুযাত্রার পক্ষে অবসর আবশ্যক,—এবং মেয়েদের পক্ষে ত নিতান্তই আবশ্যক,—কারণ অবকাশেই সেই সকল ফুল ফোটে, যাহাতে সংসার মরুময় না হইয়া কখনো কখনো "নন্দনগন্ধমোদিত" হয়; অবকাশই সেই রন্ধ্র যাহার মধ্য দিয়া "সীমার মাঝে অসীম তুমি হে বাজাও আপন সুর।"

মানুষের সহিত মানুষের যেমন দেনাপাওনার সম্বন্ধ, মনুষ্যেতর প্রকৃতির সহিতও কি তাহাই? প্রকৃতির নিকট হইতে আমরা যেন শুধু পাই মনে হয়,—প্রতিদানে কিছু দিই না। শিশির-সিক্ত স্নিগ্ধ উষায়, রৌদ্ররঞ্জিত উদাস দিবসে, সূর্য্যাস্তমণ্ডিত স্বর্ণ সন্ধ্যায়, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজত নিশীথে, যখন আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পান করি, তখন কি কিছু দান করি? না মনের তন্ত্রীরাজির উপর সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর অবাধ হস্তসঞ্চালন নীরবে অনুভব করি মাত্র? যিনি নীরব থাকিতে না পারেন, তিনি

প্রকাশের প্রকার অনুসারে কবি বা শিল্পী হন, কিন্তু তাহাতে প্রকৃতিকে কিছু প্রতিদান করা হয় কি না সন্দেহ,—সময়ে সময়ে প্রতিশোধ লওয়া হয় বটে! "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ" রীতিমত বিচার করিতে না বসিয়াও বলা যাইতে পারে যে, বাহিরের সৌন্দর্য্যের সহিত আমাদের হৃদয়ের যে সম্বন্ধ তাহাই শিল্পকলা, তাহার কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার সহিত আমাদের বুদ্ধির যে সম্বন্ধ তাহাই জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শন, এবং তাহার দ্বারা উদ্দেশ্যসাধনের সহিত আমাদের দ্বারা নির্দ্ধারিত উপায়ের যে সম্বন্ধ তাহাই আজকালকার বহুমান্য efficiency বা কার্য্যকুশলতা।

মনুষ্যনির্ম্মিত বস্তুতেও গঠনের সহিত উদ্দেশ্যের একটি সম্বন্ধ আছে, সেটি যথাযথ রক্ষা করিতে না পারিলেই সৌন্দর্য্যচ্যুতি ঘটে। অবশ্য প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্যসাধনের কৌশলে যত সিদ্ধহস্ত, আমরা তাহার তুলনায় আনাড়ি মাত্র, তবু যে শিল্পী যত গুণী তিনি তত লক্ষ্যভেদে পটু, এবং সত্যের সহিত সুন্দরের মিলন সাধনে সমর্থ। হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে জগতের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে মানুষ কিছু কম দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ করে নাই—যাহা যুগে যুগে প্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধি এবং মানবের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে ও করিতেছে। স্থাপত্যবিদ্যা ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক একটি পুরাতন সহরের ইতিহাসে কি মাহাত্ম্য কম? আবার এক একটি বিখ্যাত ইমারতের মর্য্যাদার ত সীমা পরিসীমা নাই। তাজমহল না থাকিলে আজ আগ্রাকে কে পুছিত? মানুষ যথার্থই প্রকৃতিকে বলিতে পারে "আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—তুমি আমারই।" যমুনার গৌরবের কতখানি

প্রকৃতিরচিত এবং কতখানি কবিপ্রক্ষিপ্ত, তাহা অতিবড় রাসায়নিকও আজ নির্ণয় করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। তবু আমরা প্রকৃতির নিকট চিরঋণী, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ স্থল-বিশেষে যেমন তাহাকে সাজাইয়াছি, তেমনি অসংখ্য স্থলে টিনের ছাদ ও কলের ধোঁয়া প্রভৃতিতে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছি। পক্ষান্তরে, তাহার রূপরস যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, পোষণ করে, তাহার বজ্র তাহার সমুদ্র তেমনই আমাদের দগ্ধ করে, শোষণ করে। অতএব শোধবোধ!

স্ত্রীলোক ও পুরুষের দেবদত্ত অনৈক্যের মধ্যে এই একটি প্রধান যে, স্ত্রীলোক নিকটের সঙ্গে এবং পুরুষ দূরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে স্বভাবতঃ পটু। কারণ পুরুষ সৃষ্টিকর্ত্তা, স্ত্রীলোক রক্ষাকর্ত্তা, (এবং বালক প্রলয়কর্ত্তা!) যিনি রক্ষক তিনি গচ্ছিত দ্রব্য হইতে বেশি দূরে গেলে চলে না। গৃহ এবং সমাজই নারীর নিকট গচ্ছিত সেই ধন, সুতরাং নারী তাহাই লইয়া পড়িয়া আছে ও পাহারা দিতেছে। তাহার শরীর ও মন, বুদ্ধি ও হৃদয় সবই ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণে সর্ব্বদা নিযুক্ত, সুতরাং বাহিরের প্রতি তাহার লক্ষ্য করিবার প্রবৃত্তি ও অবসর স্বভাবতঃই কম। সব কাজ একের দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে, কার্য্যবিভক্তিতেই কার্য্যসিদ্ধি। লক্ষ্য উচ্চ হইলে তাহার সাধনে কোন খণ্ড কাজই তুচ্ছ নহে। গৃহরচনা ব্যূহরচনা অপেক্ষা কিছুমাত্র সহজসাধ্য নহে, এবং জীবনসংগ্রামের পক্ষে বোধহয় বেশি বই কম প্রয়োজনীয় নহে। খাদ্য যেমন পুরুষে অর্জ্জন এবং স্ত্রীলোকে বন্টন করে, তেমনি মানসিক খোরাকও পুরুষকেই অধিকাংশ

যোগাইতে হয়। সত্যরাজ্যের সীমানা বাড়ানো তাঁহাদের কাজ, কিন্তু যে সত্যরত্ন মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা ও জীবনে প্রকাশ করা স্ত্রীলোকের কাজ। সেই জন্য সব দেশে ও কালে স্ত্রীলোক রক্ষণশীল, পুরুষ গতিশীল। একজনের সঙ্কীর্ণ সামাজিক জীবন,—অপরের বিস্তীর্ণ জাতীয় জীবন লইয়া কারবার। প্রাত্যহিক এবং প্রত্যক্ষ উপস্থিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ভার অধিকাংশ নারী অনুগ্রহ করিয়া (অথবা দায়ে পড়িয়া!) লইয়াছে বলিয়াই এতগুলি পুরুষ অপ্রত্যক্ষ এবং অনুপস্থিতের প্রতি এতটা মন দিতে পারে। তাই নারী মুক্তিদায়িনী। সে সর্ব্বদাই দশচক্রে ঘূর্ণ্যমানা ও দশভুজে কর্ম্মনিরতা। তাই নারী শক্তিরূপিনী। সে পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবার জন্য সততই উন্মুখ ও প্রস্তুত। তাই নারী সন্তাপহারিণী। আর পুরুষ "ভাঙ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ"—অন্নের ভিখারী, প্রেমের ভিখারী, সৌন্দর্য্যের ভিখারী, জ্ঞানের ভিখারী। আবার যখন ভিখারী নন তখন শিকারী,—পশুপতি কি পশুমতি তাহা বলা কঠিন! সেই মৃগয়ামদে এখন য়ুরোপ মত্ত, ত্রস্ত, বিধ্বস্তপ্রায়। এই খাদ্যখাদক সম্বন্ধের তুলনা দিতে মাকড়শা হার মানে। হয় হিংস্রতর জন্তুর অবতারণা করিতে হয়, নাহয় স্বীকার করিতে হয় যে ভগবানের সৃষ্টিতে মানুষ হিংস্র জন্তু হিসাবে অদ্বিতীয়। সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য তাহা ভগবানই জানেন,—আমরা সে হেঁয়ালির উত্তর দিতে ক্রমাগতই চেষ্টা করি, এবং ক্রমাগতই ভুল করি,—তাহা সংশোধনপূর্ব্বক পুনরায় চেষ্টা করি, ও পুনরায় ভুল করি। এই চেষ্টাপরম্পরার নামই ক্রমোন্নতি বা জীবের অভিব্যক্তি। এই নৃসিংহ অবতারকে

মানুষ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কত যুগে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহা এই বিংশ শতাব্দীর হত্যাকাণ্ড দেখিলে মনে হয় অনুমানেরও অগোচর। ইতিমধ্যে এটুকু নিশ্চিত যে এই খাদ্যখাদক সম্বন্ধকে বাধ্য-বাধক সম্বন্ধে পরিণত করিবার যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা স্ত্রীলোকেরই আছে। সেই দূরাৎসুদূর লক্ষ্যের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আপাততঃ প্রত্যেকে সযত্নে আপনাপন জীবন-জাল বুনিতে থাকি। কাল পূর্ণ হইলে হয়ত এই ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম জালিসমষ্টিই বেড়াজালে পরিণত হইয়া পৃথিবীকে আত্মীয়তার মঙ্গল রাখীবন্ধনে বাঁধিবে। তথাস্তু।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

অন্নপূর্ণা

বিশ্বশিল্পী	মডেল
আমি	বৃদ্ধ
শ্রমজীবীগণ	দলনায়ক
রং-ওয়ালা	সহকারী নায়ক
তন্তুবায়	মহাজন
স্বর্ণকার	ব্যাপারী

স্থান।—বিশ্বের হাট। অনতিদূরে কারখানা ও খনি। সামনে পাহাড়, চূড়ায় মন্দির, পাহাড়ের গায়ে কুটীর।

(পাহাড়ের নিম্নদেশে শিলাখণ্ডে বসিয়া)

আমি।—কত আকাশ ঘুরে এই মাঝপথে এসে থেমে গেছি। সেই যে শূন্যময়ের দেশ পার হ'লাম, তারপর এক ঘূর্ণীপাকে পড়ি, সেথায় দুটো ছায়ামূর্ত্তি, অবিরাম গোলপথে পরস্পর পরস্পরকে অনুধাবন করছে। উভয়ে দেখে কেবল উভয়ের পশ্চাতের একটা আবছায়া, আর উভয়েই উভয়ের ছায়া ধর্‌বার জন্য ছোটে। বুঝ্‌লাম, এ যুগল জীবন ও মরণ। তখন সেই দ্বন্দ্বের ঘোর কেটে গেল, আবার চল্‌তে লাগ্‌লাম। এবার নূতন প্রয়াণে মধ্যপথে, সন্ধিস্থলে, এসে পড়্‌লাম। বুঝ্‌লাম তৃতীয় হ'য়ে মাঝে থাকাই সত্য,—দুই মিথ্যা, তিন সত্য। সেই অবধি এই মাঝপথে তৃতীয় হ'য়ে আছি।

এই দেশের মালেক একজন শিল্পী। তাঁরই তাঁবে ঐ কারখানা, ঐ খনি, ঐ হাট; সকলই তাঁর অধীনে চলিতেছে। তাঁর বিশ্বশিল্পের উপকরণ

যোগাইবার জন্য। ক্ষতিবৃদ্ধির, লাভ লোকসানের, গণনা তাঁর নাই; তিনি শিল্পী।

সেই মালেক বিশ্বশিল্পী একদিকে, কারিগরেরা অপর দিকে, আর আমি কারিগরদের "মালেকা", শিল্পীর "বন্ধু", তাদের মাঝে। মাঝে বসে বসে দেখি, এই পাহাড়ের গায়ে উর্দ্ধে শিল্পীর সান্ধ্যমেঘরঞ্জিত কুটীর ও শিল্পাগার, দুর্গম চূড়ায় তুষারশ্বেত মন্দির, ও তলদেশে খাদে ধূমায়মান খনি ও কারখানা।

শিল্পীকে বলি, বন্ধু, ঐ যে পায়ের তলে গহ্বর, কারিগরের আবাস, ভরিয়া উঠিবে কিসে? বন্ধু কেবল হাসে আর বলে, হৃদয়রাণী, ও যে সোণার খনি, ও খনি ভরিয়া উঠিলে তোমায় সোণা দিয়া সাজাইব কেমনে? পোড়াইয়া পিটাইয়া আমার খাস দরবারের আসবাব গড়াইব কিসে?

ভেবেছিলাম মাঝে থেকে মালেক ও মজুরদের বন্ধনী হ'য়ে থাকব। আমি "মালেকা", আমি মধ্যস্থা, বিবাদভঞ্জন ক'রে শান্তি এনে দেব। কিন্তু এ একতরফা শালিসী, একদিকে স্বস্তি অপর দিকে অসোয়াস্তি, তাই এদের জ্বালা, এদের হাহাকার, ঘুচ্‌ল না। চুলির আগুন দিনরাত ঐ কারখানায় জ্বল্‌ছে। আর খাদ থেকে উঠ্‌ছে ধোঁয়া, আর উঠে লোহা পেটার কড়্‌কড়া; কলের জাঁতার ঘর্‌ঘরা।

বঁধুয়া, তুমি মহীয়ান্ তুমি মালেক, আমার ধূলাকে সোণা দিয়া মুড়িয়াছ, কিন্তু আজ আমি ধূলায় ফিরিয়া যাইতে চাই। আজ আমি মাটির সঙ্গে মাটি হব, আগড়া ধসা মাটি,—তোমার শিল্পমূর্ত্তির মধ্যে রাণীমূর্ত্তি হ'তে চাই না। তোমার শিল্পের দোহাই, আমায় রেহাই দাও।

মন আমার, আর নয়, আর নয়, মাঝে থাকিলে চলিবে না। সূর্য্যের জ্যোতি সহস্রধা হ'য়ে ধূলাবালিতে পড়ে। মাটিতে পড়িতে সূর্য্যের কোন সহায় সম্বল নাই। মাঝে কেবল আকাশ, মাঝে কেবল ফাঁকা, কোন রূপের আড়াল নাই।

(কারখানার প্রাঙ্গণে প্রবেশ)

আমি আজ এই কারিগরদের, এদের প্রভুর নহি। ঐ যে কচি রাঙ্গা ফুটফুটে মুখখানি, যাকে একদিন অশ্রুজলে সিক্ত ক'রে, রিক্ত ক'রে, পটো অনাথার করুণমূর্ত্তি আঁকবে ব'লে মনে মনে ঠাওরাচ্ছে, আমি আজ ঐ কচি মুখখানির, পটোর নই। ঐ যে পরিশ্রান্ত বৃদ্ধের সৌম্য মূর্ত্তি গোধূলির আকাশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সংসারতটে দণ্ডায়মান; যার শেষ নিশ্বাসটুকু নিয়ে ভাস্কর "বিদায়"-এর মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রাণময় ক'রে গড়ে তুলছে,—মূর্ত্তির থামালে লেখা—"Au revoir, বিদায়! আবার যেন তোমায় দেখি!"—আমি আজ ঐ শ্রান্ত বৃদ্ধের, এ ভাস্করের নই। ঐ যে তন্তুবায় সৌখীন বিলাসীর জন্য হৃদয়েরই তন্তুগুলি ছিঁড়ে রেশমের গুটি প্রস্তুত ক'রে দিচ্ছে, ঐ যে রং-ওয়ালা নিজের রক্তাক্ত অস্থিকেই লোহার কলে পেষণ ক'রে চিত্রকরের জন্য রংএর গুঁড়া তৈয়ারী করছে, আমি আজ ওদের, শিল্পীর নই। ঐ যে খনির মজুরেরা আঁধার থেকে কেবলই রত্নরাজি খনন ক'রে তুলে স্বর্ণকারকে নিবেদন করছে—কারণ স্বর্ণকারই কেবল তা কেটে ছেঁটে ঘ'সে মেজে রাজার মাথার মুকুট, রাণীর কণ্ঠের মণিহার, প্রস্তুত করতে পারে,—আমি আজ ঐ মজুরদের, স্বর্ণকারের নই। যে হতভাগ্যদের অঙ্গহানিতে আজ ভাস্কর্য্যকলা ও চিত্রশিল্প পূর্ণাঙ্গ হ'চ্ছে, আমি তাদের ঘোর অমানিশার, শিল্পীর দিব্যালোকের কেহ নই। শিল্পী সকলকার সব পার্থিব সম্পদ লুঠ ক'রে এক অলৌকিক আদর্শ গ'ড়ে তুলছে, সব লাভ সব প্রশংসা সব নিপুণতা তার ভাগ্যেই পড়ে, আর যারা তাদের রক্তমাংসের পুঁজিসর্ব্বস্ব দিয়ে তার সেবা করছে, শিল্প না জেনে, না চিনে, অজ্ঞানের বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত এতদিন সেবা ক'রে এসেছে, তারা কেও নয়? না, না, আমি আজ তাদের। শিল্পী আমার কেও নয়। হায়! আমাকে কি তারা পুষ্যি নেবে।

বিশ্বের হাট

বিশ্বশিল্পী।—(স্বগত) আজ হাটের বাজার এমন খালি কেন? কই তন্তুবায় সূতা আনে নাই ত, রং-ওয়ালা রং গুঁড়া করেনি। আজকে না বণিকের হীরার টুকরা আন্‌বার কথা ছিল? কই পাথর কই? এবার প্রদর্শনীতে যে একটা নূতন ছন্দে নর্ত্তকীমূর্ত্তি গ'ড়ে দেওয়া চাই,—নটরাজে আর লোকের মন পাওয়া যায় না,—কই সে মেয়েটাও ত আসেনি। আর সেই বুড়োর আজ শেষ দিন ছিল, আজকে হ'লেই তাকে দিয়ে আমার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। আজ সবাই মিলে কি যেন একটা ষড়যন্ত্র করেছে, তাই হাটের দরবার আজ এমন খালি। দিনটা তবে বৃথাই গেল। না, ঐ যে এদিকে কারা আস্‌ছে। (প্রকাশ্যে) আজ তোমাদের এত দেরী হল কেন?

রং-ওয়ালা।—দেরী? আজ দেরী হয়েছে, কাল থেকে আর আস্‌ব না। আমরা আর রং পিষ্‌তে পার্‌ব না। হাড় গুঁড়া হ'য়ে গেল।

তন্তুবায়।—আমরা আর সূতা কাট্‌বো না। আর পট্টবস্ত্র বুন্‌বো না। সেযে আমাদেরই গলার ফাঁসী।

স্বর্ণকার।—মজুর আর আঁধারে খনিতে কাজ কর্‌তে রাজী নয়। এবার আমার সোণার চাষ মাটি।

মডেল।—আমি তোমার মডেল হবো না। আমাকে দিয়া সুন্দর মূর্ত্তি আঁক্‌ছ তাতে তোমার লাভ, আমাকে কি দিলে? আমাকে একজন চাষী ভালবাসে। সে আমার পাষাণে প্রেম জাগাইয়াছে, আমি তার।

বৃদ্ধ।—সবটুকু ত দিয়েছি, একদিন আর বাকী। শেষ দিনটা না হয় আমারই থাক্। তুমি পূর্ণ হবে, আর আমি শূন্য হ'য়ে যাব? না, তা আর হবে না।

বিশ্বশিল্পী।—হাঁ, তাই ত দেখ্‌ছি। এতদিনে তোমাদের চোখ ফুটেছে।

কিন্তু তোমরা আমাকে সাহায্য না করলে সংসার চলবে কেমনে? তোমরা খাবে কি? কর্ম্মের বিনিময়ে মুদ্রা পাও, তাহাতেই তোমাদের লাভ। মুদ্রাতে কি তোমাদের প্রয়োজন নেই বলতে পার? তোমরা শ্রমজীবী, আমি শিল্পী, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করি।

দলনায়ক।—হুঁ, প্রাণের বিনিময়ে মুদ্রা দিতেছ। একদিকে সবটুকু প্রাণ, অপরদিকে মুদ্রা, যাহা লোহার গুলির মতন আমাদের বুকে বাজ্‌ছে, ক্রমেই কঠিন হ'য়ে জমাট বাঁধছে, তাল পাকাইয়া এক জগদ্দল পাথরের ন্যায় আমাদের চাপিয়া ধরিয়া শ্বাসরোধ করছে। তরলতাটুকু সব হরণ করেছ, দিয়াছ কত যুগের পুরাতন জমাট হিমানী। আগুনটুকু সব তোমার ভাগেই। তোমার ওই আগুনের বখ্‌রা একটু ছেড়ে দাও ত, ঠাকুর! শীতল কঠিন ক'রে আর প্রাণে মেরে ফেলতে দেবো না। এই যে পিপীলিকার শ্রেণীর ন্যায় আমরা তোমার মঞ্চতলে দিন-গুজরান করি, তোমাকে ওই উচ্চাসনে দেখে আমাদেরও উঠ্‌বার উড়্‌বার সাধ হয়েছে। আমরাও তোমার মতন হাল্কা ও তরল হ'য়ে উড়ে যেতে চাই। কে জানে কোথা থেকে মাঝে মাঝে আসে কোন্ আগুনের হল্‌কা, কি যেন একটা প্রাণের ভিতর দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে, আর অমনি তোমার সকল বন্ধন জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যায়, তোমার কলকারখানা সব শূন্য হ'য়ে যায়, তুমিও নাই, আমরাও নাই, সব ভোঁ ভোঁ, সব ধূ ধূ, সব ফাঁকা!

বিশ্বশিল্পী।—(স্বগত) এ কি! আমাকেও হল্কার আঁচ লাগল বুঝি। আমার নিজেকেই যেন শূন্য বলে ঠেকছে।

সহকারী নায়ক।—টাকা চাই না এমন নহে, কিন্তু প্রাণও যে চাই, শুধু টাকায় চলে না, প্রাণের জন্যই টাকা।

বিশ্বশিল্পী।—(স্বগত) এ ছোঁড়াটা হুঁসিয়ার। এর কথায় আমারও আবার হুঁস ফিরে এল। (প্রকাশ্যে) প্রাণ? প্রাণ ত অন্নে, আর অন্ন

এই মুদ্রায়। মুদ্রার অভাবে অন্ন কি ক'রে মিল্‌তো? মুদ্রা জড়? কঠিন? এই জড়ই যে অন্নপূর্ণার পীঠস্থান। এই জড় মুদ্রার সৃষ্টিতেই যে অন্নের কারবার চল্‌ছে। এই জড়ের ছাঁদ না হ'লে সমাজের, সংসারের বিনিময় চল্‌ত কি প্রকারে? হাতে হাতে চালাচালি হ'য়েই এই ছাঁদি মুদ্রা অন্নবিতরণে সহায় হয়। আর এই মুদ্রার ছাঁদও অসংখ্য,—সোনা, রূপা, তামা, ভিন্ন ধাতু, ভিন্ন ওজন, ভিন্ন দর! কে অন্নপূর্ণার পীঠস্থান গণনা করিবে।

মহাজন।—(স্বগত) সে আমি। আমি গণিয়া গণিয়া দর দস্তুর করিয়া লোহার সিন্দুকে তুলিয়া রাখি। আমি জ্ঞানী!

ব্যাপারী।—ভিন্ন দর? বিশ্বে এমন কিছু নাই যাহা ঐ মুদ্রার মূল্যে বেচিতে না পারি, কিনিতে না পারি। (স্বগত) ঠাকুর, তোমাকেই কি ছাড়ি! সময় বুঝিয়া তোমাকেও বেচিয়াছি, তোমাকেও কিনিয়াছি।

সহকারী নায়ক।—কেবল আমাদেরই কি মুদ্রার অভাব আছে, তোমার তাতে প্রয়োজন নেই?

বিশ্বশিল্পী।—আছে, আমার অভাব আছে সত্য। যার অভাব আছে সেই অপরের অভাব দূর কর্‌তে পারে। যার অভাব নেই সে পারে না। আমার অভাব ও তোমাদের অভাব উভয়ে একত্র এই মুদ্রার ভিতর বাস কর্‌ছে। তোমরা যা চাও তা উহার ভিতরই পাবে। বেচে নাও।

দলনায়ক।—এ সব হেঁয়ালি বুঝি না। সোজা কথা শুন্‌তে চাই। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিতে পার কি?

বিশ্বশিল্পী।—ওই মুদ্রার ভিতর প্রাণ আছে, অন্নপূর্ণার অন্নশক্তি।

বৃদ্ধ।—অন্নপূর্ণা? আমরা ত মালেকাকেই অন্নপূর্ণা বলে জানি। আমরা শ্রমজীবী, তিনি আমাদের সকলের ছোট মা। এরা আজ ছোট মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে কর্ত্তার সঙ্গে বোঝা পড়া কর্‌তে এসেছে। কর্ত্তা আবার কোন্ অন্নপূর্ণার কথা বল্‌ছ?

ব্যাপারী।—আরে বুড়ো, বুঝলিনে, এ সেই অন্নপূর্ণা যার অন্নছত্র কেও দেখেনি।

সহকারী নায়ক।—না, এ সেই অন্নপূর্ণা যে সকলকে নেমন্তন্ন ক'রে যজ্ঞবাড়ীতে ডেকে এনেছে—ত্রিভুবন আজ দুয়ারে উপস্থিত—সকলকার মুখে একই বুলি, অন্ন কই অন্ন কই!—দাও দাও!—কতকালের ফাঁকা মন্দিরে আজ একটা সোরগোল একটা হাঙ্গামা পড়ে গেছে—কিন্তু প্রথম পাতেই দেখা গেল অন্ন একেবারে অনাটন—আসল ফর্দ্দেই ভুল!—লোক সংখ্যা করেনি রে! লোক সংখ্যা করেনি! বিষম গোলযোগ! তারপর? তারপর আর কি? অন্নের লুঠ্—শেষে অন্ন নিয়ে হাতাহাতি মারামারি কাটাকাটি—দেখ আজ ভুবনে কুরুক্ষেত্র!

বিশ্বশিল্পী।—আফসোস্, আফসোস্! কি বিষম ভ্রান্তি! নিয়ত, তোমারি জয়! হে অন্নার্থি! অন্নপূর্ণার অন্নের কম্‌তি নাই, ঘাটতি নাই। তাঁর ভাণ্ডার সদাপূর্ণ, অফুরন্ত বাড়ন্ত। তিনি যে অন্নময় কোষের অধিষ্ঠাত্রী। যাহা কিছু দৃশ্য শ্রব্য লেহ্য পেয়, ভোগ্য গ্রাহ্য, সকলই সেই অন্নময় কোষে অধিষ্ঠিত। জড়শক্তির অনন্তরূপ সেই অন্নপূর্ণারই রূপে। এই যে সৃষ্টির দাহ, সে ত অন্নেরই পাক। আবার শুধু ভোগ্য নয়, অসংখ্য ভোগকায়াও সেই অন্নপূর্ণার সৃষ্টি। তিনি শাশ্বতী প্রসূতি (Fecundity), তাঁহার বিরাট দেহ হইতে অসংখ্য প্রজা বহির্গত হইতেছে আবার তাঁহারই বিরাট দেহে প্রবেশ করিতেছে। তিনি গর্ভাশয়ে গর্ভবীজ, চষা ভূমিতে উর্ব্বরতা, আকরে রত্নপ্রসূতি। অসংখ্য ভোগকায়া ও অফুরন্ত ভোগ্য বস্তু খালাস করিয়াই তিনি খালাস। মুখ ও খাদ্য একত্র করার ভার বিধাতার।

ব্যাপারী।—(স্বগত) ভুল! ভুল! সে ভার এই ডান হাতখানির।

মহাজন।—(স্বগত) বুজরুকী, সব বুজরুকী! এই জড়শক্তি অন্নপূর্ণা একটা মুখোস মাত্র! অন্তঃসারশূন্য! ভিতরে কেবল খড়, তাতে শীষ নাই। সব শস্য ত আমার গোলাঘরে মজুত। আমিই অন্নপূর্ণার পুষ্যিপুত্তুর।

সহকারী নায়ক।—অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার অফুরন্ত, আর আমাদের অন্নের এই খাঁকতি! ভাণ্ডারী কে? চাবী কৈ? তুমিই তবে ভাণ্ডারী?

বিশ্বশিল্পী।—তোমাদের এই বিদ্রোহে আমাদের সবাইকারই লোকসান। কেবল অন্নপূর্ণার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তিনি শাশ্বতী রত্নগর্ভা হ'য়ে থাক্‌বেন। কেবল সে রত্নের ভাগ আমরা পাবো না। তাই বলি অন্নকে ত্যাগ ক'রো না। দ্রোহ ক'রে অকল্যাণ করো না।

দলনায়ক।—অন্নপূর্ণার অন্নে আমাদের প্রয়োজন আছে বুঝি,—তোমারই কি নেই? কিন্তু বল দেখি, তোমার ওই নীলফ্রেমে আঁটা ছবি, ঐ চাঁদোয়া ঝাড় লণ্ঠন রোসনাই, ঐ সোনালি জরির ফিনফিনে উড়ানী, ঐ মাথায় হীরার জাজ্বল্যমান মুকুট, ওই সুন্দর নটবরের বেশ, শুধু অন্নের বিনিময়ে বেচ্‌বে কি? নানান্‌ রস নানান রং দিয়ে যে নানা ছাঁদে সুন্দরের আদর্শ গ'ড়ে তুল্‌ছ, তাতে কি শুধু অন্নই সহায়, আর কিছুর প্রয়োজন নাই?

বিশ্বশিল্পী।—তা ত নয়। অন্নে আমার পেট ভরে না। তোমাদের ঐ রং তুলি পট, ঐ রেশম ও পট্টবস্ত্র, ঐ মণিমুক্তা-মরকত, ঐ শ্বেত কৃষ্ণ লোহিত মর্ম্মর খণ্ড, সবই আমার চাই। সর্ব্বাপেক্ষা চাই তোমাদের মুখ চোখ, হাত পা, বুকের রক্ত ও মাথার ঘাম। অন্নকে চাই না, তোমাদের চাই। আর তোমরা যা দাও তার বিনিময়ে দিই এই মুদ্রা!

দলনায়ক।—ঠিক কথা, টাকা দাও বটে, কিন্তু তুমি যাহা দাও তাহা ত সুদসমেত ফিরিয়া লও। তোমার কিছুতেই লোকসান নেই। আর আমরা!—বুদ্ধিমান মহাজনেরা আমাদের টাকাগুলি সব নিয়ে তহবিলে জমা করছে, আর আমাদের মুষ্টি ক'রে অন্ন দিচ্ছে। আর তুমি ঐ জ্ঞানীদেরও একদিন তোমার মোহিনীশক্তিতে যাদু ক'রে মুদ্রাগুলি আবার সব আদায় ক'রে নাও। মুদ্রাতে প্রাণ আছে এ কথা আগেই বলেছ;—তবেই দেখ প্রাণটুকু সব নিজেই উপভোগ করছ।

বিশ্বশিল্পী।—আমার কাছে ফিরে আসে যত ভাঙ্গা কাটা অচল মুদ্রা। তখন তার সারটুকু তাতে থাকে না। সারটুকু দিয়ে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের আমদানি রপ্তানি হয়, সেই অন্নের মুঠা তোমরা পাও। আমি পাই শুধু ছাঁদটুকু। তাতে আবার প্রাণভরে মোহরের ছাপ লাগিয়ে তোমাদের দিই।

দলনায়ক।--বৃথা ছাপ! মুদ্রাতে প্রাণ থাকলে প্রাণ পেতাম না? মুদ্রাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রাণের অভাব সে পূরণ করতে পারে না। বুঝেছি অন্নপূর্ণার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে আমাদের এতগুলি প্রাণকে মুদ্রাতে পরিণত করা হয়েছে। সেই মুদ্রা কেবল তোমাদের উভয়েরই অভাব দূর করতে পারে। তোমাদের কারখানা, কারবার, এই জড়ের ছাঁদ না হ'লে চলত কি ক'রে? কিন্তু এ কারবারে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। এ ত তোমরা ও আমরা মিলে যৌথ-কারবার চালাই নি। এ যে সব লাভ তোমাদের ভাগে, সব লোকসান আমাদের,—স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের কারাক!

বিশ্বশিল্পী।—লোকসান! অন্নপূর্ণার অন্নে যে সার সে ত তোমাদেরই ভাগে। আমরা ত অন্ন গ্রহণ করি না। সারটুকু ত আমরা কেহই লই না, তবে আর লাভ নাই বলছ কেন?

সহকারী নায়ক।—কর্ত্তাদের চাতুরী সব বুঝি। অন্নপূর্ণার অন্নে সার নেই, সে শুধু তুষ! তুষ দিয়ে আর চলবে না। সার তোমরা নাও না? (শ্রম-জীবীদের প্রতি) কেও তবে এর মাঝে আছে রে! কেও আছে যে সবটুকু নেয় আমাদের কিছু দেয় না। ঐ জ্ঞানী মহাজনেরা বুঝি? না কোনও ঐন্দ্রজালিক, কোন যাদুকর? আর আমরা সবাই ছায়াবাজির ছায়া! কেও আছে নিশ্চয়, নতুবা আমরা এমন জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে পড়ছি কেন? শক্তি কোথায় গেল?

দলনায়ক।—ঠাকুর, শক্তি কি ঐ শিল্পে? তাই সৃজন করছ। আমরাও যে এক একটি নিজ নিজ জগৎ সৃজন করতে চাই। তুমি শিল্পী, তুমিই সৃজন-

কর্ত্তা হবে। আর আমরা কেবল সৃষ্ট বস্তু হ'য়ে থাকৃব। আচ্ছা, সোনা রূপার বদলে তোমার ওই সূক্ষ্ম প্রাণময়ী কলাশক্তি দিতে পার?

সহকারী নায়ক।—না, না সূক্ষ্মে হবে না, সূক্ষ্মে শক্তি নাই। তোমার হাতের ঐ রাজদণ্ড দিতে পার? ঐ মহাজনগুলাকে একবার সরাইয়া দিই। মহাজনদের দাদনের কিছুমাত্র দরকার নেই। আমরা তখন অনন্তপ্রসবা অন্নপূর্ণাকে কর্ষণ ক'রে অন্ন উৎপাদন করতে পারবো। এইবার একেবারে মুখোমুখী হ'য়ে অন্নপূর্ণার সঙ্গে কারবার চালাব। এই যে এক হাত থেকে অপর হাতে ঘোরা,—এই হাতে হাতে চালাচালি করতে করতে কে যে মাঝে থেকে সারটুকু ফুকে নেয় তার ফাঁকি ধরা পড়ে না। এবার আর মাঝে থেকে কাকেও সর্দ্দারী করতে দেওয়া হবে না। কারখানার মালেককেও নয়, মহাজনদিগকেও নয়।

শ্রমজীবীগণ।—(সহকারী নায়কের প্রতি) ঠিক্ ঠিক্, কেউ নায়ক থাকৃবে না, কেউ নায়ক নয়!

মহাজন।—(স্বগত) না, এ সয়তান বশ করা আমার কাজ নয়। কোন্ দিন আমার গোলাঘরে আগুন লাগায় বুঝি! অতীতের সব সঞ্চয়, সকল গচ্ছিত ধন, আমার কাছে মজুত। অ্যাঁ, এরা লুট করবে! সব মামুলী দখলী সম্পত্তি, সব পৈতৃক ভিটাবাড়ী, এরা লণ্ডভণ্ড করবে! অ্যাঁ অ্যাঁ......

ব্যাপারী।—(স্বগত) বলে কি? হাত চালাচালি বন্ধ হ'লে ত আমার ডান হাতও চলবে না!

বিশ্বশিল্পী।—জানি জানি, মুখোমুখী কারবার জানি! তোমরা যে আমার সঙ্গে মুখোমুখী হ'য়ে কারবার চালাতে পারো না তাই আমার দুঃখ। আমি যাহা গঠন ক'রে তুলছি তা ত তোমাদেরই জন্য। সে যে সকল প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ, সকল রসের রস একরস। সেই একরস—আমার স্বরূপ—তোমাদের দান করিতে গিয়াও দিতে পারি না। তাই আমি পাতলা হ'য়ে ধীরে ধীরে সকলের ভিতর দিয়া নেমে আস্‌ছি। কিন্তু পাতলা হ'তে হ'তে সার

কমে আসে, শক্তি ক্ষীণ হয়, আর কোথা থেকে কত ভেজাল এসে মেশে। তাই এই বিশ্বের হাটে আমার নামে আমার মার্কায় দুগ্ধ ঘৃতের পরিবর্ত্তে বসা বিক্রয় হয়, তাই চাল ময়দায় খড়িমাটি! হায় রে! সে অন্নে তোমাদের পুষ্টি হয় না, তোমরা শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছ। তোমরা আমায় কিনে নেবে স্থির করেছ। কিন্তু ঐ ভেজাল না হলে যে তোমরা মূল্য দিতে পার না। খাঁটি জিনিষ কিনিবার সামর্থ্য তোমাদের নেই। তা আমারই কি দোষ?

দলনায়ক।—এই মুদ্রার কারবার, এই হাত চালাচালি, বন্ধ হ'লেই আমাদের কেহ ফাঁকি দিতে পারবে না।

বিশ্বশিল্পী।—শুধু তোমাদের ভাগ্যে এই হাত চালাচালি নয়;— আমাকেও তোমাদের অন্ন প্রাণরস সরবরাহ করতে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে এই ঘোর্‌ফেরে পড়্‌তে হয়। এই ঘোর্‌ফেরের ভিতর দিয়া তোমরা আমাকে পাও, আমি তোমাদের পাই। তোমরা যেমন হাতে হাতে ফিরে ধাপে ধাপে উঠে আস্‌ছ, আমাকেও তেমনি তোমাদের মতন কত হাত ঘুরে ঘুরে ধাপে ধাপে নাম্‌তে হচ্ছে। আমি লাটাই ঘুরাতে ঘুরাতে কেবলই সূতা ছাড়ছি, আর তোমরা কেবলই তাকে তোমাদের লাটাইয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গুড়িয়ে নিচ্ছ। এই সূত্রবন্ধ ছিঁড়তে চাও? তা'হলে যে আমার টান ছাড়া হ'য়ে কোথায় যে যার ছুট্‌কে পড়বে, আমিও তোমাদের সন্ধান পাবো না। তাই বলি বিদ্রোহ করো না; মুখোমুখী হ'য়ে কারবার কর্‌বে ত একবার মানুষ হ'য়ে উঠ দেখি। পুরা মানুষ, গোটা মানুষ, আর সিকিও নয় আধখানাও নয়। বিকলাঙ্গ নয় পূর্ণাঙ্গ। এবার আমি তোমাদের জন্য পাঠ-শালার বন্দোবস্ত করেছি, তোমাদের বংশে এ যুগে কেহ আর অশিক্ষিত থাক্‌বে না, কেহ অসহায় অপোগণ্ড থাক্‌বে না। সকলের জ্ঞানচক্ষু ফুট্‌বে সকলকে মানুষ হবার রাস্তা দেখান হবে। তাই বলি, একবার তোরা মানুষ হ।

শ্রমজীবীগণ।—মানুষ হ'তে হবে? কর্ত্তাই একবার মরদ হও দেখিনি।

মজুর না হ'লে কি দিন-মজুরীর কদর বোঝে? হামদর্দী জান্‌বে কি করে?

সরকারী নায়ক।—আমরা বিকলাঙ্গ? অনন্তাবয়বা প্রকৃতির ক্রোড়ে যাহারা পালিত, তাহাদের যে অঙ্গহানি, তাহা ত তোমার কল কারখানা খনির দওলতেই। কিন্তু আমরা পুরুভুজের বংশ, মাটি খাই, আর নব কলেবর পাই, বংশক্রমে আমাদের ভগ্ন ক্ষত সারিয়া যায়। তাই ঐ কুব্জের হাত ধরিয়া ঐ কচি ফুটফুটে মেয়েটি! মালেক গোষ্ঠীতে ক্রমিক অবনতি, আমাদের গোষ্ঠীতে সেরূপ নয়।

দলনায়ক।—শিক্ষার বন্দোবস্ত? শিক্ষা কার? মজুরের না মনিবের? আমাদের গোষ্ঠীতে না মালেক গোষ্ঠীতে? মানুষ? আর আধখানা নয়, পুরা মানুষ!* কে আধখানা, কে গোটা? কে বেশী পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণাবয়ব, শিল্পী না শিল্পীর মডেল? তুমি শিল্পী, সৃষ্টি কর্‌ছ সত্য, আর আমরা তোমার সৃষ্টির উপকরণ। যে উপকরণ হ'তে পারে তার স্বত্ব কি ওজনে বেশী নয়? সে কি বেশী দেয় না? সে কি শিক্ষার চরমে, শুদ্ধ স্বাভাবিকতায়, স্বতঃ উপস্থিত হয় নাই? তুমি শিল্পী, আমরা উপকরণ, শুনিবে তোমায় আমায় প্রভেদ?.........ঐ যে তোমার শিল্পাগারের নাচঘরে ঐ ভবঘুরে নর্ত্তকী রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করে তার কৃত্রিম ভাব ভঙ্গীতে দর্শকদের মুহূর্ত্তের তরে রঙ্গীন নেশার ঘোরে মুগ্ধ করছে, আর নাচের তালে তালে পিটে ষ্টলে গ্যালারীতে করতালি পড়ছে, নাচের ঠমকে ঠমকে দর্শকদের ঘন ঘন মাথা নড়ছে পা দুল্‌ছে, আর "বাহবা", "কেয়াবাৎ", "বহুত আচ্ছা" আসর গরম ক'রে জমিয়ে তুল্‌ছে,...আমরা কেবল সেই নর্ত্তকীর মঞ্চটি শক্ত ক'রে বেঁধে দিই, দর্শকবৃন্দের জন্য তার মুখের সাম্‌নের পর্দা তুলে দিই, সময় বুঝে যে স্থানে বাতি জ্বেলে দিলে তাকে সুন্দর দেখাবে ঠিক সেইখানে বাতি জ্বালি নেবাই; আবার দর্শকের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য তাকে পর্দ্দার আড়ালে রাখি—আমরা কেবল ছায়ার মতন আসি, ছায়ার মতন

যাই,—এই যে আমরা তোমাদের সবাইকে মহান ক'রে তুলছি, ইহার ভিতর শিক্ষা অশিক্ষার হিসাব নিকাশ ক'রে নাও। ঐ যে মাঝি গিরিনদীতে লগী মেরে মেরে সূর্য্যাস্তের দেশে ভেসে যাচ্ছে, তুমি তাকে দেখে একটা গান রচনা ক'রে পারাপারের আনন্দ পাও ও দাও,—ঐ অশিক্ষিত নগ্নদেহ মাঝি যেমন তাহার অবয়বের পেশীতে পেশীতে শিরায় শিরায়, হস্তের চালনায় ও গ্রীবার ভঙ্গিমায়, একটা সত্যিকার পরিস্ফুট প্রাণময় মূর্ত্তি হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি তেমনি ক'রে ঐ নটবর বেশ ছেড়ে মাঝির সাজে একবার দাঁড়াও দেখি, প্রভু! ঐ যে পথের ধারে শিরীষ ফুলটি কুঁড়ির ভিতর থেকে ফুটে উঠে সত্য হ'য়ে উঠেছিল আবার এখনি ঝরে পড়ে সকল সত্য বিসর্জ্জন দিয়ে অরূপী হ'য়ে গেল, তুমি কখনও কুঁড়ি থেকে ফুটে উঠবার সুখ সৌভাগ্য পেয়েছ, প্রভু? ঝরে পড়তে শিখেছ কি প্রভু? শিরীষ ফুলের কাহিনী পটের উপর তুলি দিয়ে আঁকতে পার, ফুল হতে পার কি? পরের বুকের রক্ত, পরের মাথার ঘাম, তোমার সম্বল! একবার তোমার রক্ত দাও দেখি, তোমার রাগে আমাদের রঞ্জিত কর দেখি! আমরা যেমন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, অজ্ঞানে তোমাকে গঠন করে তুলছি,—তুমি যা নিয়ে জ্ঞানের সৃষ্টিতে আদর্শ গড়ে তুলছ—তার বিনিময়ে আমরাও তোমার প্রাণটুকু ভিক্ষা করছি। প্রাণ চাই, অঙ্গসম্পদে আমরা হীন নই, কিন্তু প্রকৃতি মাতা তাঁহার স্তন্যদানে আজ আর আমাদের ক্ষুধা মিটাইতে পারেন না। প্রাণ দিয়েই যে প্রাণের ক্ষুধা মেটে। তোমার প্রাণটি চাই!

শ্রমজীবীগণ।—(সমস্বরে)—চাই!

(বৈকুণ্ঠধামের পাহাড় হ'তে প্রতিধ্বনি—চাই!)

বিশ্বশিল্পী।—আমার প্রাণ? তাই দিয়েই ত তোমাদের প্রাণ দান করেছি।

সহকারী নায়ক।—সে ত কেবল শীকার—সুখের জন্য! শুধু মায়া হরিণে শীকারীর ক্ষুধা মেটে না। কাঠের হরিণেও নয়। তাই জ্যান্ত মৃগ সৃজন

করে ছেড়ে দিয়েছে! সেই মৃগয়ার কাহিনীই এ নীলপটে এঁকেছে এ রাশিচক্রের ছবিতে! তুমি ঐ ব্যাধ, আমরা মৃগশিরা!

দলনায়ক।—প্রাণ দান করেছ? তুমি সে প্রাণ ভোগ করিলে, আমরা প্রাণ পাই কেমনে! সৃষ্টি কর্‌বার সময় এ কথা ভাবা উচিত ছিল। আজ তোমার সৃষ্টির দাবী তোমাকে পূরণ কর্‌তে হবে, ঠাকুর! প্রাণ দিতে হবে!·· একবার মরিতে শিখিলে না! তোমার মৃত্যু বিনা আমরা বাঁচিব কিসে? তোমার স্বতন্ত্র সত্তায় যে আমরা শূন্য হয়ে যাই। যতই তুমি বড় হয়ে উঠছ, এ যুগে দিনে দিনে যতই তোমার আকাশ বেড়ে যাচ্ছে, ততই আমরা ছোট হ'য়ে যাই! যতই তুমি দীর্ঘায়ু হও, তোমার যুগ কল্প মন্বন্তরের গণনায় আদি অন্ত হারাইয়া যায়, ততই আমরা স্বল্পায়ু হ'য়ে যাই। আমাদের বংশ নাকি পঙ্গপালের বংশ, দুদিনের তরে মাটি হ'তে উঠেছে আবার মাটিতেই মিশাবে। তাই হোক্, মাটিতে পড়ি,—কিন্তু, মালেক, আজ তোমাকে তোমার সৃষ্টি জড়াইয়া আঁকড়াইয়া তোমাকে মঞ্চ হ'তে পাড়িয়া পড়িবে। আমরাও মাটি, তুমিও মাটি!

(শ্রমজীবীগণ সমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে):—

মাটি! মাটি! সব মাটি!

বিশ্বশিল্পী।—(সচকিত) এদের খুন চেগেছে! (উচ্চৈঃস্বরে) মাটি! মাটি! অন্নপূর্ণার দেহ, মাটি! ঐ! ঐ! (খাদের নিম্নভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

শ্রমজীবীগণ।—ঐ অন্নপূর্ণা! ঐ! ঐ! ··অন্নপূর্ণা! পাষাণী! চল্ রে সবে চল্, আজ একবার অন্নপূর্ণার দেহ উৎপাটন ক'রে আসি। দেখি এ শিল্পী আমাদের জন্য কি রেখেছে। আর যদি ফাঁকি হয়, তবে—তবে আবার ফিরে আস্‌ছি। আজ আর ছাড়্‌ছিনি। একটা রফা করতেই হবে, দফা রফা! দফা রফা! (সকলে চীৎকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে খাদের দিকে প্রস্থান) দফা রফা···রফা···ফা···া···া···

* * * *

পর্ব্বতসানু (নিয়ে খাদ, এক পার্শ্বে কুটীর)

বিশ্বশিল্পী।—(কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আমার সে কোথায় গেল! সেই আমার বন্ধু যাকে সহায় ক'রে এত বড় সংসার গড়ে তুলছি। বন্ধুও আজ আমায় পরিত্যাগ করিলে? কুটীর খাঁ খাঁ করছে। অনাদি কাল হ'তে আমি ছিলাম—শূন্য! আবার অনন্ত কাল ধরে শূন্য হ'য়ে যাব! যাব! বন্ধু! যাব! তোমার মনস্কামনা আজ সিদ্ধ করব। ওকি, আকাশে ও কিসের ছটা—খনিতে আগুন লাগ্‌ল নাকি?—না, ভুল হয়েছিল, ও দিক্‌প্রান্তে রাঙ্গা মেঘ—ঐ যে মিলিয়ে গেল—যাব! বন্ধু! যাব। তোমার বড় সাধ ছিল আমি এই "বৈকুণ্ঠধাম" ছেড়ে, এই রাজদণ্ড ছেড়ে, হাল হাতে ধরি, আর তুমি কৃষকপত্নীর মত দুপুরবেলা ক্ষেতের আল দিয়ে বাঁশঝাড়ে আমার জন্য একটা কাঁসায় ক'রে শাকান্ন লইয়া আস। বল্‌তে, সখা আমি শিল্পরাণী হ'তে চাই না, আমি সত্যিকার রাণী হব,—তা ঐ কৃষকপত্নী।...আবার দুদিন পরে কর্‌লে অন্য আবদার। সে বিষম আবদার! বল্‌লে, ছাড় প্রভু ছাড়, আমাকে পাইলে যে তুমি অন্য কাহাকেও চাহ না। আমি বলিলাম, হৃদয়রাণী! তুমি সর্ব্বস্ব দিয়ে আমার এই শিল্পের মধ্যে বসবাস কর্‌ছ, তাই আমি শিল্পী। তুমি বিশ্বরূপবিলাসিনী বিশ্বদলবাসিনী। তোমার রসে বিভোর হ'য়েই আমি সৃষ্টিকে রস দান করি। তুমিই সৃষ্টিকে সুষমায় পূর্ণ করিতেছ। সুষমায়......ও আবার কি, এ যে জ্বালা! সৃষ্টি আজ জ্বালামুখী, সহস্র জিহ্বায় জ্বলে উঠেছে! এমন রক্তিম আভা ত কখনও দেখি নাই!—যাক্ যাক্, এখনই নিব্‌বে, আজ অমানিশা...... বন্ধু, তুমি বল্লে "সখা, অন্নপূর্ণার অন্নশক্তি মুদ্রায় পুরিয়া দিয়াছ...... সুষমায় সৃষ্টিকে পূর্ণ করিয়াছ......তাতে সংসারের কুলাইল না। আজ তোমার হৃদয়রাণীকে টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে বিলাইয়া দিতে পার, তবেই সৃষ্টি বাঁচে।" আমি হাসিলাম। রাণী রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে, হাস! হাস! তোমার ঐ সর্ব্বনেশে হাসি ও খেলা! আর কতকাল এ

পাহাড়ের গায়ে "বৈকুণ্ঠধামের" বারন্দা থেকে গভীর নিশীথে আঁধারে ব'সে ব'সে দেখ্‌বে নীচে পাহাড়ের তলদেশে থাদে থাদে সহস্র সহস্র হাপর চুল্লী অগ্নি উদ্‌গীরণ করুছে ও যে আমার হৃদয়ে চুল্লী জলে! ঐ যে কটাহে কটাহে রসের পাক!—উঃ! তোমার শিল্পের দোহাই আমায় রেহাই দাও! আমিও মানবী, মানবকুলের প্রতিনিধি—আমার স্বগোষ্ঠীতে ফিরে যেতে চাই।"......না না, রাণী আজ তোমার কথায় আমার ঘোর ভেঙ্গেছে! আজ বুঝেছি আমাকে পত্তন পরিবর্ত্তন করতে হবে। বুঝিবা বৈকুণ্ঠধাম না ছাড়িলে মর্ত্ত্যের পীঠস্থান শূন্য হ'য়ে যায়!......আজ এত দেরী কেন? বন্ধুও কি আমায় ছেড়ে গেল? সে আসে না কেন?

"আমি"র প্রবেশ

আমি।—হাঁ, তাই স্থির করে আমি আজ বাহির হয়েছিলাম কিন্তু বাহিরে যা দেখ্‌লাম তাতে বুঝলাম, আজ প্রভুর পার্শ্বেই আমার স্থান। আমাকে না হ'লে প্রভুর আজ চল্‌বে না।

বিশ্বশিল্পী।—হাঁ, পাশে এসে দাঁড়াও, আজ তোমাকে সাজাইব। মনের সাথে ঐ বরাঙ্গে যেখানে যে ভূষণটি সাজে, তাই দিয়ে আজ সাজাইব। জানি সৃষ্টি আমাকে ছাড়িলেও রাণী ছাড়িবে না।

আমি।—ছাড় ছাড় প্রভু, আজ আমি সেই সৃষ্টিরই প্রতিনিধি।

বিশ্বশিল্পী।—তুমিও, রাণী!

আমি।—আমিই। আমিই... পাশে দাঁড়াইয়া আজ প্রভুর ঐ রাজমুকুট ও রাজবেশ ছাড়াইতে আসিয়াছি! আজ প্রভুর সন্ন্যাস!

বিশ্বশিল্পী।—সন্ন্যাস? কেন, আবার নূতন ক'রে ঘট স্থাপনা করবো। এবার নূতন রস, নূতন রং, নূতন ছাঁদ। সব সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি, সব অনাসৃষ্টি।

আমি।—(স্বগত) এখনও প্রভুর সৃষ্টি করবার মোহ ঘুচ্‌ল না।

(প্রকাশ্যে নীচে ও উপরে চাহিয়া দেখিয়া) দেখ দেখ, জলে স্থলে আকাশে কি একটা আগুন আজ দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে সর্ব্বত্র প্রলয় যেন রণরঙ্গে মেতে উঠেছে। জনমানবের সংঘে সংঘে প্রলয়বার্ত্তা ঘোষিত হচ্ছে, পর্ব্বতশিখর হ'তে পর্ব্বতশিখরে, উপত্যকা হ'তে উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সকল রাষ্ট্রে সকল জাতিতে একটা তুমুল কোলাহল! শোন ঐ প্রলয় ভেরী! মুহুর্মুহু মেদিনী কম্পিত হচ্ছে; আর সংসার পথে যত অতীতের মূর্ত্তিশালা চিত্র কক্ষ......সাহিত্যাগার, যত ধর্ম্মশালা পান্থশালা দেবালয়, যত বিচারকক্ষ নীতিমার্গ শিক্ষালয়, একে একে ধূলিসাৎ হচ্ছে। যত নরনারীর গৃহ আবাস সংসার প্রতিষ্ঠা সেই সর্ব্বংসহা মাটিতে আশ্রয় নিচ্ছে। আজ স্বামী স্ত্রী, পিতা পুত্র, ভাই ভগিনী, সকল মন্ত্রপূত সংস্কারই নিরর্থক বীজমন্ত্রের ন্যায় শূন্য পথে মিলাইয়া যাইতেছে। অচিরে এক দাবানল সমস্ত সংসার বেড়িয়া জ্বলিবে। আকাশে তার পূর্ব্বাভাস দেখছ না! কি ঘোর রক্তিম আভা!

বিশ্বশিল্পী।—রসের সাগরে এই দাবানল নিবাইব। রসের আয়োজন করিয়াছি, ভয় নাই।

আমি।—প্রভু, এ প্রলয়কে বাধা দেবার শক্তি কোন রসেই নাই। এ মহা দ্রাবক, সকল রসের জারক।

বিশ্বশিল্পী।—এরও তবে একটা রস আছে? ধ্বংসে রস?

আমি।—এ প্রলয়ে যে নূতন সৃষ্টির বীজ। মানুষ, সমাজ, বিশ্বসংসার, সকলই নব কলেবর ধারণ করবে।

বিশ্বশিল্পী।—তবে আমার সৃষ্টির শেষ নেই!

আমি।—এবার মানুষের সৃষ্টি, তুমি এবার সরে পড়, প্রভু!

বিশ্বশিল্পী।—আমি সরি কোথায়? সরি কি ক'রে?

আমি।—ব্রহ্মত্বের লোপ ক'রে। একবার মানুষের সঙ্গে মানুষ হও, বহুর মধ্যে এক, একলা এক নয়। রাজদণ্ড ছাড়, হাল ধর।

বিশ্বশিল্পী।—রাণী, তোমার কি হবে? ব্রহ্ম ছাড়িলে তোমার আশ্রয় কোথায়! তুমি যে আমার বিশ্বরূপবিলাসিনী, রাণী।

আমি।—রসাতলে, পাতালে, যাই—সংসার বাঁচুক!

বিশ্বশিল্পী।—আত্মহত্যা! উঃ আত্মহত্যায় সংসার বাঁচবে!

আমি।—হাঁ, যুগে যুগে মানবকুলে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে "আমি"র সংহার দানলীলা সাধিত হয়েছে, তাই সংসার উদ্ধার পেয়েছে। আমার বেলা আজ ফুরিয়েছে।

বিশ্বশিল্পী।—ঘাতক! ঘাতক! রাণী, আমায় প্রাণে মেরো না।

আমি।—মার্‌বো! মার্‌বো! দুইএর সংহার না হ'লে বহুর উৎপত্তি কোথায়! এতদিন ছিল এক দুই তিন, আজ শুধু এক আর বহু। অন্নপূর্ণার দেহে এবার যুগল রসমূর্ত্তি মিশাইয়া যাবে। অন্নপূর্ণা ও এই অসংখ্য জীবের মাঝে কেহ থাক্‌বে না। এবার তৃতীয় নাই। চল,—পাতালে চল।—

বিশ্বশিল্পী।—না, না, তা আর হবে না। এ কি ভয়ানক! আমার হাতের গড়া ঐ বৈকুণ্ঠের মন্দির আজ ধূলিসাৎ হবে! কত যুগের চেষ্টায়, পরিশ্রমে, যা গড়ে তুলেছি তা কেমন করে ভাঙ্গবো!...ভাঙ্গবো!... ভাঙ্গবো!...আহা কি সুন্দর!...দাঁড়াও, একবার একটু সরে দাঁড়াও...রাণী মন্দির, মন্দির রাণী...আর একটু সরে! আরও—আরও!—দেখি শেষবার ..উঃ এতদিন দেখিনি ঐ মন্দিরের চূড়া কি উঁচু—বৈকুণ্ঠের আকাশও ভেদ ক'রে উঠেছে, এ চোখের দৃষ্টি সেখানে যায় না, ফিরে আসে! একটু যেন ঈশান কোণে হেলে পড়েছে না-- না,...চোখের ভ্রম......আমার গড়া! আমার! আমার! আমার!! নিজের হাতের গড়া জিনিষ কেমন ক'রে ভাঙ্গবো!...রাণী! রাণী...আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!...

আমি।—ভাঙ্গো! ভাঙ্গো! ভেঙ্গে ফেল। প্রাণের মায়া ছাড়তে হবে বন্ধু, প্রাণের মায়া ছাড়তে হবে। তোমায় কষ্ট দিলাম বন্ধু, কিন্তু আজ আমি শুধু তোমার হতে পারি না, আজ আমি সবাকার। আজ কলির শেষ দিন! এই কলির রঙ্গমঞ্চে এতদিন দুজনে অভিনয় করেছি; আজ

সখা বিদায়! বিদায়! আজ শুধু ঐ অন্নপূর্ণা অতীতের শবদেহ হ'য়ে সংসারে পড়ে থাক্‌বে। আর সেই শবদেহের উপর জয়োল্লাসে শ্রমজীবীরা তাদের বর্ত্তমান গড়ে তুল্‌বে। অতীত ভবিষ্যৎ কিছুই নাই। শুধু বর্ত্তমান। মা অন্নপূর্ণা, জগৎলক্ষ্মী দ্বিধা হও! সীতা যেমন রঘুপতিকে প্রত্যাখ্যান ক'রে মা বসুন্ধরার দেহে প্রবেশ করেছিল, ..আমিও মাগো! তেমনি তোমার আঁধার গর্ভে প্রবেশ করি! আবার যদি কোথায় কখন কোন দেশে কোন কালে কোনও কৃষকের করুণার উদ্রেক হয়, তবে সেও আমাকে সীতার মতন লাঙ্গলের ফালে তুল্‌বে। এস বন্ধু! শেষবার কোলাকুলি করি। বিদায়! বিদায়! চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল। মাটিতে কেবল রক্তস্রোত, আর আকাশে সেই রক্তের রক্তিম আভা। কোথা থেকে রক্তগঙ্গা ছুটে আস্‌ছে। কার রক্ত। আহা আহা বন্ধু আমার। বন্ধু! (অঙ্ক পাদে পতন,—পড়িতে পড়িতে) বন্ধু।...বন্ধু .. (বিশ্বশিল্পী মূর্চ্ছিত)

শ্রমজীবীগণ।—(কোলাহল করিতে করিতে) এই দিকে, এই দিকে! হা হা হা! কি মজা! কই কই! কই কুড়ুল, কই খোন্তা! আজ··· খণ্ড খণ্ড করে এই অন্নপূর্ণার বুক চিরে দেখ্‌ব শিল্পী কি রেখেছে। এই যে···এদিকে···সেই শিল্পী ভয়ে মরে পড়ে আছে। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আঃ কাপুরুষ, ভণ্ড! খোঁড়্, খোঁড়্, খোঁড়্, কোটি বাহুর জোরে, কোটি পায়ের দাপে! খোঁড়্, খোঁড়্, খোঁড়্ মেদিনী কাঁপিয়ে খোঁড়্! দেখ্ দেখ্, কত মণি, কত হীরা, কত সোণা! দেখ্‌ছ, সব এখানে লুকিয়ে রেখেছে! কিছু দেয় নাই। আসল মাল লুকিয়ে রেখে কেবল ধানের তুষ আর মেকি টাকা দিয়ে আমাদের প্রাণ কিনে নিচ্ছে- ছিল! কম্ চালাক নয়! এতদিন সব ফাঁকি, সব ফাঁকি! আয়, আয়, আজ সবাই এক একটি ক'রে এই মণি মাথায় পরি। শুধু রাজাই কি মুকুট পর্‌বে! আজ আমরাও মুকুট পর্‌বো। আজ সবাই রাজা, সবাই মালেক! কি মজা! কি মজা! হা হা হা! হা হা হা!!

(পরস্পর পরস্পরের কটি বেষ্টন করিয়া চক্রাকারে নৃত্য ও গীত)

(গীত)

কোমর বেঁধে চল্
আজ খুঁড়্‌বো মাটি, তুল্‌বো সোনা,
শুন্‌বো না আর কারো মানা,
চষ্‌লে মাটি ফল্‌বে দানা ;
এ যে অন্নপূর্ণার কল !
(সকলে সমস্বরে,—
পদক্ষেপ করিতে করিতে)
তবে ভাবনা কিসের বল্,
চল্‌রে সবাই চল্,
কোটি কোমর বেঁধে চল্ !
এই রসাতলে ডরাইনিরে,
এতেই মোদের সুখ !
এই ধসার উপর তুল্‌বো গড়ে,
ঘুচবে মোদের দুখ !
ও সেই শিল্পীর রক্তে টীকা প'রে
চল্‌বো ফুলিয়ে বুক্ !
ঘুচ্‌বে মোদের দুখ !

(সমস্বরে) তবে ভাবনা কিসের বল্,
চল্‌রে সবাই চল্,
কোটি কোমর বেঁধে চল্ !
আজ কেইবা রাজা কেইবা রাণী ;
সবাই সমান সবাই ধনী ;
মাটিতে আছে সোনার খনি,
বাহুতে আছে বল্।
(সমস্বরে) তবে ভাবনা কিসের বল্,
চলরে সবাই চল্,
কোটি কোমর বেঁধে চল্ !
চল্ অন্নপূর্ণার নাইকো মানা,
মাটি সবার, সবার সোণা,
নাইকো নাইকো মহাজনা,
দুনিয়া কার্ দখল !
(সমস্বরে) তবে ভাবনা কিসের বল্,
চল্‌রে সবাই চল্,
কোটি কোমর বেঁধে চল্ !

দৃশ্য

বিজন প্রান্তর—সূর্য্য অস্তগত। সুদূর পূর্ব্বে পর্ব্বতভূমি, "বৈকুণ্ঠধামে"র পাহাড় আঁধারে আচ্ছন্ন। পশ্চিমে কান্তার, দো-আলোয় ধূধূ করিতেছে। কান্তারের দিকে মুখ রাখিয়া লাঙ্গলে ভর দিয়া দণ্ডায়মান এক চাষী, অঙ্গে ও পরিচ্ছদে মাটির দাগ। একপাশে, পরিত্যক্ত মুকুট, রাজদণ্ড ও রাজবেশ।

যবনিকা পতন

শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তা।

সবুজ পত্র

কবির কৈফিয়ৎ

আমরা যে ব্যাপারটাকে বলি জীবলীলা পশ্চিম সমুদ্রের ওপারে তাকেই বলে জীবনসংগ্রাম।

ইহাতে ক্ষতি ছিল না। একটা জিনিষকে আমি যদি বলি নৌকা-চালানো আর তুমি যদি বল দাঁড়-টানা, একটি কাব্যকে আমি যদি বলি রামায়ণ আর তুমি যদি বল রামরাবণের-লড়াই তাহা লইয়া আদালত করিবার দরকার ছিল না।

কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, কথাটা ব্যবহার করিতে আমাদের আজকাল লজ্জা বোধ হইতেছে। জীবনটা কেবলই লীলা! এ কথা শুনিলে জগতের সমস্ত পালোয়ানের দলেরা কি বলিবে যাহারা তিনভুবনে কেবলি তাল ঠুকিয়া লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে!

আমি কবুল করিতেছি আমার এখানে লজ্জা নাই। ইহাতে আমার ইংরেজি মাষ্টার তাঁর সব চেয়ে বড় শব্দভেদী বাণটা

আমাকে মারিতে পারেন—বলিতে পারেন ওহে, তুমি নেহাৎ ওরিয়েণ্টাল।—কিন্তু তাহাতে আমি মারা পড়িব না।

"লীলা" বলিলে সবটাই বলা হইল আর "লড়াই" বলিলে ল্যাজামুড়া বাদ পড়ে। এ লড়ায়ের আগাই বা কোথায় আর গোড়াই বা কোথায়? ভাঙ-খোর বিধাতার ভাঙের প্রসাদ টানিয়া একি হঠাৎ আমাদের একটা মত্ততা? কেনরে বাপু, কিসের জন্যে খামকা লড়াই?

বাঁচিবার জন্য।

আমার না-হক্ বাঁচিবার দরকার কি?

না বাঁচিলে যে মরিবে।

না হয় মরিলাম।

মরিতে যে চাওনা।

কেন চাইনা?

চাওনা বলিয়াই চাওনা।

এই জবাবটাকে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় লীলা। জীবনের মধ্যে বাঁচিবার একটা অহেতুক ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটাই চরম কথা। সেইটে আছে বলিয়াই আমরা লড়াই করি, দুঃখকে মানিয়া লই। সমস্ত জোরজবরদস্তির সবশেষে একটা খুসি আছে—তার ওদিকে আর যাইবার জো নাই, দরকারও নাই। সতরঞ্চ খেলার আগাগোড়াই খেলা,—মাঝখানে দাবাবড়ে চালাচালি এবং মহাভাবনা। সেই দুঃখ না থাকিলে খেলার কোনো অর্থই থাকে না। অপর পক্ষে, খেলার আনন্দ না থাকিলে দুঃখের মত এমন নিদারুণ নিরর্থকতা আর কিছু নাই। এমন স্থলে

সতরঞ্চকে আমি যদি বলি খেলা আর তুমি যদি বল দাবাবড়ের লড়াই তবে তুমি আমার চেয়ে কম বই যে বেশি বলিলে এমন কথা আমি মানিব না।

কিন্তু এ সব কথা বলা কেন? জীবনটা কিম্বা জগৎটা যে লীলা এ কথা শুনিতে পাইলেই যে মানুষ একদম কাজকর্ম্মে ঢিল দিয়া বসিবে।

এই কথাটা শোনা-না-শোনার উপরই যদি মানুষের কাজ করা-না-করা নির্ভর করিত তবে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন গোড়ায় তাঁরি মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। সামান্য কবির উপরে রাগ করায় বাহাদুরি নাই।

কেন, সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন কি?

তিনি আর যাই বলুন লড়াইয়ের কথাটা যত পারেন চাপা দেন। মানুষের বিজ্ঞান বলিতেছে জগৎ জুড়িয়া অণুতে পরমাণুতে লড়াই। কিন্তু আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া দেখি সেই যুদ্ধ-ব্যাপার ফুল হইয়া ফোটে, তারা হইয়া জ্বলে, নদী হইয়া চলে, মেঘ হইয়া ওড়ে। সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি তখন দেখি ভূমার ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সঙ্গে রঙের মালাবদল। বিজ্ঞান সেই সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দলাদলি ঠেলাঠেলি হানাহানি দেখিতে পায়। সেই অবচ্ছিন্ন সত্য বিজ্ঞানের সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহা কবির সত্যও নহে কবিগুরুর সত্যও নয়।

অন্য কবির কথা রাখিয়া দাও, তুমি নিজের হইয়া বল।

আচ্ছা ভাল। তোমাদের নালিশ এই যে, খেলা, ছুটি, আনন্দ,

এই সব কথা আমার কাব্যে বারবার আসিয়া পড়িতেছে। কথাটা যদি ঠিক হয় তবে বুঝিতে হইবে একটা কোনো সত্যে আমাকে পাইয়াছে। তার হাত আমার আর এড়াইবার জো নাই। অতএব এখন হইতে আমি বিধাতার মতই বেহায়া হইয়া এক কথা হাজার বার বলিব। যদি আমাকে বানাইয়া বলিতে হইত তবে ফি বারে নূতন কথা না বলিলে লজ্জা হইত। কিন্তু সত্যের লজ্জা নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই। সে নিজেকেই প্রকাশ করে; নিজেকেই প্রকাশ করা ছাড়া তার আর গতি নাই, এই জন্যই সে বেপরোয়া।

এটা যেন তোমার অহঙ্কারের মত শোনাইতেছে।

সত্যের দোহাই দিয়া নিন্দা করিলে যদি দোষ না হয় তবে সত্যের দোহাই দিয়া অহঙ্কার করিলেও দোষ নাই। অতএব এখানে তোমাতে আমাতে শোধ বোধ হইল।

বাজে কথা আসিল। যে কথা লইয়া তর্ক হইতেছিল, সেটা—

সেটা এই যে, জগতে শক্তির লড়াইটাকেই প্রধান করিয়া দেখা অবচ্ছিন্ন দেখা,—অর্থাৎ গানকে বাদ দিয়া সুরের কসরৎকে দেখা। আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সব চেয়ে বড় কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলিতে চান জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই? আমরা ত

ঐ গুলোর উপরেই বেশি করিয়া জোর দিতে চাই নহিলে মানুষের চেতনা হইবে কেমন করিয়া ?

উপনিষৎ ইহার উত্তর দিয়াছেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেইবা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত (অর্থাৎ কেইবা দুঃখধন্দা লেশমাত্র স্বীকার করিত) আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে ততখানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব দুঃখ ত আছেই কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে। নহিলে কিছুই থাকিত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার কর তখন আনন্দকে বাদ দাও কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না। অতএব তোমরা যখন বল হানাহানি করিতে করিতে যাহা টিঁকিল তাহাই সৃষ্টি সেটা একটা অবচ্ছিন্ন কথা, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন্‌, —আর আনন্দ হইতেই সমস্ত হইতেছে ও টিকিতেছে এইটেই হইল পূরা সত্য।

আচ্ছা, তোমার কথাই মানিয়া লইলাম, কিন্তু এটা ত একটা তত্ত্বজ্ঞানের কথা। সংসারের কাজে ইহার দাম কি ?

সে জবাবদিহি কবির নয়, এমন কি, বৈজ্ঞানিকেরও নয়। কিন্তু যে রকম দিনকাল পড়িয়াছে কবিদের মত সংসারের নেহাৎ অনাবশ্যক লোকেরও হিসাবনিকাশের দায় এড়াইয়া চলিবার জো নাই। আমাদের দেশের অলঙ্কারশাস্ত্রে রসকে চিরদিন অহেতুক

অনির্ব্বচনীয় বলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং যারা রসের কারবারী তাহাদিগকে এদেশে প্রয়োজনের হাটের মাশুল দিতে হয় নাই। কিন্তু শুনিতে পাই পশ্চিমের কোনো কোনো নামজাদা পাকা লোক রসকে কাব্যের চরম পদার্থ বলিয়া মানিতে রাজি নন, রসের তলায় কোনো তলানি পড়ে কি না সেইটে দেখিয়া নিক্তিতে মাপিয়া তাঁরা কাব্যের দাম ঠিক করিতে চান। সুতরাং কোনো কথাতেই অনির্ব্বচনীয়তার দোহাই দিতে গেলে আজকাল আমাদের দেশেও লোকে সেকেলে এবং ওরিয়েণ্টাল বলিয়া নিন্দা করিতে পারে। সে নিন্দা অসহ্য নয় তবু কাজের লোকদিগকে যতটুকু খুসি করিতে পারা যায় চেষ্টা করা ভাল। যদিচ আমি কবি মাত্র তবুও এ সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে যা আসে তা একটু গোড়ার দিক হইতে বলিতে চাই।

জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি কিন্তু তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাঠ বস্তু গাছ নয়, তার রস টানিবার ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয়; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ—তাহা একই কালে বস্তুময়, শক্তিময়, সৌন্দর্য্যময়। গাছ আমাদিগকে যে আনন্দ দেয় সে এই জন্যই। এই জন্যই গাছ বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার কোনো বিচ্ছেদ নাই। এই জন্যেই গাছপালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়—ছুটির সত্য রূপটি দেখিতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয়। বস্তুত তাহা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাজের

সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দ রূপ, সৌন্দর্য্য রূপ। তাহা কাজ বটে কিন্তু তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম এক সঙ্গেই আছে।

সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে আসিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া গেছে। তার প্রধান কারণ, মানুষের নিজের একটা ইচ্ছা আছে জগতের লীলার সঙ্গে সে সমান তালে চলে না। বিশ্বের তালটা সে আজও সম্পূর্ণ কায়দা করিতে পারিল না। কথায় কথায় তাল কাটিয়া যায়। এই জন্য নিজের সৃষ্টিকে সে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে কোনো প্রকারে তালে বাঁধিয়া লইতে চায়। কিন্তু তাহাতে পূরা সঙ্গীতের রস ভাঙিয়া যায় এবং সেই টুক্‌রাগুলার মধ্যেও তাল রক্ষা হয় না। ইহাতে মানুষের প্রায় সকল কাজেই যোঝাযুঝিটাই সবচেয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত ছেলেদের শিক্ষা। মানবসন্তানের পক্ষে এমন নিদারুণ দুঃখ আর কিছুই নাই। পাখী উড়িতে শেখে, মা বাপের গান শুনিয়া গান অভ্যাস করে, সেটা তার জীবলীলার অঙ্গ—বিদ্যার সঙ্গে প্রাণের ও মনের প্রাণান্তিক লড়াই নয়। সে শিক্ষা আগাগোড়াই ছুটির দিনের শিক্ষা, তাহা খেলার বেশে কাজ। গুরুমশায় এবং পাঠশালা কি জিনিষ ছিল একবার ভাবিয়া দেখ। মানুষের ঘরে শিশু হইয়া জন্মানো যেন এমন অপরাধ যে বিশ বছর ধরিয়া তার শাস্তি পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে কোন তর্ক না করিয়া আমি কেবলমাত্র কবিত্বের জোরেই বলিব এটা বিষম গলদ। কেননা সৃষ্টিকর্ত্তার মহলে বিশ্বকর্ম্মার দলবল জগৎ জুড়িয়া গান গাহিতেছে—

মোদের, যেমন খেলা তেম্‌নি যে কাজ জানিস্‌নে কি ভাই?

একদিন নীতিবিংরা বলিয়াছিল, লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ। বেত বাঁচাইলে ছেলে মাটি করা হয় একথা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অথচ আজ দেখিতেছি শিক্ষার মধ্যে বিশ্বের আনন্দসুর ক্রমে লাগিতেছে—সেখানে বাঁশের জায়গা ক্রমেই বাঁশি দখল করিল।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া যখন দেশে ফিরিতেছিলাম দুই জন মিশনারি আমার পাছু ধরিয়াছিল। তাহাদের মুখ হইতে আমার দেশের নিন্দায় সমুদ্রের হাওয়া পর্য্যন্ত দূষিয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা নিজের স্বার্থ ভুলিয়া আমার দেশের লোকের যে কত অবিশ্রাম উপকার করিতেছে তাহার লম্বা ফর্দ্দ আমার কাছে দাখিল করিত। তাহাদের ফর্দ্দটি জাল ফর্দ্দ নয় অঙ্কেও ভুল নাই। তাহারা সত্যই আমাদের উপকার করে কিন্তু সেটার মত নিষ্ঠুর অন্যায় আমাদের প্রতি আর কিছুই হইতে পারে না। তার চেয়ে আমাদের পাড়ায় গুর্খাফৌজ লাগাইয়া দেওয়াই ভাল। আমি এই কথা বলি কর্ত্তব্যনীতি যেখানে কর্ত্তব্যের মধ্যেই বদ্ধ অর্থাৎ যেখানে তাহা অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্‌শন্‌ সেখানে সজীব প্রাণীর প্রতি তাহার প্রয়োগ অপরাধ। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলে শ্রদ্ধয়া দেয়ং। কেননা দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিলিলে তবেই তাহা সুন্দর ও সমগ্র হয়।

কিন্তু এমনি আমাদের অভ্যাস কদর্য্য হইয়াছে যে, আমরা নির্লজ্জের মত বলিতে পারি যে, কর্ত্তব্যের সরস না হইলেও চলে, এমন কি, না হইলে ভাল চলে। লড়াই, লড়াই, লড়াই!

আমাদিগকে বড়াই করিতে হইবে যে আনন্দকে অবজ্ঞা করি আমরা এম্‌নি বাহাদুর! চন্দন মাখিতে আমাদের লজ্জা, তাই রাই-শরিষার বেলেস্তারা মাখিয়া আমরা দাপাদাপি করি। আমার লজ্জা ঐ বেলেস্তারাটাকে।

আসলে, মানুষের গলদটা এইখানে যে, পনেরোআনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করিতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী সেখানে তার কাজ যতই কঠিন হোক্ সেখানেই তার আনন্দ, মা যেখানে মা, সেখানে তার ঝঞ্ঝাট যত বেশিই হোক্ না সেখানেই তার আনন্দ। কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যথার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মত অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে। তাই কার্লাইল প্রতিভাকে উল্টাদিক দিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকেই বলে প্রতিভা।

কিন্তু মানুষ যে কাজ করে তার অধিকাংশই নিজেকে প্রকাশের জন্য নয়। সে, হয় নিজের মনিবকে, নয় কোনো প্রবল পক্ষকে, নয় কোনো বাঁধা দস্তুরের কর্ম্মপ্রণালীকে পেটের দায়ে বা পিঠের দায়ে প্রকাশ করে। পনেরোআনা মানুষের কাজ অন্যের কাজ। জোর করিয়া মানুষ নিজেকে আর কেহ কিম্বা আর কিছুর মত করিতে বাধ্য। চীনের মেয়ের জুতা তার পায়ের মত নহে, তার পা তার জুতার মত। কাজেই পাকে দুঃখ পাইতে হয় এবং কুৎসিত হইতে হয়। কিন্তু এমনতর কুৎসিত হইবার মস্ত সুবিধা এই যে, সকলেরই সমান কুৎসিত হওয়া সহজ। বিধাতা সকলকে সমান করেন নাই, কিন্তু নীতিতত্ত্ববিৎ

যদি সকলকেই সমান করিতে চায় তবে ত লড়াই ছাড়া কৃচ্ছ্র-সাধন ছাড়া কুৎসিত হওয়া ছাড়া আর কথা নাই।

সকল মানুষকেই রাজার, সমাজের, পরিবারের, মনিবের দাসত্ব করিতে হইতেছে। কেমন গোলমালে দায়ে পড়িয়া এই রকমটা ঘটিয়াছে। এই জন্যই লীলা কথাটাকে আমরা চাপা দিতে চাই। আমরা বুক ফুলাইয়া বলি, জিন-লাগাম পরিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাস্তায় মুখ থুবড়াইয়া মরাই মানুষের পরম গৌরব। এ সমস্ত দাসের জাতির দাসত্বের বড়াই। এমনি করিয়া দাসত্বের মন্ত্র আমাদের কানে আওড়ানো হয় পাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের আত্মা আত্মগৌরবে সচেতন হইয়া উঠে। না, আমরা শ্যাক্‌রা গাড়ির ঘোড়ার মত লাগাম-বাঁধা মরিবার জন্য জন্মাই নাই। আমরা রাজার মত বাঁচিব, রাজার মত মরিব।

আমাদের সব চেয়ে বড় প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম্মএধি। হে আবি, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ। তোমার রূপই আনন্দরূপ। সেই আনন্দরূপ গাছের চ্যালা কাঠ নহে তাহা গাছ, তার মধ্যে হওয়া এবং করা একই।

আমার কথার জবাবে এ কথা বলা চলে যে, আনন্দরূপ মানুষের মধ্যে একবার ভাঙচুরের মধ্যে দিয়া তবে আবার আপনার অখণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে। যতদিন তা না হয় ততদিন লড়াইয়ের মন্ত্র দিনরাত জপিতে হইবে। ততদিন লাগাম পরিয়া মুখ থুবড়িয়া মরিতে হইবে। ততদিন ইস্কুলে আফিসে আদালতে হাটে বাজারে কেবলি নরমেধ যজ্ঞ চলিতে থাকিবে। সেই বলির পশুদের কানে বলিদানের

ঢাক ঢোলই খুব উচ্চৈস্বরে বাজাইয়া তাহাদের বুদ্ধিকে ঘুলাইয়া দেওয়া ভাল—বলা ভাল এই হাড়কাঠই পরম দেবতা, এই খড়্গাঘাতই আশীর্ব্বাদ—আর জল্লাদই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা।

তা হোক্, বলিদানের ঢাক ঢোল বাজুক আফিসে, বাজুক আদালতে—বাজুক বন্দীদের শিকলের ঝঙ্কারের সঙ্গে তাল রাখিয়া। মরুক সকলে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া শুষ্কতালু লইয়া লাগাম কামড়াইয়া রাস্তার ধূলার উপরে। কিন্তু কবির বীণায় বরাবর বাজিবে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হইবে না—Truth is beauty, beauty truth—ইহাতে আফিস আদালত কলেজ লাঠি হাতে তাড়া করিয়া আসিলেও সকল কোলাহলের উপরেও এই সুর বাজিবে—সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের আলোক-বীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে—আনন্দং সম্প্রায়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধূলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার দিকে নহে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘরে-বাইরে

৩০

রাত্রের সঙ্গে দিনের যে তফাৎ সেটাকে যদি ঠিক হিসাবমত ক্রমে ক্রমে ঘোচাতে হত তাহলে সে কি কোনো যুগে ঘুচত? কিন্তু সূর্য্য উঠে পড়ে, অন্ধকার চুকে যায়, অসীম কালের হিসাব মুহূর্ত্তকালে মেটে।

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল—কিন্তু সে যে কেমন করে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই। বোধ করি সেই জন্যেই নূতন যুগ একেবারে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত আমাদের ভয় ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কি হল কি হবে তা বোঝবার সময় পাইনি।

পাড়ায় বর আস্‌চে, তার বাঁশি বাজ্‌চে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানলায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না, তেমনি সেদিন সমস্ত দেশের বর আসবার বাঁশি যেমনি শোনা গেল মেয়েরা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাক্‌তে পারে? হুলু দিতে দিতে শাঁক বাজাতে বাজাতে, তারা যেখানে দরজা জানলা দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই মুখ বাড়িয়ে দিলে।

সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবীরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্ম্মকর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা

যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করিয়ে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগেছিল সেদিনও তার বেড়া ভাঙেনি বটে কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল।

আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিষ দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানা রকম চেষ্টা করছিলেন। আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র—কি করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে একজায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জ্বাল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন। শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে' পড়তে লাগ্‌ল যে কারবার টিঁক্‌ল না। চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে সব ফসল ফলিয়েছিলেন সে অতি আশ্চর্য্য কিন্তু তাতে যে টাকা খরচ করেছিলেন সে আরো বেশি আশ্চর্য্য। তাঁর মনে হল আমাদের দেশে বড় বড় কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই। সেই সময়ে তিনি আমাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে লাগ্‌লেন। তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে হল, সব প্রথমে দরকার ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করবার অভ্যাস ও ইচ্ছা আমাদের জনসাধারণের মনে সঞ্চার করে দেওয়া। একটা ছোট গোছের ব্যাঙ্ক খুল্লেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠ্‌ল, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিল।

কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগ্‌ল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে। এই সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌ত। শত্রুপক্ষ ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। আমার বড় জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্লেন, তাঁর বিখ্যাত উকীল খুড়তত ভাই তাঁকে বলেচেন যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে এই পাগলের হাত থেকে এই বনেদিবংশের মানসম্ভ্রম বিষয়-সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল আমার দিদিশাশুড়ির মনে বিকার ছিল. না। তিনি আমাকে ডেকে কতবার ভর্ৎসনা করেচেন, বলেচেন, কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত করচিস্! বিষয় সম্পত্তির কথা ভাবচিস্? আমার বয়সে আমি তিনবার এ সম্পত্তি রিসীভরের হাতে যেতে দেখেচি। পুরুষেরা কি মেয়ে মানুষের মত? ওরা যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে। নাত বৌ, তোর কপাল ভাল, যে, সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উড়চে না। দুঃখ পাসনি বলেই সে কথা মনে থাকে না।

আমার স্বামীর দানের লিষ্ট্‌ ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল, কিম্বা ধানভানার যন্ত্র কিম্বা ঐ রকম একটা-কিছু যে কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেচে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্য্যন্ত তিনি সাহায্য করেচেন। বিলিতি কম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরী যাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কম্পানি উঠ্‌ল; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেচে।

সব চেয়ে আমার বিরক্ত লাগত সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুষে নিতেন। তিনি খবরের কাগজ চালাবেন, স্বাদেশিকতা প্রচার করতে যাবেন, ডাক্তারের পরামর্শমতে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে উটকামন্দে যেতে হবে, নির্ব্বিচারে আমার স্বামী তার খরচ জুগিয়েচেন। এ ছাড়া সংসার খরচের জন্য নিয়মিত তাঁর মাসিক বরাদ্দ আছে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল আছে তাও নয়। আমার স্বামী বল্‌তেন দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরো গুরুতর। আমি তাঁকে একদিন রাগ করে বলেছিলুম এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্চে—তিনি হেসে বল্লেন, আমার গুণ নেই অথচ কেবলমাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্চি—আমিই ত ফাঁকি দিয়ে লাভ করে নিলুম।

এই পূর্ব্বযুগের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল নইলে নব যুগের নাট্যটা স্পষ্ট বুঝা যাবে না।

এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগ্‌ল আমি প্রথমেই স্বামীকে বল্লুম বিলিতি জিনিষে তৈরি আমার সমস্ত পোষাক পুড়িয়ে ফেলব। স্বামী বল্লেন, পোড়াবে কেন? যতদিন খুসী ব্যবহার না করলেই হবে।

কী তুমি বল্‌চ যতদিন খুসী! ইহজীবনে আমি কখনো—

বেশ ত ইহজীবনে তুমি না হয় ব্যবহার করবে না। ঘটা করে নাই পোড়ালে!

কেন এতে তুমি বাধা দিচ্চ?

আমি বল্‌চি গ'ড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার শিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।

এই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলবার সাহায্য হয়।

তাই যদি বল তবে বল্‌তে হয় ঘরে আগুন না লাগালে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখ্‌তেই বাহাদুরী কিন্তু আসলে দুর্ব্বলতার গোঁজামিলন।

আমার স্বামী বল্লেন, দেখ, বুঝচি আমার কথা আজ তোমার মনে নিচ্চে না, তবু আমি এ কথাটি তোমাকে বলচি ভেবে দেখো। মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্চে। আজ আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে করি এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ—এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।

তার পরে আর এক ল্যাঠা। মিস্ গিল্‌বি যখন আমাদের অন্তঃপুরে এসেছিল তখন তাই নিয়ে কিছুদিন খুব গোলমাল চলেছিল। তার পরে অভ্যাসক্রমে সেটা চাপা পড়ে গেছে।

আবার সমস্ত ঘুলিয়ে উঠ্‌ল। মিস্‌ গিল্‌বি ইংরেজ কি বাঙালী অনেকদিন সে কথা আমারও মনে হয় নি—কিন্তু মনে হতে সুরু হল। আমি স্বামীকে বল্লুম, মিস্‌ গিল্‌বিকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। স্বামী চুপ করে রইলেন। আমি সেদিন তাঁকে যা মুখে এল বলেছিলুম তিনি ম্লান মুখ করে চলে গেলেন। আমি খুব খানিকটা কাঁদলুম। কেঁদে যখন আমার মনটা একটু নরম হল তিনি রাত্রে এসে বল্লেন, দেখ, মিস্‌ গিল্‌বিকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ঝাপ্‌সা করে দেখতে আমি পারি নে। এতদিনের পরিচয়েও কি ঐ নামের বেড়াটা ঘুচ্‌বে না? ও যে তোমাকে ভালবাসে।

আমি একটুখানি লজ্জিত হয়ে অথচ নিজের অভিমানের অল্প একটু ঝাঁজ বজায় রেখে বল্লুম, আচ্ছা থাক্‌ না, ওকে কে যেতে বল্‌চে?

মিস্‌ গিল্‌বি রয়ে গেল। একদিন সে গির্জ্জেয় যাবার সময় পথের মধ্যে আমাদেরই একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছেলে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে অপমান করলে। আমার স্বামীই এতদিন সেই ছেলেকে পালন করেছিলেন,—তিনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে ভারি একটা গোল উঠ্‌ল। সেই ছেলে যা বল্লে সবাই তাই বিশ্বাস করলে। লোকে বল্‌লে মিস্‌ গিল্‌বিই তাকে অপমান করেছে এবং তার সম্বন্ধে বানিয়ে বলেছে। আমারও কেমন মনে হল সেটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার মা নেই, তার খুড়ো এসে আমাকে ধরলে। আমি তার হয়ে অনেক চেষ্টা করলুম কিন্তু কোনো ফল হল না।

সেদিনকার দিনে আমার স্বামীর এই ব্যবহার কেউ ক্ষমা

করতে পারলে না। আমিও না। আমি মনে মনে তাঁকে নিন্দাই করলুম। এইবার মিস্ গিল্‌বি আপনিই চলে গেল। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়ল—কিন্তু আমার মন গল্‌ল না। আহা মিথ্যা করে' ছেলেটার এমন সর্ব্বনাশ করে গেল গো! আর অমন ছেলে! স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া খাওয়া ছিল না।—আমার স্বামী নিজের গাড়িতে করে মিস্ গিল্‌বিকে ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বড় বাড়াবাড়ি বোধ হল। এই কথাটা নিয়ে নানা ডাল পালা দিয়ে কাগজে যখন গাল দিলে আমার মনে হল এই শাস্তি ওঁর পাওনা ছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমি আমার স্বামীর জন্যে অনেকবার উদ্বিগ্ন হয়েছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর জন্যে একদিনও লজ্জা বোধ করিনি। এবার লজ্জা হল। মিস্ গিল্‌বির প্রতি নরেন কি অন্যায় করেছে না করেছে সে আমি জানিনে কিন্তু আজকের দিনে তা নিয়ে সদ্বিচার করতে পারাটাই লজ্জার কথা। যে ভাবের থেকে নরেন ইংরেজ মেয়ের প্রতি ঔদ্ধত্য করতে পেরেচে আমি তাকে কিছুতেই দমিয়ে দিতে চাইনে। এই কথাটা আমার স্বামী যে কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না, আমার মনে হল সেটা তাঁর পৌরুষের অভাব। তাই আমার মনে লজ্জা হল।

শুধু তাই নয়, আমার সব চেয়ে বুকে বিঁধেছিল যে আমাকে হার মানতে হয়েছে। আমার তেজ কেবল আমাকেই দগ্ধ করলে কিন্তু আমার স্বামীকে উজ্জ্বল করলে না। এই ত আমার সতীত্বের অপমান।

অথচ স্বদেশী কাণ্ডর সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিলনা বা তিনি এর বিরুদ্ধ ছিলেন তা নয়। কিন্তু "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বল্‌তেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্ব্বনাশ করা হবে।

৪

এমন সময়ে সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচার করবার জন্যে তাঁর দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিকেল বেলায় আমাদের নাটমন্দিরে সভা হবে। আমরা মেয়েরা দালানের একদিকে চিক্ ফেলে বসে আছি। বন্দেমাতরম্ শব্দের সিংহনাদ ক্রমে ক্রমে কাছে আস্‌চে, আমার বুকের ভিতরটা গুরগুর করে কেঁপে উঠ্‌চে। হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়াপরা যুবক ও বালকের দল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মত, হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ল। লোকে লোকে ভরে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বড় চৌকির উপর বসিয়ে দশবারোজন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্! আকাশটা যেন ফেটে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছিঁড়ে পড়বে মনে হল।

সন্দীপবাবুর ফোটোগ্রাফ পূর্ব্বেই দেখেছিলুম। তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিল তা বল্‌তে পারিনে। কুশ্রী দেখতে নয়, এমন কি, রীতিমত সুশ্রীই, তবু জানিনে কেন, আমার মনে হয়েছিল, উজ্জ্বলতা আছে বটে কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে

গড়া—চোখে আর ঠোঁটে কি একটা আছে যেটা খাঁটি নয়। সেই জন্যেই আমার স্বামী যখন বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল দাবী পূরণ করতেন আমার ভাল লাগ্‌ত না। অপব্যয় আমি সইতে পারতুম কিন্তু আমার কেবলি মনে হত বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্চে। কেননা ভাবখানা ত তপস্বীর মত নয়, গরীবের মতও নয়, দিব্যি বাবুর মত। ভিতরে আরামের লোভ আছে অথচ—এই রকম নানা কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। আজ সেই সব কথা মনে উঠ্‌চে—কিন্তু থাক্।

কিন্তু সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগ্‌লেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হল তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দেখ্‌লুম। বিশেষত এক সময় সূর্য্য ক্রমে নেমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের উপর হঠাৎ রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে তখন মনে হল তিনি যে অমরলোকের মানুষ এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নরনারীর সাম্‌নে প্রকাশ করে দিলে। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দম্‌কা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সাম্‌নে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম আমার মনে পড়ে না। সমস্ত সভায় এমন একটি লোক ছিল না আমার মুখ দেখবার যার একটু অবকাশ ছিল। কেবল এক সময় দেখ্‌লুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মত সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁস

ছিলনা। আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ? আমি তখন বাংলা দেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি—আর তিনি বাংলা দেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্য্যের আলো তাঁর ঐ ললাটের উপর পড়েচে, তেমনি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কি করে?

আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলুম আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষায় আগুন আরো জ্বলে উঠ্‌ল। ইন্দ্রের উচ্চৈশ্রবা তখন আর রাশ মান্‌তে চাইল না—বজ্রের উপর বজ্রের গর্জ্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি। আমার মন বল্লে আমারই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে। আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই ত ভারতী।

সেদিন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ এবং অহঙ্কারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্ত্তে এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগ্‌ল গ্রীসের বীরাঙ্গনার মত আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য, আমার এই আজানুলম্বিত চুল। যদি ভিতরকার চিত্তের সঙ্গে বাইরেকার গয়নার যোগ থাকত তাহলে আমার কণ্ঠী আমার গলার হার আমার বাজুবন্ধ উল্কাবৃষ্টির মত সেই সভায় ছুটে ছুটে খসে খসে পড়ে যেত। নিজের অত্যন্ত একটা ক্ষতি করতে পারলে তবেই যেন সেই আনন্দের উৎসাহবেগ সহ্য করা সম্ভব হতে পারত।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী যখন ঘরে এলেন আমার ভয় হতে লাগ্‌ল পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপক রাগিণীর সঙ্গে

তান না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তায় কোনো জায়গায় ঘা লাগাতে তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন—তাহলে সেদিন আমি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করতে পারতুম।

কিন্তু তিনি আমাকে কোনো কথাই বল্লেন না। সেটাও আমাকে ভালো লাগ্‌ল না। তাঁর উচিত ছিল বলা, "আজ সন্দীপের কথা শুনে আমার চৈতন্য হল, এসব বিষয়ে আমার অনেক দিনের ভুল ভেঙে গেল।" আমার কেমন মনে হল তিনি কেবল জেদ করে চুপ করে আছেন, জোর করেই উৎসাহ প্রকাশ করচেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম সন্দীপবাবু আর কতদিন এখানে আছেন?

স্বামী বল্লেন, তিনি কাল সকালেই রংপুরে রওনা হবেন।

কাল সকালেই?

হাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হয়ে গেছে।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলুম। তার পরে বল্লুম, কোনোমতে কালকের দিনটা থেকে গেলে হয় না?

সে ত সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বল দেখি?

আমার ইচ্ছা আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে খাওয়াব।

শুনে আমার স্বামী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। এর পূর্ব্বে অনেক দিন অনেকবার তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে আমাকে বের হবার জন্যে অনুরোধ করেচেন। আমি কিছুতেই রাজি হইনি।

আমার স্বামী আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে একরকম করে চাইলেন—আমি তার মানেটা ঠিক বুঝলুম না। ভিতরে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জা বোধ হল। বল্লুম, না, না, সে কাজ নেই।

তিনি বল্লেন, কেনই বা কাজ নেই? আমি সন্দীপকে বল্‌ব—যদি কোনো রকমে সম্ভব হয় তাহলে কাল সে থেকে যাবে।

দেখ্‌লুম সম্ভব হল।

আমি সত্য কথা বল্‌ব। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল ঈশ্বর কেন আমাকে আশ্চর্য্য সুন্দর করে গড়লেন না? কারো মন হরণ করবার জন্যে যে, তা নয়। কিন্তু রূপ যে একটা গৌরব। আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক একবার জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু বাইরের রূপ না হলে তাদের চোখ যে দেবীকে দেখ্‌তে পায় না। সন্দীপবাবু কি আমার মধ্যে দেশের সেই জাগ্রত শক্তিকে দেখ্‌তে পাবেন? না, মনে করবেন, এ একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তাঁর এ বন্ধুর ঘরের গৃহিণীমাত্র?

সেদিন সকালে মাথা ঘসে আমার সুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়ে ছিলুম। দুপুর বেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল না। গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজি সাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড়-দেওয়া হাতকাটা জ্যাকেট্।

আমি ঠিক করেছিলুম এ খুব সংযত সাজ, এর চেয়ে সাদাসিধা আর কিছু হতে পারে না। এমন সময় আমার মেজ জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তার পরে ঠোঁট দুটো খুব টিপে একটু হাস্‌লেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদি, তুমি হাস্‌লে যে?

তিনি বল্লেন, তোর সাজ দেখচি।

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বল্লুম, এম্‌নিই কি সাজ দেখ্‌লে?

তিনি আর একবার একটুখানি বাঁকা হাসি হেসে বল্লেন, মন্দ হয়নি ছোট রাণী, বেশ হয়েচে! কেবল ভাবচি সেই তোমার বিলিতি দোকানের বুককাটা জামাটা পরলেই সাজটা পূরোপূরি হত।

এই বলে তিনি কেবল তাঁর মুখ চোখ নয়, তাঁর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সমস্ত দেহের ভঙ্গী হাসিতে ভরে ঘর থেকে চলে গেলেন। খুব রাগ হল এবং মনে হল সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে আটপৌরে মোটাগোছের একটা সাড়ি পরি। কিন্তু সে ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত কেন যে পালন করতে পারলুম না তা ঠিক জানিনে। মনে মনে বল্লুম আমি যদি বেশ ভদ্ররকম সাজ না করেই সন্দীপবাবুর সাম্‌নে বেরই তাহলে আমার স্বামী রাগ করবেন—মেয়েরা যে সমাজের শ্রী।

ভেবেছিলুম, সন্দীপবাবু একেবারে খেতে যখন বস্‌বেন তখন তাঁর সাম্‌নে বেরব। সেই খাওয়ানো কর্ম্মটার আড়ালে প্রথম দেখার সঙ্কোচ অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু খাবার তৈরি হতে আজ দেরি হচ্চে, প্রায় একটা বেজে গেছে। তাই আমার স্বামী আলাপ করবার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভারি লজ্জা ঠেকছিল। কোনোমতে সেটা কাটিয়ে জোর করে বলে ফেল্লুম—আজ খেতে আপনার ভারি দেরি হয়ে গেল।

তিনি অসঙ্কোচে আমার পাশের চৌকিতে এসে বল্লেন, দেখুন, অন্ন ত রোজই একরকম জোটে কিন্তু অন্নপূর্ণা থাকেন আড়ালে। আজ অন্নপূর্ণা এলেন, অন্ন না হয় আড়ালেই রইল।

যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে করতে পারে এ সব তর্ক তাঁর নয়। খুব কাছে এসে বসবার স্বাভাবিক দাবী যেন তাঁর আছে, অতএব এতে যে দোষ দিতে পারে দোষ তারই।

আমার লজ্জা হতে লাগ্‌ল পাছে সন্দীপবাবু মনে করেন আমি নেহাৎ একটা সেকেলে জড়পদার্থ। মুখের কথা বেশ জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠ্‌বে, কোথাও বাধবে না, এক একটা জবাব শুনে তিনি মনে মনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন, এ আমার কিছুতেই ঘটে উঠ্‌ল না। ভিতরে ভিতরে ভারি কষ্ট হতে লাগ্‌ল—নিজেকে হাজারবার ভর্ৎসনা করে বল্লুম, কেন ওঁর সাম্‌নে এমন হঠাৎ বের হতে গেলুম।

কোনো রকম করে খাওয়ানোটা হয়ে গেলেই আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলুম—তিনি আবার তেমনি নিঃসঙ্কোচে দরজার কাছে এসে আমার পথ আগ্‌লে বল্লেন,—আমাকে পেটুক ঠাওরাবেন না, আমি খাবার লোভে এখানে আসি নি। আমার লোভ কেবল আপনি ডেকেচেন বলে। যদি খাওয়ার পরে অমনি পালান তাহলে অতিথিকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

এমন সব কথা অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত জোরে না বল্লে ভারি বদ্‌সুর লাগ্‌ত। আমার স্বামী যে ওঁর পরমবন্ধু, আমি যে ওঁর ভাজের মত। আমি যখন নিজের সঙ্গে লড়াই করে সন্দীপবাবুর প্রবল আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঠবার চেষ্টা করচি, আমার স্বামী আমার বিভ্রাট দেখে আমাকে বল্লেন, আচ্ছা, তুমি তাহলে তোমার খাওয়া সেরে চলে এস।

সন্দীপবাবু বল্লেন, কিন্তু কথা দিয়ে যান ফাঁকি দেবেন না।

আমি একটু হেসে বল্লুম, আমি এখনি আস্‌চি।

তিনি বল্লেন, আপনাকে কেন বিশ্বাস করিনে তা বুলি। আজ ন বছর হল নিখিলেশের বিয়ে হয়েচে। এই ন'টি বছর আপনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এসেচেন। আবার ফের যদি ন বছর করেন তাহলে আর দেখা হবে না।

আমিও আত্মীয়তা সুরু করে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বল্লুম, কেন, তাহলেই বা দেখা হবে না কেন?

তিনি বল্লেন, আমার কুষ্টিতে আছে আমি অল্প বয়সে মরব। আমার বাপ দাদা কেউ ত্রিশের কোঠা পেরতে পারেন নি। আমার ত এই সাতাশ হল।

তিনি বুঝেছিলেন কথাটা আমার মনে বাজ্‌বে। বাজ্‌লও বটে। এবার আমার মৃদুকণ্ঠে বোধ হয় করুণ রসের একটু ছিটে লাগ্‌ল। আমি বল্লুম, সমস্ত দেশের আশীর্ব্বাদে আপনার ফাঁড়া কেটে যাবে।

তিনি বল্লেন, দেশের আশীর্ব্বাদ দেশলক্ষ্মীদের কণ্ঠ থেকেই ত পাব। সেই জন্যেই ত এত ব্যাকুল হয়ে আপনাকে আস্‌তে বলচি, তা হলে আজ থেকেই আমার স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হবে।

স্রোতের জল ঘোলা হলেও অনায়াসে তার ব্যবহার চলে। সন্দীপবাবুর সমস্তই এম্‌নি দ্রুতবেগে সচল যে, আর একজনের মুখে যা সইত না তাঁর মুখে তাতে আপত্তি করবার ফাঁক পাওয়া যায় না। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, দেখুন আপনার এই স্বামীকে জামিন রেখে দিলুম, আপনি যদি না আসেন তাহলে ইনিও খালাস পাবেন না।

আমি যখন চলে আস্‌চি, তিনি আবার বলে উঠ্‌লেন, আমার আর একটু সামান্য দরকার আছে।

আমি থম্‌কে ফিরে দাঁড়ালুম। তিনি বল্লেন, ভয় পাবেন না, এক গ্লাস জল। আপনি দেখেছেন আমি খাবার সময়ে জল খাই নে—খাবার খানিক পরে খাই।

এর পরে আমাকে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল, কেন বলুন দেখি?

কবে তাঁর কঠিন অজীর্ণ রোগ হয়েছিল তার ইতিহাস এল। প্রায় সাত মাস ধরে তাঁর কি রকম অসহ্য ভোগ গিয়েছে তাও শুনলুম। এলোপ্যাথ্‌ হোমিওপ্যাথ্‌ সকল রকমের চিকিৎসকের উপদ্রব পার হয়ে অবশেষে কবিরাজের চিকিৎসায় কি রকম আশ্চর্য্য ফল পেয়েছেন তার বর্ণনা সেরে হেসে তিনি বল্লেন, ভগবান আমার ব্যামোগুলোও এমনি করে গড়েচেন যে, স্বদেশী বড়িটুকু হাতে হাতে না পেলে তারা বিদায় হতে চায় না।

আমার স্বামী এতক্ষণ পরে বল্লেন, আর বিদেশী ওষুধের শিশিগুলোও যে একদণ্ড তোমার আশ্রয় ছাড়তে চায় না—তোমার বসবার ঘরের তিন্‌টি শেল্‌ফ্‌ যে একেবারে—

ওগুলো কি জান? প্যুনিটিভ পুলীসের মত। প্রয়োজন আছে বলে যে এসেচে তা নয়—আধুনিক কালের শাসনে ওরা ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে—কেবল দণ্ডই দিতে হয়, গুঁতোও কম খাই নে।

আমার স্বামী অত্যুক্তি সইতে পারেন না। কিন্তু অলঙ্কার-

মাত্রই যে অত্যুক্তি, সে ত বিধাতার তৈরি নয়, মানুষের বানানো। আমি একবার আমার নিজের কোনো একটা মিথ্যার জবাবদিহির ছলে আমার স্বামীকে বলেছিলুম, গাছ পালা পশু পাখীরাই আগাগোড়া সত্য বলে, বেচারাদের মিথ্যা বলবার শক্তি নেই। পশুর চেয়ে মানুষের এইখানে শ্রেষ্ঠতা, আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে,—মেয়েদেরি বিস্তর অলঙ্কার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়।

ঘর থেকে বাইরে এসে দেখি মেজ জা একটা জানলার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক করে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে যে?—তিনি ফিস্ ফিস্ করে উত্তর করলেন, আড়ি পাতছিলুম।

যখন ফিরে এলুম, সন্দীপবাবু করুণ স্বরে বল্লেন, আপনার আজ বোধ হয় কিছুই খাওয়া হল না।

শুনে আমার ভারি লজ্জা হল। আমি একটু বেশি শীঘ্র ফিরে এসেছি। ভদ্ররকম খাবার জন্যে যতটা সময় দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হয়নি। আজকের আমার খাওয়ার মধ্যে না-খাওয়ার অংশটাই যে বেশি, সময়ের অঙ্ক হিসাব করলে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু কেউ যে সেই হিসাব করছিল তা আমার মনেও হয়নি।

সন্দীপবাবু বোধ হয় আমার লজ্জাটুকু দেখ্‌তে পেলেন—সেইটেই আরো লজ্জা। তিনি বল্লেন, বনের হরিণীর মত আপনার ত পালাবার দিকেই ঝোঁক ছিল তবুও যে এত কষ্ট করে সত্য রক্ষা করলেন এ আমার কম পুরস্কার নয়।

আমি ভালো করে জবাব দিতে পারিনি; মুখ লাল করে ঘেমে একটা সোফার কোণে বসে পড়লুম। দেশের মূর্ত্তিমতী নারীশক্তির মত যে রকম নিঃসঙ্কোচে এবং সগৌরবে সন্দীপবাবুর কাছে বেরিয়ে কেবলমাত্র দর্শনদানের দ্বারা তাঁর ললাটে জয়মাল্য পরাব কল্পনা করেছিলুম এ পর্য্যন্ত তার কিছুই হল না।

সন্দীপবাবু ইচ্ছা করেই আমার স্বামীর সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিলেন। তিনি জানেন, তর্কে তাঁর তীক্ষ্ণধার মনের সমস্ত উজ্জ্বলতা ঝক্ ঝক্ করে উঠ্‌তে থাকে। এর পরেও আমি বারবার দেখেচি আমি উপস্থিত থাক্‌লেই তিনি তর্ক করবার সামান্য উপলক্ষ্যটুকু ছাড়তেন না।

বন্দেমাতরম্ মন্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বামীর মত কি তিনি জানতেন, সেইটের উল্লেখ করে বল্লেন, দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মানো না নিখিল?

একটা জায়গা আছে মানি কিন্তু সব জায়গাই তার তা মানিনে। দেশ জিনিষকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জান্‌তে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই—এত বড় জিনিষের সম্বন্ধে কোনো মন-ভোলাবার যাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই লজ্জাও বোধ করি।

তুমি যাকে মায়ামন্ত্র বল্‌চ আমি তাকেই বলি সত্য। আমি দেশকে সত্যই দেবতা বলে মানি। আমি নরনারায়ণের উপাসক —মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রকাশ, তেমনি দেশের মধ্যে।

একথা যদি সত্যই বিশ্বাস কর তবে তোমার পক্ষে এক

মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সুতরাং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।

সে কথা সত্য কিন্তু আমার শক্তি অল্প, অতএব নিজের দেশের পূজার দ্বারাই আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।

পূজা করতে নিষেধ করি নে কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করে' সে পূজা কেমন করে' সমাধা হবে?

বিদ্বেষও পূজার অঙ্গ। কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেই অর্জ্জুন বরলাভ করেছিলেন। আমরা একদিক দিয়ে ভগবানকে মারব একদিন তাতেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

তাই যদি হয়, তবে যারা দেশের ক্ষতি করচে আর যারা দেশের সেবা করচে উভয়েই তাঁর উপাসনা করচে—তাহলে বিশেষ করে দেশভক্তি প্রচার করবার দরকার নেই।

নিজের দেশ সম্বন্ধে আলাদা কথা—ওখানে যে হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

তাহলে সুধু নিজের দেশ কেন, তার চেয়ে আরো ঢের স্পষ্ট উপদেশ আছে নিজেরই সম্বন্ধে। নিজের মধ্যে যে নরনারায়ণ আছেন তাঁর পূজার মন্ত্রটাই যে দেশ বিদেশ সব চেয়ে বড় করে কানে বাজচে।

নিখিল, তুমি যে এই সব তর্ক করচ এ কেবল বুদ্ধির শুক্‌নো তর্ক। হৃদয় বলে একটা পদার্থ আছে তাকে কি একেবারে মান্‌বে না?

আমি তোমাকে সত্য বলচি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্ত্তব্য, অধর্ম্মকে পুণ্য বলে চালাতে চাও

তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারিনে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে চুরি করি, তাহলে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিইনে? চুরি করতে পারিনে যে তাই, সে কি বুদ্ধি আছে বলে? না, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে?

ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হচ্ছিল আমি আর থাকতে পারলুম না। আমি বলে উঠ্‌লুম,—ইংরেজ ফরাসী জর্ম্মান রুশ এমন কোন্ সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?

সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনো করতে হচ্চে। ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

সন্দীপবাবু বল্লেন, বেশ ত আমরাও তাই করব। চোরাই মালে আগে ঘরটা বোঝাই করে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে আমরাও জবাবদিহি করব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তুমি যে বল্লে এখনো তারা জবাবদিহি করচে সেটা কোথায়?

রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখ্‌তে পায়নি। তখন তার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। বড় বড় ডাকাত সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন্ আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা জিনিষ কি দেখ্‌তে পাচ্চনা —ওদের পলিটিক্সের ঝুলিভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেষ্টিজ্‌রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম? আর এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্চেনা?

দেশের উপরেও যারা ধর্ম্মকে মানচে না, আমি বলচি তারা দেশকেও মানচে না।

আমার স্বামীকে আমি কোনোদিন বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে শুনিনি—আমার সঙ্গে তিনি তর্ক করেচেন কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এমন গভীর করুণা যে, আমাকে হার মানাতে তাঁর কষ্ট হত। আজ দেখ্‌লুম তাঁর অস্ত্রচালনা।

আমার স্বামীর কথাগুলোতে কোনোমতেই আমার মন সায় দিচ্ছিল না। কেবলি মনে হচ্ছিল, এর উপযুক্ত উত্তর আছে, উপস্থিতমত সে আমার মনে জোগাচ্ছিল না। মুস্কিল এই যে, ধর্ম্মের দোহাই দিলে চুপ করে যেতে হয়—একথা বলা শক্ত ধর্ম্মকে অতটা দূর পর্য্যন্ত মানতে রাজি নই। এই তর্ক সম্বন্ধে ভালো রকম জবাব দিয়ে আমি একটা লিখব এবং সেটা সন্দীপবাবুর হাতে দেব আমার মনে এই সঙ্কল্প ছিল। তাই আজকের কথাবার্ত্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি।

এক সময়ে সন্দীপবাবু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, আপনি কি বলেন ?

আমি বল্লুম, আমি বেশি সূক্ষ্মে যেতে চাইনে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব—আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব, কুড়ব; আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব, আমি কাউকে চাই যাকে কাটব কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব; আমার মোহ আছে আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব, আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে

আমি মা বলব, দেবী বল্‌ব, দুর্গা বল্‌ব ; যার কাছে আমি বলি-দানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই।

সন্দীপবাবু চৌকি থেকে উঠে আকাশে দক্ষিণ হাত আস্ফালন করে বলে উঠ্‌লেন, হুরা, হুরা!—পরক্ষণেই সংশোধন করে বল্লেন, বন্দেমাতরং বন্দেমাতরং!

আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের উপর ছায়া ফেলে চলে গেল। তিনি খুব মৃদুস্বরে বল্লেন, আমিও দেবতা না, আমি মানুষ, আমি সেই জন্যেই বল্‌চি, আমার যা কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।

সন্দীপবাবু বল্লেন, দেখ নিখিল, সত্য জিনিষটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের সত্যে রং নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধরে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মত তা বস্তুহীন নয়। এই জন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হতে জানে, পুরুষ তেমন জানে না, কেননা ধর্ম্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্ব্বল করে দেয়; মেয়েরা সর্ব্বনাশ করতে পারে অনায়াসে, পুরুষেও পারে কিন্তু তাদের মনে চিন্তার দ্বিধা এসে পড়ে; মেয়েরা ঝড়ের মত অন্যায় করতে পারে, সে অন্যায় ভয়ঙ্কর সুন্দর, পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, কেননা তার ভিতরে ভিতরে ন্যায়বুদ্ধির পীড়া আছে। তাই আমি তোমাকে বলে রাখচি আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে।

আজ আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম বিচার বিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্ব্বিচার নির্ব্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে, আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমাদের কবি কি বলেচে মনে নেই ?—

এস পাপ, এস সুন্দরী !
তব চুম্বন অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক্ সঞ্চরি !
অকল্যাণের বাজুক্ শঙ্খ,
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক,
নির্লাজ কালো কলুষ পঙ্ক
বুকে দাও, প্রলয়ঙ্করী !

আজ ধিক্ থাক্ সেই ধর্ম্মকে—যা হাস্‌তে হাস্‌তে সর্ব্বনাশ করতে জানে না !

এই বলে' তিনি মেজের উপর দু'বার জোরে লাথি মারলেন —কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধূলো চমকে উপরে উঠে পড়ল। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যা কিছুকে বড় বলে মেনেছে একমুহূর্ত্তে তিনি তাকে অপমান করে' এমন গৌরবে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

আবার হঠাৎ গর্জ্জে উঠ্‌লেন, যে আগুন ঘরকে পোড়ায় যে আগুন বাহিরকে জ্বালায় আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জ্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর কর।

এই শেষ ক'টি কথা তিনি যে কা'কে বল্লেন তা ঠিক বোঝা গেল না। মনে করা যেতে পারত তিনি যাকে বন্দেমাতরং বলে বন্দনা করেন তাকে, কিম্বা দেশের যে নারী সেই দেশলক্ষ্মীর প্রতিনিধিরূপে তখন সেখানে বর্ত্তমান ছিল তাকে। মনে করা যেতে পারত কবি বাল্মীকি যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে এক নিমেষে হঠাৎ প্রথম অনুষ্টুপ উচ্চারণ করেছিলেন, তেমনি সন্দীপবাবুও ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে নিষ্কারুণ্যের আঘাতে এই কথাগুলি হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন, কিম্বা জনসাধারণের মনোহরণ ব্যবসায়ের চিরাভ্যস্ত অভিনয়কুশলতার এই একটি আশ্চর্য্য পরিচয় দিলেন।

আরো কিছু বোধ হয় বল্‌তেন, এমন সময়ে আমার স্বামী উঠে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বল্লেন, সন্দীপ, চন্দ্রনাথ বাবু এসেচেন।

হঠাৎ চমক্ ভেঙে ফিরে দেখি সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবেন কি না ভাবচেন। অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্য্যের মত তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ। আমাকে আমার স্বামী এসে বল্লেন, ইনি আমার মাষ্টার মশায়। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি, এঁকে প্রণাম কর।

আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন, মা, ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন। ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চুট্‌কি

সমালোচকেরা আমার রচনার এই একটি দোষ ধরেন যে, আমি কথায়-কথায় বলি "হচ্ছে"। এটি যে একটি মহাদোষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই, কেননা ওকথা বলায় সত্যের অপলাপ করা হয়। সত্য কথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, বাঙ্গলায় কিছু "হচ্ছে না"। এ দেশের কর্ম্মজগতে যে কিছু হচ্ছে না, সে ত প্রত্যক্ষ—কিন্তু মনোজগতেও যে কিছু হচ্ছে না, তার প্রমাণ বর্দ্ধমানের গত সাহিত্য-সম্মিলন।

উক্ত মহাসভার পঞ্চ সভাপতি সমস্বরে বলেছেন যে, বাঙ্গলায় কিছু হচ্ছে না,—না দর্শন, না বিজ্ঞান, না সাহিত্য, না ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের প্রধান বক্তব্য এই যে, আমরা না পাই সত্যের সাক্ষাৎ, না করি সত্যাসত্যের বিচার। আমরা সত্যের স্রষ্টাও নই, দ্রষ্টাও নই; কাজেই আমাদের দর্শন-চর্চ্চা realও নয়, criticalও নয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, কি "মূর্ত্ত-বিজ্ঞান", কি "অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান",—এ দুয়ের কোনটিই বাঙ্গালী অদ্যাবধি আত্মসাৎ কর্‌তে পারে নি। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগও আমাদের হাতে পড়ে নি, তার তন্ত্রভাগও আমাদের মনে ধরে নি। আমরা শুধু বিজ্ঞানের স্থূলসূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করেছি, এবং তার পরিভাষার নামতা মুখস্থ করেছি। যে বিদ্যা প্রয়োগ-প্রধান, কেবলমাত্র তার মন্ত্রের শ্রবণে এবং উচ্চারণে বাঙ্গালী জাতির মোক্ষলাভ হবে না। এক কথায় আমাদের বিজ্ঞান-চর্চ্চা real নয়।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে ইতিহাস-চর্চ্চার উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার এবং উদ্ধার,—এ সত্য নিত্য এবং গুপ্ত সত্য

নয়, অনিত্য এবং লুপ্ত সত্য,—অতএব এ সত্যের দর্শন লাভের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক। অতীতের জ্ঞান লাভ করবার জন্য হীরেন্দ্রবাবুর বর্ণিত বোধীর (Intuition) প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন আছে শুধু শিক্ষিত বুদ্ধির। অতীতের অন্ধকারের উপর বুদ্ধির আলো ফেলাই হচ্ছে ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্ত্তব্য,—সে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয়। অথচ আমরা সে অন্ধকারে শুধু ঢিল নয়, পাথর ছুঁড়ছি,—ফলে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের ঐতিহাসিকদের দেহ পরস্পরের শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছে। এক-কথায় আমাদের ইতিহাস-চর্চ্চা critical নয়।

অতএব দেখা গেল যে, সম্মিলনের সকল শাখাপত্রি এ বিষয়ে একমত যে,. কিছু হচ্ছে না। কিন্তু কি যে হচ্ছে, সে কথা বলেছেন স্বয়ং সভাপতি। তিনি বলেন বাঙ্গলা-সাহিত্যে যা হচ্ছে, তার নাম চুট্‌কি। এ কথা লাখ কথার এক কথা। সকলেই জানেন যে, যখন আমরা ঠিক কথাটি ধরতে না পারি, তখনই আমরা লাখ কথা বলি। এই "চুট্‌কি" নামক বিশেষণটি খুঁজে না পাওয়ায়, আমরা বঙ্গ-সরস্বতীর গায়ে "বিজাতীয়" "অভিজাতীয়" "অবাস্তব" "অবান্তর" প্রভৃতি নানা নামের ছাপ মেরেছি—অথচ তার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারি নি।

তার কারণ—এ সকল ছোট ছোট বিশেষণের অর্থ কি, তার ব্যাখ্যা করতে বড় বড় প্রবন্ধ লিখতে হয়, কিন্তু চুট্‌কি যে কি পদার্থ তা যে আমরা সকলেই জানি, তার প্রমাণ হাতে-হাতেই দেওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিভাষণ যে চুট্‌কি নয়, এ কথা স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয়ও স্বীকার করতে বাধ্য—কেননা

এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভাবে ও ভাষায় এর চাইতে ভারি অঙ্গের গন্তবন্ধ জর্ম্মানীর বাইরে পাওয়া দুষ্কর।

হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণও চুট্‌কি নয়। তবে শাস্ত্রীমহাশয় এ মতে সায় দেবেন কি না জানিনে, কেননা হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ একে সংক্ষিপ্ত, তার উপর আবার সহজবোধ্য, অর্থাৎ সকল দেশের সকল যুগের সকল দার্শনিক তত্ত্ব যে পরিমাণে বোঝা যায়, হীরেন্দ্রবাবুর দার্শনিক তত্ত্বও ঠিক সেই পরিমাণে বোঝা যায়—তার কমও নয়, বেশিও নয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে, যে কাব্য মহাকায়, তাই হচ্ছে মহাকাব্য। গজমাপে যদি সাহিত্যের মর্য্যাদা নির্ণয় করতে হয়, তাহলে হীরেন্দ্রবাবুর রচনা অবশ্য চুট্‌কি—কেননা, তার ওজন যতই হোক্ না কেন, তার আকার ছোট।

অপরপক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের অভিভাষণযুগল যে চুট্‌কি-অঙ্গের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শাস্ত্রীমহাশয়ের নিজের কথা এই :—"একখানি বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব ততদিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে, এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব"—এ রকম যাতে হয় না, তারি নাম চুটকি। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গলায় এ রকম কজন পাঠক আছেন যাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রবন্ধ পড়ে তাঁদের ভিতরটা সব ওলটপালট হয়ে গেছে?

শাস্ত্রীমহাশয় বাঙ্গলা-সাহিত্যে চুট্‌কির চেয়ে কিছু বড় জিনিষ চান। বড় বইয়ের যদি ধর্ম্মই এই হয় যে, তা পড়বামাত্র

আমাদের মনের ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে,—তাহলে সেরকম বই যত কম লেখা হয় ততই ভাল, কারণ দিনে একবার করে যদি পাঠকের অন্তরাত্মার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে—তাহলে বড় বই লেখবার লোক যেমন বাড়্‌বে, পড়বার লোকও তেমনি কমে আস্‌বে। তিনি চুট্‌কির সম্বন্ধে যে দুটি ভাল কথা বলেন নি তা নয়—কিন্তু সে অতি মুরুব্বিয়ানা করে। ইংরাজেরা বলেন, স্বল্পস্তুতির অর্থ অতিনিন্দা। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ চুটকি সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের পক্ষে একটু যাচিয়ে দেখা দরকার। তিনি বলেন—চুট্‌কির একটি দোষ আছে, "যখনকার তখনই, বেশি দিন থাকে না।" এ কথা যে ঠিক নয়—তা তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণ করা যায়। সংস্কৃত অভিধানে চুট্‌কি শব্দ নেই,—কিন্তু ও বস্তু যে সংস্কৃত-সাহিত্যে আছে, সে কথা শাস্ত্রীমহাশয়ই আমাদের বলে দিয়েছেন। তাঁর মতে "কালিদাস ও ভবভূতির পর চুট্‌কি আরম্ভ হইয়াছিল, কেননা শতক, দশক, অষ্টক, সপ্তশতী, এই সব ত চুট্‌কি সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।" তথাস্তু। শাস্ত্রীমহাশয়ের বর্ণিত সংস্কৃত চুট্‌কির দুটি একটি নমুনার সাহায্যেই দেখানো যেতে পারে যে, আর্য্যযুগেও চুট্‌কি কাব্যাচার্য্যদিগের নিকট অতি উপাদেয় ও মহার্ঘ বস্তু বলেই প্রতিপন্ন হত। ভর্ত্তৃহরির শতক তিনটি সকলের নিকটই সুপরিচিত, এবং "গাথা সপ্তশতী"ও বাঙ্গলাদেশে একেবারে অপরিচিত নয়। ভর্ত্তৃহরি ভবভূতির পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, কেননা জনরব এই যে তিনি কালিদাসের ভ্রাতা, এবং ইতিহাসের অভাবে কিম্বদন্তীই প্রামাণ্য। সে যাই হোক, "গাথা সপ্তশতী" যে কালিদাসের জন্মের অন্ততঃ দু তিন শ' বছর পূর্ব্বে সংগৃহীত

হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তাহলে দাঁড়ালো এই যে, আগে আসে চুট্‌কি, তারপর আসে মহাকাব্য এবং মহানাটক। অভিব্যক্তির নৈসর্গিক নিয়মই এই যে, এ জগতে সব জিনিসই ছোট থেকে ক্রমে বড় হয়। সাহিত্যও ঐ একই নিয়মের অধীন। তার পর পূর্ব্বোক্ত শতকত্রয় এবং পূর্ব্বোক্ত সপ্তশতী যখনকার তখনকারই নয়,—চিরদিনকারই। এ মত আমার নয়—বাণভট্টের। গাথা সপ্তশতী শুধু চুট্‌কি নয়—একেবারে প্রাকৃত-চুট্‌কি,—তথাপি শ্রীহর্ষকারের মতে—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎসাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধ জাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥"

তারপর ভর্ত্তৃহরি যে এক-ন'র পান্না, এক-ন'র চুণী এবং এক-ন'র নীলা—এই তিন-ন'র রত্নমালা সরস্বতীর কণ্ঠে পরিয়ে গেছেন,—তার প্রতি রত্নটি যে বিশুদ্ধ জাতীয় এবং অবিনাশী, তার আর সন্দেহ নেই। যাবচ্চন্দ্র দিবাকর এই তিন শত বর্ণোজ্জ্বল শ্লোক সরস্বতীর মন্দির অহর্নিশি আলোকিত করে রাখবে।

আসল কথা, চুট্‌কি যদি হেয় হয়, তাহলে কাব্যের চুট্‌কিত্ব তার আকারের উপর নয়, তার প্রকারের অথবা বিকারের উপর নির্ভর করে—নচেৎ সমগ্র সংস্কৃত কাব্যকে চুটকি বল্‌তে হয়। কেননা সংস্কৃত ভাষায় চার ছত্রের বেশি কবিতা নেই—কাব্যেও নয়, নাটকেও নয়। শুধু কাব্য কেন, হাতে-বহরে বেদও চুট্‌কির অন্তর্ভূত হয়ে পড়ে। শাস্ত্রীমহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান ব'লে বেদাভ্যাস করেন না। কর্ণবেধের জন্য যতটুকু বেদ দরকার, ততটুকুই এদেশে ব্রাহ্মণ সন্তানের করায়ত্ত। অথচ

বাঙ্গালী বেদপাঠ না করেও এ কথা জানে যে, ঋক্ হচ্চে ছোট কবিতা, এবং সাম গান। সুতরাং আমরা যখন ছোট কবিতা ও গান রচনা করি, তখন আমরা ভারতবর্ষের কাব্যরচনার সনাতন রীতিই অনুসরণ করি।

শাস্ত্রীমহাশয় মুখে যাই বলুন—কাজে তিনি চুট্‌কিরই পক্ষপাতী। তিনি আজীবন চুট্‌কিতেই গলা সেধেছেন, চুট্‌কিতেই হাত তৈরি করেছেন,—সুতরাং কি লেখায়, কি বক্তৃতায়, আমরা তাঁর এই অভ্যস্ত বিদ্যারই পরিচয় পাই। তিনি বাঙ্গালীর যে বিংশপর্ব্ব মহাগৌরব রচনা করেছেন, তা ঐতিহাসিক চুট্‌কি বই আর কিছুই নয়,—অন্ততঃ সে রচনাকে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অন্য কোনও নামে অভিহিত করবেন না।

একথা নিশ্চিত যে, তিনি সরকারমহাশয়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন নি, সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসে যে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুসারে আবিষ্কৃত সত্য বাঙ্গালীর পক্ষে পুষ্টিকর হতে পারে, কিন্তু রুচিকর হবে না। সরকারমহাশয় বলেন যে এদেশের ইতিহাসের সত্য যতই অপ্রিয় হোক্—বাঙ্গালীকে তা বল্‌তেও হবে, শুন্‌তেও হবে। অপর পক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের উদ্দেশ্য তাঁর রচনা লোকের মুখরোচক করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তিনি নানারকম সত্য ও কল্পনা এক-সঙ্গে মিলিয়ে ঐতিহাসিক সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ রচনায় যে মাল আছে তাও মশলা থেকে পৃথক করে নেওয়া যায় না। শাস্ত্রীমহাশয়ের কথিত বাঙ্গলার পুরাবৃত্তের কোনও ভিত্তি আছে কি না বলা কঠিন। তবে এ ইতিহাসের যে গোড়াপত্তন করা হয় নি—সে বিষয়ে আর

দ্বিমত নেই। ইতিহাসের ছবি আঁক্‌তে হলে প্রথমে ভূগোলের জমি করতে হয়। কোনও একটি দেশের সীমার মধ্যে কালকে আবদ্ধ না করতে পারলে, সে কালের পরিচয় দেওয়া যায় না। অসীম আকাশের জিওগ্রাফি নেই—অনন্ত কালেরও হিষ্টরি নেই। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় সেকালের বাঙ্গালীর পরিচয় দিতে গিয়ে সেকালের বাঙ্গলার পরিচয় দেন নি,—ফলে গৌরবটা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে আমাদের কি অপরের প্রাপ্য—এ বিষয়েও সন্দেহ থেকে যায়। শাস্ত্রীমহাশয়ের শক্ত হাতে পড়ে দেখতে পাচ্ছি অঙ্গ ভয়ে বঙ্গের ভিতর সেঁধিয়েছে—কেননা যে "হস্তায়ুর্বেদ" আমাদের সর্ব্বপ্রথম গৌরব, সে শাস্ত্র অঙ্গরাজ্যে রচিত হয়েছিল। বাঙ্গলার লম্বাচৌড়া অতীতের গুণবর্ণনা করতে হলে, বাঙ্গলা দেশটাকেও একটু লম্বাচৌড়া করে নিতে হয়, সম্ভবতঃ সেই জন্য শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের হয়ে অঙ্গকেও বে-দখল করে বসেছেন। তাই যদি হয়, তাহলে বরেন্দ্র-ভূমিকে ছেঁটে দেওয়া হ'ল কেন? শুন্‌তে পাই বাঙ্গলার অসংখ্য প্রত্নরাশি বরেন্দ্রভূমি নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে। বাঙ্গলার পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় দিতে গিয়ে বাঙ্গলার যে ভূমি সব চেয়ে প্রত্নগর্ভা, সে প্রদেশের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ না করবার কারণ কি? যদি এই হয় যে, পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গের আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না, এবং থাকলেও সে দেশ বঙ্গের বহির্ভূত ছিল—তাহলে সে কথাটাও বলে দেওয়া উচিত। নচেৎ বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি আমাদের মনে একটা ভুল ধারণা এমনি বদ্ধমূল করে দেবে যে, তার "আমূল পরিবর্ত্তন" কোনও চুটকি ইতিহাসের দ্বারা সাধিত হবে না।

শাস্ত্রীমহাশয় যে তাম্রশাসনে শাসিত নন্ তার প্রমাণ, তিনি পাতায় পাতায় বলেন "আমি বলি" "আমার মতে" এই সত্য। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারে না, অর্থাৎ এক কথায় তা কাব্য—এবং যখন তা কাব্য, তখন তা যে চুট্‌কি হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শাস্ত্রীমহাশয়ের দেখতে পাই আর একটি এই অভ্যাস আছে যে, তিনি নামের সাদৃশ্য থেকে পৃথক পৃথক বস্তু এবং ব্যক্তির ঐক্য প্রমাণ করেন। একীকরণের এ পদ্ধতি অবশ্য বৈজ্ঞানিক নয়। কৃষ্ট এবং খৃষ্ট, এ দুটি নামের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও, ও দুটি অবতারের প্রভেদ শুধু বর্ণগত নয়, বর্গগতও বটে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের অবলম্বিত পদ্ধতির এই একটি মহাগুণ যে, ঐ উপায়ে অনেক পূর্ব্বগৌরব আমাদের হাতে আসে, যা বৈজ্ঞানিক হিসাবে ন্যায়তঃ অপরের প্রাপ্য। কিন্তু উক্ত উপায়ে অতীতকে হস্তান্তর করার ভিতর বিপদও আছে। একদিকে যেমন গৌরব আসে—অপরদিকে তেমনি অগৌরবও আস্‌তে পারে। অগৌরব শুধু যে আস্‌তে পারে তাই নয়, বস্তুতঃ এসেওছে।

স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয় ঐতরেয় আরণ্যক হতে এই সত্য উদ্ধার করেছেন যে, প্রাচীন আর্য্যেরা বাঙ্গালী-জাতিকে পাখী বলে গালি দিতেন। সে বচনটি এই:—

"বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা"

প্রথম পরিচয়ে আর্য্যেরা যে বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে অনেক অকথা কুকথা বলেন, তার পরিচয় আমরা এ যুগেও পেয়েছি। Vide Macaulay. সুতরাং প্রাচীন আর্য্যেরাও যে প্রথম পরিচয়ে

বাঙ্গালীদের প্রতি নানারূপ কটূকাটব্য প্রয়োগ করেছিলেন, এ কথা সহজেই বিশ্বাস হয়। তবে এ ক্ষেত্রে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, যদি গালি দেওয়াই তাঁদের অভিপ্রায় ছিল, তাহলে আর্য্যেরা আমাদের পাখী বল্‌লেন কেন? পাখী বলে গাল দেবার প্রথা ত কোনও সভ্যসমাজে প্রচলিত দেখা যায় না। বরং "বুলবুল" "ময়না" প্রভৃতি এদেশে আদরের ডাক বলেই গণ্য। এবং ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হলে আমরা তাকে "ঘুঘু" উপাধিদানে সম্মানিত করি। অপমান করবার উদ্দেশ্যে মানুষকে যে সব প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে, তারা প্রায়শঃই ভূচর এবং চতুষ্পদ;—দ্বিপদ এবং খেচর নয়। পাখী বলে নিন্দা কর্‌বার একটি মাত্র শাস্ত্রীয় উদাহরণ আমার জানা আছে। বাণভট্ট তাঁর সমসাময়িক কুকবিদের কোকিল বলে ভৎর্সনা করেছেন—কেননা তারা বাচাল, কামকারী, এবং তাদের "দৃষ্টি রাগাধিষ্ঠিত"—অর্থাৎ তাদের চক্ষু রক্তবর্ণ। গাল হিসেবে এ যে যথেষ্ট হ'ল না—সে কথা বাণভট্টও বুঝেছিলেন, কেননা পরবর্ত্তী শ্লোকেই তিনি বলেছেন যে, কুকুরের মত কবি ঘরে ঘরে অসংখ্য মেলে, কিন্তু শরভের মত কবি মেলাই দুর্ঘট। এস্থলে কবিকে প্রশংসাচ্ছলে কেন শরভ বলা হল—একথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন,—তার উত্তর, শরভ জানোয়ার হলেও চতুষ্পদ নয়, অষ্টপদ,—এবং তার অতিরিক্ত চারিখানি পা ভূচর নয়, খেচর।

এই সব কারণে কেবলমাত্র শব্দের সাদৃশ্য থেকে এ অনুমান করা সঙ্গত হবে না যে, আর্য্য ঋষিরা অপর এত কড়াকড়া গাল থাক্‌তে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কেবলমাত্র পাখী বলে গাল

দিয়েছেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আমাদের সঙ্গে মাগধ এবং চের জাতিও এ গালির ভাগ পেয়েছে। কেননা তাঁর মতে বঙ্গা হচ্ছে বাঙ্গালী, বগধা হচ্ছে মগধা, এবং চেরপাদা হচ্ছে চের নামক অসভ্য জাতি। "চেরপাদা" যে কি করে "চের"তে দাঁড়াল, তা বোঝা কঠিন। বাক্যের পদচ্ছেদের অর্থ পা কেটে ফেলা নয়। অথচ শাস্ত্রী মহাশয় "চেরপাদা"র পাদুখানি কেটে ফেলেই "চের" খাড়া করেছেন।

"বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা"—এই যুক্তপদের শুনতে পাই সেকেলে পণ্ডিতেরা এইরূপ পদচ্ছেদ করেন—

বঙ্গা + অবগধাঃ + চ + ইরপাদা।

ইরপাদা অর্থে সাপ। তাহলে দাঁড়াল এই যে, বাঙ্গালী ও বেহারীকে প্রথমে পাখী এবং পরে সাপ বলা হয়েছে। উক্ত বৈদিক নিন্দার ভাগ আমি বেহারীদের দিতে পারিনে। অবগধা মানে যে মাগধা, এর কোনও প্রমাণ নেই। অতএব শাস্ত্রীমহাশয় যেমন "চেরপাদা"র শেষ দুই বর্ণ ছেঁটে দিয়ে "চের" লাভ করেছেন, আমিও তেমনি "অবগধা" শব্দের প্রথম দুটি বর্ণ বাদ দিয়ে পাই "গধা"। এইরূপ বর্ণ-বিচ্ছেদের ফলে উক্ত বচনের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আর্য্য ঋষিদের মতে বাঙ্গালী আদিতে পক্ষী, অন্তে সর্প, এবং ইতিমধ্যে গর্দ্দভ।

"অবগধা"কে "গধা"য় রূপান্তরিত করা সম্বন্ধে কেউ কেউ এই আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, সেকালে যে গাধা ছিল, তার কোনও প্রমাণ নেই। শাস্ত্রীমহাশয় বাঙ্গালীর প্রথম গৌরবের কারণ দেখিয়েছেন যে, পুরাকালে বাঙ্গলায় হাতি ছিল—কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বিতীয় গৌরবের এ কারণ দেখান নি যে, সেকালে এদেশে গাধাও ছিল। কিন্তু গাধা যে ছিল, এ অনুমান করা

অসঙ্গত হবে না। কেননা যদি সেকালে গাধা না থাকৃত ত একালে এদেশে এত গাধা এল কোথা থেকে? ঘোড়া যে বিদেশ থেকে এসেছে, তার পরিচয় ঘোড়ার নামেই পাওয়া যায়, যথা—পগেয়া, ভুটিয়া, তাজি, আরবী ইত্যাদি। কিন্তু গর্দ্দভদের এরূপ কোনও নামরূপের প্রভেদ দেখা যায় না। এবং ও জাতি যে, যে-কোনও অর্ব্বাচীন যুগে বঙ্গদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তারও কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।—অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে—রাসভকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এদেশে এখনও আছে, পূর্ব্বেও ছিল। তবে একমাত্র নামের সাদৃশ্য থেকে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হবে যে, আর্য্য ঋষিরা পুরাকালের বাঙ্গালীদের এরূপ তিরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় "বঙ্গ" শব্দের অর্থ বৃক্ষ। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আরণ্যক শাস্ত্রে বৃক্ষ পক্ষী সর্প প্রভৃতি আরণ্য জীবজন্তুরই উল্লেখ করা হয়েছে—বাঙ্গালীর নামও করা হয় নি।—অতএব আমাদের অতীত অতি গৌরবেরও বস্তু নয়—অতি অগৌরবেরও বস্তু নয়।

আর একটি কথা। হীরেন্দ্রবাবু দর্শন-শব্দের, এবং যোগেশ বাবু বিজ্ঞান-শব্দের নিরুক্তের আলোচনা করেছেন, কিন্তু যদুবাবু ইতিহাসের নিরুক্ত সম্বন্ধে নীরব। ইতিহাস-শব্দ সম্ভবতঃ হস ধাতু হতে উৎপন্ন—অন্ততঃ শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস যে হাস্যরসের উদ্রেক করে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। এমন কি, আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, শাস্ত্রীমহাশয় পুরাতত্ত্বের ছলে আত্মশ্লাঘাপরায়ণ বাঙ্গালী জাতির সঙ্গে একটি মস্ত রসিকতা করেছেন।

বীরবল।

হিতসাধন

সেদিন কলিকাতায় এক হিতসাধন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং দেশের প্রধান-প্রধান ব্যক্তি ইহাতে যোগ দিয়াছেন। ইহা সুলক্ষণ, ইহাই ত চাই, ইহাই যে আমাদের সাধন। এই হিতসাধন-সম্বন্ধে বেদপথিক হিন্দুগণ কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন, এ সময়ে তাহা একবার আলোচনা করা মন্দ নহে; আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতিসংক্ষিপ্ত ভাবে তাহাই করিবার চেষ্টা করিব।

দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, বেদপন্থীদের সমাজের নানাস্থানে বর্ত্তমান দুরবস্থা দর্শন করিয়া অনেকে তাঁহাদের ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্ম্মের আদর্শকেও তাঁহারা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ভাবে ধরিয়া লইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, ধর্ম্মের আদর্শ মহান্-অতিমহান্ হইলেও যদি তাহা অনুষ্ঠান করা না হয়, অনুভব করিবার চেষ্টা করা না হয়, তবে তাহা ক্ষুদ্র-অতিক্ষুদ্র ভাবে যে প্রতীয়মান হইবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। কিন্তু ইহা ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের আদর্শের দোষ নহে, লোকের অজ্ঞান-অশিক্ষা, আলস্য অনভ্যাস প্রভৃতিই এখানে দোষ। নিরুক্তকার এক স্থানে বলিয়াছেন —"নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতীতি।" অন্ধ যে স্থাণুকে দেখিতে পায় না, তাহা স্থাণুর দোষ নহে। বেদপন্থীর হিতসাধনের আদর্শ আমাদের এই কথাটিকে সমর্থন করিবে।

বেদপন্থী ত্রিকোটিকুলোদ্ধার ফল দেখাইয়া সাধারণ লোককে পুণ্যানুষ্ঠানে প্রলোভিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে,

সঙ্গে-সঙ্গেই সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া পরিত্যাগ করিবার জন্য বলা হইয়াছে, কারণ "ফলে সক্তো নিবধ্যতে।" এ সম্বন্ধে এখানে বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

যে ধর্ম্মের সর্ব্বসার কথা এবং সমস্ত জ্ঞান-সাধনের চরম লক্ষ্য হইতেছে সমস্ত ভূতের মধ্যে আত্মাকে, এবং সমস্ত ভূতকে আত্মার মধ্যে দেখিতে হইবে; সমস্ত ভূতের মধ্যে ভগবান্‌কে, এবং সমস্ত ভূতকে ভগবানের মধ্যে দেখিতে হইবে; আমার মনে হয়, সেই ধর্ম্মে বিশ্বহিতসাধন যেরূপ সুন্দর আকার ধারণ করিতে পারে, এবং বস্তুতও করিয়াছে, অপর ধর্ম্মে সেরূপ করিতে পারে না।

বেদপন্থীর ধর্ম্মে এই কথা বলে যে, এই যে, স্থাবর-জঙ্গমময় বিশ্ব, ইহা ভগবানের শরীর, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ইত্যাদি অষ্ট মূর্ত্তি দ্বারা তিনি এই বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। এই বিশ্ব-স্থিত কোনো দেহীর কোনরূপ পীড়ন করিলে অষ্টমূর্ত্তিধর ভগবানের তাহা অভিমত হয় না, তাহা তাঁহার অপ্রীতিকর। কারণ, সকলের উপকার করা, সকলকে অনুগ্রহ করা এবং সকলকে অভয়প্রদান করাই শিবের পূজা। বেদান্তদর্শনের শৈবভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ (১, ২, ১) পুরাণের এই বচন তুলিয়াছেন :—

"বিগ্রহং দেবদেবস্য জগদেতচ্চরাচরম্।
এতমর্থং ন জানন্তি পশবঃ পাশ গৌরবাৎ॥
বিদ্যেতি চেতনাং প্রাহুস্তথাবিদ্যামচেতনাম্।
বিদ্যাবিদ্যাত্মকং সর্ব্বং বিশ্বং বিশ্বগুরোর্বিভোঃ॥
রূপমস্য ন সন্দেহো বিশ্বং তস্য বশে যতঃ॥

* * *

দেহিনো যস্য কস্যাপি নিগ্রহঃ ক্রিয়তে যদি।
অনিষ্টমষ্টমূর্ত্তেস্তন্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"

"সর্ব্বোপকারকরণং সর্ব্বানুগ্রহণং তথা।
সর্ব্বাভয় প্রদানঞ্চ শিবস্যারাধনং বিদুঃ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে (২-৩৩) উক্ত হইয়াছে—

কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্॥ *

শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাটা নানাস্থানে নানারকম বলা হইয়াছে। কপিলমূর্ত্তি ভগবান্ জননীকে বলিতেছেন:—

আমি সমস্ত ভূতের আত্মা; আমি সমস্ত ভূতে রহিয়াছি; এই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মানব প্রতিমা দ্বারা অনুকরণ করিয়া থাকে। আমি ঈশ্বর, আমি সকলের আত্মা, আমি সমস্ত ভূতে রহিয়াছি; এই আমাকে উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি প্রতিমার ভজন করে, তাহার ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়। অন্যেরও শরীরে আমিই রহিয়াছি, যে ব্যক্তি এইরূপে অলক্ষিত আমাকে দ্বেষ করে, যে ব্যক্তির ভূতসমূহের প্রতি বৈরবুদ্ধি থাকে, সেই ভেদদর্শীর মন কখনো শান্তি লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ভূতগ্রামের অবমাননা করিয়া থাকে, সে নানাবিধ উপকরণ-সম্ভারে প্রতিমাতে আমার পূজা করিলেও আমি তাহাতে সন্তুষ্ট

* দ্রষ্টব্য (ঐ, ২-২৭)—"সর্ব্বলোকোপকারায় সর্ব্বপ্রাণিহিতায় চ।"

হই না। আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বর—এইরূপে যতক্ষণ আমাকে নিজহৃদয়ে জানিতে না পারিবে, ততক্ষণই প্রতিমায় পূজা করিতে হয়। যে ব্যক্তি নিজের ও পরের মধ্যে স্বল্পমাত্রও ভেদ করিয়া থাকে, মৃত্যু সেই ভেদদর্শীর জন্য ভীষণ ভয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন।

অতএব, এই যে আমি সমস্ত ভূতের আত্মা,—সমস্ত ভূতের মধ্যে বাস করিতেছি, সেই আমাকে দান, মান, মৈত্রী ও অভেদ দৃষ্টি দ্বারা পূজা করিবে।

মূল শ্লোক কয়টি পাঠকবর্গের হৃদয়াকর্ষক হইল বলিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্ দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ৩-২৯-২১—২৭।

মানব যখন এইরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করে, তখন কেবল মানুষ নহে, সমস্ত জীবের নিকট সে প্রণত হয়, সমস্ত জীবকেই বহু মান প্রদান করে; সে ভাবে জীবরূপে ভগবানই তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ঃ—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥"
৩-২৯-৩৩।

"প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমা-বাশ্ব-চণ্ডাল-গো-খরম্।"
১১-২৯-১৬।

মানব তখন প ণ্ডি ত হয়, তাহার নিকট ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের ভেদ থাকে না ঃ—

ব্রাহ্মণে পুক্কশে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ প ণ্ডি তো মতঃ ॥
১১-২৯-১৪।

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ প ণ্ডি তাঃ সমদর্শিনঃ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫-১৮।

এইরূপ ভাব, হইলেই মানব তখন নিজের সুখসম্পদের কথা

ভুলিয়া বিশ্বের দুঃখের ভার নিজের মস্তকে লইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠে :—

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিল দেহ ভাজাম্
অন্তঃস্থিতো, যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৯-২১-১২।

ভগবানের নিকট আমি ইহা প্রার্থনা করি না যে, আমার অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি-যুক্ত পরম গতি হউক, বা অপুনর্জ্জন্ম হউক। আমি ইহাই প্রার্থনা করি, যেন আমি সমস্ত দেহীর অন্তঃকরণ-স্থিত হইয়া তাহাদের দুঃখ-পীড়াকে গ্রহণ করিতে পারি,—যাহাতে তাহাদিগকে আর দুঃখভোগ করিতে না হয়।

হৃদয়ে যেমন-যেমন এই ভাব পরিস্ফুট হইয়া দৃঢ় হইতে থাকিবে, মানব তেমন-তেমন সুন্দরভাবে বিশ্বের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে পারিবে। সভা-সমিতির দ্বারা বাহিরে যেমন চেষ্টা করা হইতেছে, ভাবনা দ্বারা ভিতরেও সেইরূপ চেষ্টা করিলে মণিকাঞ্চন-যোগ হইবে। বাহিরের ভাব দেহ, ভিতরের ভাব প্রাণ। প্রাণবিরহিত দেহ বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকে না। আমাদিগকে প্রাণের উপাসনা করিতে হইবে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

৺দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় কথিত

আমি এ সভায় কোনরূপ বক্তৃতা করবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইনি, যদিচ সেক্রেটারি মহাশয়ের নিমন্ত্রণ পত্রে আমার নাম বক্তা-শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করা হয়েছে। সভা সমিতিতে বক্তৃতা করার অভ্যাস আমার নেই—এবং অনভ্যাস বশতঃ সবার সুমুখে মুখ খুলতে আমার সঙ্কোচও হয়, ভয়ও হয়। এ ক্ষেত্রে ৺দ্বিজেন্দ্র লালের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে, অপ্রতিভভাবে, উপস্থিতমত যা মনে আসে, দুচার কথা বলে' দেওয়া আমার মতে উচিত ব্যবহার হবে না—না তাঁর প্রতি—না আমার প্রতি।

তবে যে আমি বিনা আপত্তিতে, সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করতে উদ্যত হয়েছি, তার কারণ, তিনি যখন ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার আজীবন বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে আমাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করেছেন, তখন সে অনুরোধ আমি আদেশ হিসেবে প্রতিপালন করতে বাধ্য। সভাপতি মহাশয় যা যা বলেছেন সে সবই সত্য। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমার বয়েস পাঁচ এবং তাঁর দশ কি এগারো। এবং আমাদের পরস্পারের প্রতি পরস্পারের ঐকান্তিক সদ্ভাব কখনও নষ্ট হয় নি। সাহিত্যে আমাদের মতান্তর ঘটেছে, কিন্তু জীবনে কখনও মনান্তর ঘটে নি। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর ভিতর বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, বঙ্গসাহিত্যের আখড়ায় আমি তাঁর সঙ্গে লকড়ি খেলেছি, কিন্তু সে আপোষে। এ খেলায়

আমরা পরস্পর পরস্পরকে ফাঁক দেখিয়ে দিয়েছি। তবে দু' এক বাড়ি যে গায়ে পড়েনি এ কথা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু তার জন্য আমাদের ক্ষণিক গাত্রজ্বালা উপস্থিত হ'লেও, স্থায়ী মনোমালিন্য ঘটেনি। এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে, যে এই আশৈশব সৌহার্দ্দ্যের ফলে, আমি ৺দ্বিজেন্দ্রলালের মনের এবং চরিত্রের সম্যক্‌ পরিচয় লাভ কর্‌বার অনেকটা অবসর পেয়েছি। কিন্তু আজকের সভায়, মানুষ হিসেবে এবং কবি হিসেবে, ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা কর্‌তে আমি প্রস্তুত নই। এ সকল বিষয়ে আমার মতামত আমি ভবিষ্যতে, অবসর মত, লিখে প্রকাশ কর্‌ব। প্রবীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ৺দ্বিজেন্দ্রলালের উপর প্রকাশ্যে যে সকল কটুকথা বর্ষণ করেছেন, আমি এই সুযোগে সেই অযথা নিন্দাবাদের প্রতিবাদ কর্‌তে চাই—কেননা সে নিন্দা রুচিসঙ্গতও নয়, যুক্তি সঙ্গতও নয়।

সরকার মহাশয় গত বৎসর এই কলিকাতা সহরের টাউনহলে, সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে' উচ্চৈঃস্বরে এই অপবাদ ঘোষণা করেন যে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সঙ্গীতের সর্ব্বনাশ সাধন করেছেন।

৺দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি সরকার মহাশয়ের আক্রোশ এত অপরিমিত যে তিনি নিজমুখে এই কথা বলেছেন যে, মৃত দ্বিজেন্দ্রলালের উপর ভব্যতার সীমা অতিক্রম করে' আক্রমণ করে'ও তাঁর মনের ক্ষোভ মেটেনি। সরকার মহাশয়ের সমালোচনা যে, ভব্যতার সীমা অতিক্রম করে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

সভ্যসমাজে পরলোকগত ব্যক্তিকে স্বর্গীয় বলেই উল্লেখ করা হয়, কিন্তু সরকার মহাশয় তার পরিবর্ত্তে ৺দ্বিজেন্দ্রলালকে "মৃত" বলে উল্লেখ করেছেন—সম্ভবতঃ এই কারণে যে হিন্দুসঙ্গীতের এই কালা পাহাড়কে তিনি স্বর্গেতর লোকে প্রেরণ করতে চান।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতের জাতিপাত করেছেন এ অপবাদ যদি সত্য হয় তাহলে ভব্যতার সীমা অতিক্রম করে' নয়, রক্ষা করে', সে কথাটি দেশের লোককে বলা এবং বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। বিশেষতঃ ৺দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে এরূপ সমালোচনার যথেষ্ট সার্থকতা আছে, কেননা এ কবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রধানতঃ গান রচনায়। যাঁর সুরজ্ঞান নেই তাঁর পক্ষে গান রচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুর বাদ দিয়ে গানের কথায় যা অবশিষ্ট থাকে তা অনেক স্থলে না থাকারই সামিল। অতএব, ৺দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে সরকার মহাশয়ের অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে এ কবির রচনার কোনই মূল্য নেই, কোনই মর্য্যাদা নেই; এবং কবি হিসেবে তিনি শুধু উপেক্ষার কেন, অবজ্ঞারও পাত্র।

আজ কাল দেখ্তে পাই সমালোচকেরা কবিতার ভাব ও ভাষার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে এ উভয়ের পৃথক্ সমালোচনা করেন। সমালোচকের মতে এ কবির ভাব মূল্যবান কিন্তু ভাব তদনুরূপ নয়, এবং ও কবির ভাষা চমৎকার কিন্তু ভাব অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আসল কথা এই যে, ভাব ও ভাষায় দু'য়ে মিলে একবস্তু না হ'লে কবিতা হয় না। প্রদেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের পৃথক বর্ণনা এবং তার দোষগুণের পৃথক বিচার করেছেন, কিন্তু এ জ্ঞান তাঁদের ছিল যে, ভাষা

হচ্ছে ভাবের দেহ এবং ভাব ভাষার আত্মা। এবং যে রচনায় প্রাণ আছে—সেখানে এ দু'য়ের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। আমরা ভাব থেকে ভাষা ছাড়িয়ে নিয়ে গড়ি Philology ও Grammar, এবং ভাষা থেকে ভাব ছাড়িয়ে নিয়ে গড়ি Psychology ও Logic। এ সকল শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিষয়। যা অনুভূতির দিক থেকে, আর্টের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে সমগ্র, তাই আবার বিচার বুদ্ধির দিক থেকে, বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে সমষ্টি মাত্র। সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে রস—যে রচনায় সে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়, সে রচনায় ভাব ভাষা পৃথক করা যায় না। কাব্যরস যে কতটা ধ্বনির অধীন, তার পরিচয় আমরা সংস্কৃত কাব্যের বাঙ্গলা অনুবাদে নিত্যই পাই। অপরের কথা দূরে থাক, স্বয়ং কালিদাসের ভারতী বঙ্গভাষাস্থ হয়ে যে কতদূর কাহিল এবং অস্থিচর্ম্মসার হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ নয়। কবিতার প্রাণ যদি ধ্বনির উপর নির্ভর করে তাহলে গানের প্রাণ যে সম্পূর্ণ সুরের উপর নির্ভর কর্‌বে সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত হতে পারে না। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুর যদি গুণীসমাজে অসহ্য এবং অগ্রাহ্য হয় তাহলে তাঁর গানও বাঙ্গালীর নিকট অসহ্য এবং অগ্রাহ্য হত। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, সে গান বঙ্গদেশে অতি আদরের সামগ্রী তখন যিনি গানের 'গা'ও জানেন না তিনিও ধরে' নিতে পারেন যে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীত সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ এবং মুর্খ ছিলেন না।

সরকার মহাশয়ের সমালোচনা পড়ে' মনে হয় যে, হয় তাঁর হিন্দু

সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় নেই, নয় তাঁর ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সঙ্গে পরিচয় নেই। তাঁর অভিভাষণ পাঠে তাঁর সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। কাউকে সা রি গ ম সাধ্‌তে শুন্‌লে, সরকার মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, অথচ ধৈর্য্য ধরে সা রি গ ম অভ্যেস না কর্‌লে কি করে ও-বিদ্যা যে আয়ত্ব করা যায় সে কথা তিনি বলে দেননি। সঙ্গীত শিক্ষার অপর কোনও উপায় যদি থাকে তাহলে সে উপায় এ দেশের সঙ্গীতাচার্য্যদের জানা নেই। সঙ্গীতের ভাষাজ্ঞান যে তাঁর নেই তার প্রমাণ উক্ত অভিভাষণের একটি গোটা পাতায় পাওয়া যায়। অপর পক্ষে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যে হিন্দু সঙ্গীতের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং তাঁর যে এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও যথেষ্ট অধিকার ছিল তা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত।

সঙ্গীত তাঁর কুলবিদ্যা এবং সে বিদ্যা তাঁকে কায়ক্লেশে আয়ত্ব করতে হয়নি, কেন না ভগবান তাঁকে গানের গলা এবং সুরের কাণ দিয়েছিলেন। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল যে বারো তেরো বৎসর বয়েসে গুণী-সমাজে গায়ক হিসেবে আদৃত হতেন, সে বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর সংস্কারের অনুরূপ শিক্ষা ছিল। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গান যে বাঙ্গালী জাতির নিকট একটা আদর লাভ করেছে—আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ এই যে, এ কবির আর্ট সঙ্গীতপ্রাণ এবং সঙ্গীতকায়। আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল আগে কবিতা রচনা করে' পরে তাতে সুর বসাতেন না, কিন্তু আগে তাঁর মনে একটি সুর আস্‌ত তার পরে কথা সেই সুরকে অনুসরণ কর্‌ত। এ রকম মনে করবার

কারণ এই যে, যে কথা সুরে বসে না সে কথায় তাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠেনি। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের মনের প্রকৃতির একটি উদ্দাম ভাব ছিল, সুতরাং তাঁর মনোভাব যদি সঙ্গীতের কঠিন বন্ধনের মধ্যে ধরা না পড়্‌ত তাহলে তাঁর রচনা আর্ট হত কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

৺দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের হাস্যরস কতটা তার কথার আর কতটা তার সুরের উপর নির্ভর করে বলা কঠিন। সুতরাং সুর থেকে বিশ্লিষ্ট করে' তাঁর কথার এবং কথা থেকে বিশ্লিষ্ট করে' তাঁর সুরের মূল্য নির্ণয় কর্‌বার চেষ্টা ব্যর্থ হবারই সম্ভাবনা। তবে যখন একজন খ্যাতনামা সমালোচক তাঁর সুরের উপর আক্রমণ করেছেন তখন সে সুরের বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব সম্বন্ধে দুচার কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

আপনারা সকলেই জানেন যে, সঙ্গীতে কোন বিশেষ রস ফুটিয়ে তুলতে হ'লে, সেই রসের অনুরূপ সুরের আবশ্যক। করুণ রসের প্রকাশের জন্য সুরও করুণ হওয়া চাই—এবং বীর রসের প্রকাশের জন্য সুরও রুদ্র হওয়া চাই। কিন্তু এ বিষয়ে হাস্যরসের একটু বিশেষত্ব আছে। অনুরূপ কি বিরূপ, সকল রূপ সুরেই গুণী ব্যক্তির হাতে হাস্যরস সমান ফুটে ওঠে। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানে সুর সম্বন্ধে যে এই উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন তা দুচারটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। সুরের এবং কথার স্পষ্ট এবং ঘোর অসামঞ্জস্য যে সহজেই হাসির উদ্রেক করে, তার প্রমাণ ৺দ্বিজেন্দ্রলালের—

"এক যে ছিল শেয়াল, তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল"
"বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্‌টাপ্‌"
"পুরাকালে ছিল শুনি, দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি"
"নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ"

প্রভৃতি গান। এ সকল গানের কথা যেমন হালকা—সুরও তেমনি ভারি। হিন্দু সঙ্গীতের রাগ রাগিণীর উপর ৺দ্বিজেন্দ্রলালের কতটা অধিকার ছিল, এই সকল গানের সুরই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সকল সুর যে খাঁটি দরবারি শুধু তাই নয়, ঢংও খাঁটি কালোয়াতি।

"এক যে ছিল শেয়াল"—হচ্ছে পূরবীর মামুলি খেয়াল।

"বৃষ্টি পড়িতেছে টুপটাপ"—কানাড়া ও মহ্লারের মিশ্রণে যে সুর হয় তাই—অর্থাৎ মেঘমহ্লার।

"পূরাকালে ছিল শুনি, দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি"—দরবারি কানাড়া।

এবং "নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ"—বিশুদ্ধ পরজ।

এ সকল সুর অবলীলাক্রমে গাওয়ার ভিতর যে কত শিক্ষা এবং কত সাধনা আছে তা যিনি সঙ্গীতের স্বল্প চর্চ্চা করেছেন তিনিই জানেন। এবং ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু মাত্রেই জানেন যে তিনি তাঁর স্বরচিত এই গানগুলি কতদূর নির্ভুল তালে মানে লয়ে সুরে গাইতেন। সুতরাং ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুরজ্ঞান ছিল না একথা শুধু তিনিই বল্‌তে পারেন যাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে কোনরূপ সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। যিনি জীবনে কখন দুছত্র কবিতা রচনা করতে পারেন নি কিম্বা করেন নি, তিনি কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক হলেও হতে পারেন—কিন্তু যিনি সপ্তসুরকে

কখনও হাতে কিম্বা গলায় আয়ত্ব করতে চেষ্টা করেন নি, তিনি সঙ্গীতের সমালোচক হতে পারেন না। কেননা সঙ্গীত শিক্ষা প্রয়োগ সাপেক্ষ।

৺ দ্বিজেন্দ্রলাল যে তাঁর সকল গানেই ওস্তাদি সুর দেন নি, তার কারণ তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে হাস্যরসের অনুরূপ সুরের সৃষ্টি কর্‌তে হলে আমাদের তৈরি রাগ রাগিণীকে একটু বাঁকিয়ে চুরিয়ে নূতন করে' গড়ে' নেওয়া আবশ্যক। তিনি তাই প্রচলিত সুরের পরিচিত আকার পরিবর্ত্তন করে' তার নূতন আকার দিয়েছেন, তার বিকার সাধন করেন নি।

"বিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন—নবরত্ন নভাই"—এই গানটিতে কথার অনুরূপ সুরেরও আগাগোড়া একটা বেপরোয়া ভাব আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এ গানটি শুনলে স্বয়ং তানসেনও মুখভার করা দূরে থাক্ হাস্য সম্বরণ কর্‌তে পারতেন না। ৺ দ্বিজেন্দ্র-লালের রচিত এ ধরণের সুরের আর কোন উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—কেননা তাঁর অধিকাংশ গান এই ধরণের।

সম্ভবতঃ ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্ভাবিত এই নূতন ঢঙের প্রতিই সরকার মহাশয় তাঁর সকল আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। এ ঢং যদি কারও ভাল না লাগে—তাহলে তাঁর কথার কোন উত্তর দেওয়া চলে না। তবে যদি কেউ বলেন যে, এ ঢং বিশ্রী বা বিকৃত—তাহলেই তর্ক উপস্থিত হয়।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য একটি নতুন ঢঙের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাতে করে' হিন্দুসঙ্গীতের ধর্ম্ম নষ্ট হয় নি—কেননা ওস্তাদি ঢং ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের একমাত্র ঢং নয়। দেশভেদে যুগভেদে এদেশে নানা ঢঙের উৎপত্তি হয়েছে। যাঁদের সঙ্গীতের দাক্ষিণাত্যে

প্রচলিত রীতির সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে দক্ষিণী ঢং এবং হিন্দুস্থানী ঢং এত বিভিন্ন যে দুই একজাতীয় সঙ্গীত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। অথচ এ দুই যে মূলতঃ এক জাতীয়, বিশেষজ্ঞ মাত্রেই তা জানেন। তারপর এই হিন্দুস্থানী গানেরও প্রদেশভেদে সুরের চেহারা বদ্‌লে যায়। আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে বিষ্ণুপুরে একটি নূতন ঢঙের সৃষ্টি হয়েছে—যা দেশে বিদেশে বিষ্ণুপুরি ঢং বলে' পরিচিত। এ সকল ঢঙে অবশ্য সনাতন সুরতাল রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালীর যা সম্পূর্ণ নিজস্ব বস্তু কীর্ত্তন—তাতে রাগরাগিণীকে এতটা রূপান্তরিত করা হয়েছে যে, সে গান শুনে অনেক ওস্তাদে কানে হাত দেন। কিন্তু ওস্তাদেরা স্বীকার না করলেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বাঙ্গলার কীর্ত্তন হিন্দুসঙ্গীত। সুতরাং ৺দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের রাগরাগিণীর উপর হস্তক্ষেপ করায় তাঁর অহিন্দুত্বের পরিচয় দেন নি—পরিচয় দিয়েছেন শুধু তাঁর বাঙ্গালীত্বের।

৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব এই যে, সে সুরের ভিতর অতিসহজে একটি বিলেতি চাল এসে পড়েছে। আমার মতে সঙ্গীত সম্বন্ধে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তাঁর প্রতিভার বলে আমাদের রাগরাগিণী বিলেতি চাল এত সহজে অঙ্গীকার করেছে যে তাঁর সুরের এই বিলেতি ভঙ্গি আমাদের কানে মোটেই বেখাপ্পা লাগে না। আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে দেশী গান বাজনাকে বিলেতি ছাঁচে ঢালবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিলেতি Concertএর অনুকরণে আমাদের দেশে যে সব "ঐক্যতান-গীতবাদ্যের" রচনা করা হয়েছে তা শুনে যুগপৎ হাসি

ও কান্না পায়। কারণ, এ সকল তানে ও গানে আর যাই করা হয়ে থাক্, দেশী ও বিলাতি সঙ্গীতের ঐক্যসাধন করা হয়নি। তার কারণ কেবলমাত্র Mechanical উপায়ে এইরূপ ঐক্যসাধনের চেষ্টা বৃথা। Mechanical পদ্ধতি হচ্ছে যোড়াতাড়া দিয়ে গড়্‌বার পদ্ধতি। যোড়াতাড়ার সাহায্যে পৃথিবীতে আর যাই হো'ক আর্ট হয় না। আর্টের সৃষ্টির পদ্ধতি হচ্ছে Organic. ৺দ্বিজেন্দ্রলালের হিন্দুসঙ্গীতের ন্যায় ইউরোপীয় সঙ্গীতেরও পরিচয় ছিল। তাঁর অন্তরে এই দুয়ের অলক্ষিত মিলনের ফলে তাঁর সুরের সৃষ্টি। আমরা আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের সাহায্যে যা গড়ে' তুলতে পারিনি, যখন দেখি অপর কারও মন থেকে তা আপনিই গড়ে' উঠছে তখন আমরা বলি যে সে গঠনক্রীয়ার মূল আর্টের সৃষ্টিকর্ত্তার মগ্ন-চৈতন্যে নিহিত। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন ঢঙের নবসুরের সৃষ্টি করেছেন, সে সুর তাঁর মগ্ন-চৈতন্যে, দেশী ও বিলাতি সুরের নিগূঢ় মিলনে, সৃষ্ট হয়েছে।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে "ঐ দেখা যায় আমার বাড়ি চারদিকে মালঞ্চের বেড়া" এই গানের সঙ্গে কথায় এবং সুরে, "আমার দেশ"এর যে প্রভেদ বাঙ্গলার সেকেলে গান রচয়িতাদের সঙ্গে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সেই প্রভেদ। তিনি বলেন যে, হয়ত কারও কারও মতে "আমার বাড়ি" "আমার দেশ" অপেক্ষা অধিক মধুর। কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পার্‌বেন না যে "আমার দেশ"-এ যে ওজস্বিতা আছে "আমার বাড়ী"-তে তার বিন্দুমাত্রও নেই। তাঁর মতে এই ওজঃগুণের সমাবেশেই ৺দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার বিশেষত্ব এবং

শ্রেষ্ঠত্ব। ইংরাজি কাব্য এবং ইংরাজি সঙ্গীতের শিক্ষার প্রসাদেই ৺দ্বিজেন্দ্রলাল এই ওজঃগুণ লাভ করেছিলেন। "আমার দেশ"-এর সুর ঝিঁঝিট। কিন্তু এ ঝিঁঝিট এবং বাঙ্গলা ঝিঁঝিটে তফাৎ এত বেশি যে প্রচলিত ঢঙে এ গান গাইতে গেলে এর সুর একেবারে এলিয়ে পড়্‌বে। অথচ "আমার দেশ"-এর ঝিঁঝিটের সকল সুর বজায় আছে এবং তার তালও পূরামাত্রায় একতালা। অতএব এ কথা সাহস করে বলা যেতে পারে যে আমাদের রাগরাগিণী ৺দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে বেঁকেচুরে গেলেও ভেঙ্গেচুরে যায়নি। রাগরাগিণীর উপর অসাধারণ অধিকার না থাক্‌লে সুরকে নিয়ে যা খুসি তাই করা যায় না। অধিকাংশ গায়ক এবং বাদক অভ্যস্ত বিদ্যারই পুনরাবৃত্তি করেন—কেননা সঙ্গীতে নূতন সুরের কিম্বা নূতন ঢঙের সৃষ্টি করবার জন্য প্রতিভা চাই। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতকে যে একটি নূতন পথে চালাতে সক্ষম হয়েছেন তাতে করে' তিনি সঙ্গীত-বিষয়ে অনভিজ্ঞতার নয়, প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

আমার শেষ কথা এই যে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুরগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারলেই তাঁর যথার্থ স্মৃতি রক্ষা করা হবে। এ সকল সুরের বিশেষত্বের লোপ পাবার সম্ভাবনা খুব বেশি, কেননা সুর মুখে মুখে কথার চাইতেও বেশি বদ্‌লে যায়। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি যদি আমরা অতি সত্বর স্বরলীপিতে আবদ্ধ না করি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সে সব সুর আমাদের চল্‌তি সুরেতে পরিণত হবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সোনার কাঠি

রূপকথায় আছে, রাক্ষসের যাদুতে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন। যে পুরীতে আছেন সে সোনারপুরী, যে পালঙ্কে শুয়েচেন সে সোনার পালঙ্ক; সোনা মাণিকের অলঙ্কারে তাঁর গা ভরা। কিন্তু কড়াক্কড় পাহারা, পাছে কোনো সুযোগে বাহিরের থেকে কেউ এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তাতে দোষ কি? দোষ এই যে, চেতনার অধিকার যে বড়। সচেতনকে যদি বলা যায় তুমি কেবল এইটুকুর মধ্যেই চিরকাল থাক্‌বে, তার এক পা বাইরে যাবে না, তাহলে তার চৈতন্যকে অপমান করা হয়। ঘুম পাড়িয়ে রাখার সুবিধা এই যে তাতে দেহের প্রাণটা টিঁকে থাকে কিন্তু মনের বেগটা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, নয় সে অদ্ভুত স্বপ্নের পথহীন ও লক্ষ্যহীন অন্ধলোকে বিচরণ করে।

আমাদের দেশের গীতিকলার দশাটা এই রকম। সে মোহ-রাক্ষসের হাতে পড়ে' বহুকাল থেকে ঘুমিয়ে আছে। যে ঘরটুকু যে পালঙ্কটুকুর মধ্যে এই সুন্দরীর স্থিতি তার ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই; চারিদিকে কারুকার্য্য, সে কত সূক্ষ্ম কত বিচিত্র! সেই চেড়ির দল, যাদের নাম ওস্তাদি, তাদের চোখে ঘুম নেই; তারা শত শত বছর ধরে সমস্ত আসা যাওয়ার পথ আগ্‌লে বসে আছে, পাছে বাহির থেকে কোনো আগন্তুক এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

তাতে ফল হয়েছে এই যে, যে কাল্‌টা চল্‌চে রাজকন্যা তার গলায় মালা দিতে পারেনি, প্রতিদিনের নূতন নূতন ব্যবহারে

তার কোনো যোগ নেই। সে আপনার সৌন্দর্য্যের মধ্যে বন্দী, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অচল।

কিন্তু তার যত ঐশ্বর্য্য যত সৌন্দর্য্যই থাক্ তার গতিশক্তি যদি না থাকে তাহলে চল্‌তি কাল তার ভার বহন করতে রাজি হয় না। একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের উপর অচলাকে শুইয়ে রেখে সে আপন পথে চলে যায়—তখন কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে কালেরও দারিদ্র্য, কলারও বৈকল্য।

আমরা স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি আমাদের দেশে গান জিনিষটা চলচে না। ওস্তাদরা বল্‌চেন, গান জিনিষটা ত চল্‌বার জন্যে হয় নি, সে বৈঠকে বসে থাক্‌বে তোমরা এসে সমের কাছে খুব জোরে মাথা নেড়ে যাবে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, আমাদের বৈঠকখানার যুগ চলে গেছে, এখন আমরা যেখানে একটু বিশ্রাম করতে পাই সে মুসাফিরখানায়। যা কিছু স্থির হয়ে আছে তার খাতিরে আমরা স্থির হয়ে থাক্‌তে পারব না। আমরা যে নদী বেয়ে চলচি সে নদী চল্‌চে, যদি নৌকোটা না চলে তবে খুব দামী নৌকো হলেও তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।

সংসারের স্থাবর অস্থাবর দুই জাতের মানুষ আছে অতএব বর্ত্তমান অবস্থাটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ থাক্‌বেই। কিন্তু মত নিয়ে করব কি? যেখানে একদিন ডাঙা ছিল সেখানে আজ যদি জল হয়েই থাকে তবে সেখানকার পক্ষে দামী চৌঘুড়ির চেয়ে কলার ভেলাটাও যে ভালো।

পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে দূরদেশ থেকে কলকাতা সহরে আস্‌ত। ধনীদের ঘরে মজ্‌লিস

বস্তুত, ঠিক সমে মাথা নড়তে পারে এমন মাথা গুন্তিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের সহরে বক্তৃতা সভার অভাব নেই, কিন্তু গানের মজলিস বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তানমানলয় সমেত বৈঠকী গান পুরোপুরী বরদাস্ত করতে পারে এত বড় মজ্‌বুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।

চর্চ্চা নেই বলে জবাব দিলে আমি শুন্‌ব না। মন নেই বলেই চর্চ্চা নেই। আকবরের রাজত্ব গেছে এ কথা আমাদের মানতেই হবে। খুব ভাল রাজত্ব, কিন্তু কি করা যাবে—সে নেই। অথচ গানেতেই যে সে রাজত্ব বহাল থাক্‌বে এ কথা বল্‌লে অন্যায় হবে। আমি বল্‌ছিনে আকবরের আমলের গান লুপ্ত হয়ে যাবে—কিন্তু এখনকার কালের সঙ্গে যোগ রেখে তাকে টিকতে হবে—সে যে বর্ত্তমান কালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিজেরই পুনরাবৃত্তিকে অন্তহীন করে তুল্‌বে তা হতেই পারবে না।

সাহিত্যের দিক থেকে উদাহরণ দিলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। আজ পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চল্‌তে থাক্‌ত তাহলে কি হত? পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হত তাহলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাদম্বরীর আমি নিন্দা করচিনে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা করে' বসে, তাহলে

সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাক্‌বে, মানুষ থাক্‌বে না।

বঙ্কিম আন্‌লেন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন্ সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত লয়লামজ্‌নুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে' উঠ্‌লেন। চল্‌তিকালের সঙ্গে তাঁর মালা বদল হয়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে ?

যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলীন্যকে বড় করে' মানে তারা বল্‌বে ঐ রাজপুত্রটা যে বিদেশী। তারা এখনো বলে, এ সমস্তই ভুয়ো; বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে ত সে ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তাহলে এ কথা বল্‌তেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।

বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিষকে মুক্তি দিয়েছে সে ত বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েচে এই, যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করচে ও গৌরব করচে। অথচ যদি ঠাহর করে' দেখি তবে দেখ্‌তে পাব, গদ্যে পদ্যে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে। যাঁরা তাকে জাতিচ্যুত বলে' নিন্দা করেন ব্যবহার করবার বেলা তাকে তাঁরা বর্জ্জন করতে পারেন না।

সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসচে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে নাই। গ্রীসের সভ্যতার গোড়ায় অন্য সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজিপ্ট্ ও এসিয়া থেকে ধাক্কা পেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড় মনের সঙ্গে আর্য্য মনের সংঘাত ও সম্মিলন ভারতসভ্যতা সৃষ্টির মূল উপকরণ, তার উপরে গ্রীস্‌, রোম পারস্য তাকে কেবলি নাড়া দিয়েচে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় যে সব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমস্তই অন্য দেশ ও অন্য কালের সংঘাতের যুগ। মানুষের মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীর্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার অধিকার বিস্তার করচে। এই অধিকার বিস্তারকে একদল লোক দোষ দেয়, বলে ওতে আমরা নিজেকে হারালুম—তারা জানে না নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিজেকে হারিয়ে যাওয়া নয়—কারণ বৃদ্ধি মাত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজীবন লাভের লক্ষণ দেখচি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ছোঁয়ার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পূরোপূরি অনুভব করিনে, তখন অনুকরণটাই বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চল্‌তে পারি। সেই নিজের জোরে চলার একটা

লক্ষণ এই যে তখন আমরা পরের পথেও নিজের শক্তিতেই চল্‌তে পারি। পথ নানা, অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার। যদি পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করি, যদি একই বাঁধা পথ থাকে, তাহলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না—তাহলে কলের চাকার মত চল্‌তে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ বলে গৌরব করার মত অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই।

আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁচছে। কিন্তু সঙ্গীতে পৌঁছয়নি। সেই জন্যেই আজও সঙ্গীত জাগ্‌তে দেরি করচে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেই জন্যে সঙ্গীতের বেড়া টলমল করচে। এ কথা বল্‌তে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জ্জন করেচে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করচে, যে গানে আনন্দ পাচ্চে সে গান জাত-খোয়ানো গান। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই। কীর্ত্তনে বাউলে বৈঠকে মিলিয়ে যে জিনিষ আজ তৈরি হয়ে উঠ্‌চে সে আচারভ্রষ্ট। তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করচে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড় গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মত অনেক বিষ হজম করে' ফেলে। লোকের ভাল লাগ্‌চে, সবাই শুন্‌তে চাচ্চে, শুন্‌তে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়চে না,—এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচ্‌ল, চল্‌তে সুরু করল। প্রথম চালটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গী হাস্যকর এবং কুশ্রী—কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে, চল্‌তে সুরু করেচে—সে বাঁধন মানচে না। প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সব চেয়ে বড় সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা

এখনকার এই গানের গোলমেলে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেচে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাখ্‌তে পারবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেচে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসঙ্গীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্ব্বাদ করবেন। হিঁদু-সঙ্গীত বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দুসঙ্গীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড় করেই পাবে। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সংঘাত আজ লেগেছে —সেই সংঘাতে সত্য উজ্জ্বল হবে না, নষ্টই হবে, এমন আশঙ্কা যে ভীরু করে, যে মনে করে সত্যকে সে নিজের মাতামহীর জীর্ণ কাঁথা আড়াল করে ঘিরে রাখ্‌লে তবেই সত্য টিঁকে থাক্‌বে, আজকের দিনে সে যত আস্ফালনই করুক তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্য হিঁদুর সত্য নয়, পল্‌তেয় করে ফোঁটা ফোঁটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয় না; চারদিক থেকে মানুষের নাড়া খেলেই সে আপনার শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র

ঘরে বাইরে

৫

নিখিলেশের আত্মকথা

একদিন আমার মনে বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর আমাকে যা দেবেন আমি তা নিতে পারব। এ পর্য্যন্ত তার পরীক্ষা হয়নি। এবার বুঝি সময় এল।

মনকে যখন মনে মনে যাচাই করতুম অনেক দুঃখ কল্পনা করেচি। কখনো ভেবেচি দারিদ্র্য, কখনো জেলখানা, কখনো অসম্মান, কখনো মৃত্যু। এমন কি, কখনো বিমলের মৃত্যুর কথাও ভাবতে চেষ্টা করেচি। এ সমস্তই নমস্কার করে মাথায় করে নেব এ কথা যখন বলেচি বোধ হয় মিথ্যা বলিনি।

কেবল একটা কথা কোনো দিন মনে কল্পনাও করতে পারিনি। আজ সেই কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন বসে বসে ভাবচি, এও কি সইবে?

মনের ভিতরে কোন্ জায়গায় একটা কাঁটা বিঁধে রয়েচে। কাজকর্ম্ম করচি কিন্তু বেদনার অবসান নেই। বোধ হয় যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সেই একটা ব্যথা পাঁজর কাটতে থাকে। সকালে জেগে উঠেই দেখি দিনের আলোর লাবণ্য শুকিয়ে গেছে। কি? এ কি? কি হয়েছে? এ কালো কিসের কালো? কোথা দিয়ে আমার সমস্ত পূর্ণ চাঁদের উপর ছায়া ফেল্‌তে এল?

আমার মনের বোধশক্তি হঠাৎ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে যে, যে দুঃখ আমার অতীতের বুকের ভিতর সুখের ছদ্মবেশ পরে লুকিয়ে বসেছিল তার সমস্ত মিথ্যা আজ আমার নাড়ি টেনে টেনে ছিঁড়চে, আর যে লজ্জা যে দুঃখ ঘনিয়ে এল বলে, সে যতই প্রাণপণে ঘোমটা টান্‌চে আমার হৃদয়ের সাম্‌নে—ততই তার আব্রু ঘুচে গেল। আমার সমস্ত হৃদয় দৃষ্টিতে ভরে গিয়েচে—যা দেখ্‌বার নয়, যা দেখ্‌তে চাইনে তাও বসে বসে দেখ্‌চি।

আমি চিরদিন ঐশ্বর্য্যের ফাঁকির মধ্যে এত বড় কাঙাল হয়ে বসেছিলুম সে কথা এতকাল ভুলিয়ে রেখে আজ হঠাৎ দিনের পর দিনে, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে, কথার পর কথায়, দৃষ্টির পর দৃষ্টিতে, সেই আমার প্রতারিত জীবনের দুর্ভাগ্য এমন তিল তিল করে প্রকাশ করবার দিন এল কেন? যৌবনের এই ন'টা বছর মাত্র মায়াকে যা খাজনা দিয়েচি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সত্য সেটাকে সুদে আসলে কড়ায় কড়ায় আদায় করতে থাকবে। ঋণশোধের সম্বল যার একেবারে ফুরোলো সব চেয়ে বড়

ঋণ শোধের ভার তারই ঘাড়ে। তবু যেন প্রাণপণে বল্‌তে পারি, হে সত্য তোমারি জয় হোক্।

আমার পিস্‌তুত বোন মুনুর স্বামী গোপাল কাল এসেছিল তার মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাইতে। সে আমার ঘরের আসবাব গুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছিল আমার মত সুখী জগতে আর কেউ নেই। আমি বল্লুম, "গোপাল, মুনুকে বোলো কাল আমি তার ওখানে খেতে যাব।" মুনু আপনার হৃদয়ের অমৃতে গরীবের ঘরটিকে স্বর্গ করে রেখেচে। সেই লক্ষ্মীর হাতের অন্ন একবার খেয়ে আসবার জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ আজ কাঁদচে। তার ঘরের অভাবগুলিই তার ভূষণ হয়ে উঠেছে। আজ তাকে একবার দেখে আসিগে।—ওগো পবিত্র, জগতে তোমার পবিত্র পায়ের ধূলো আজো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

জোর করে অহঙ্কার করে কি করব? না হয় মাথা হেঁট করেই বল্লুম আমার গুণের অভাব আছে। পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সব চেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়ত সেই জোর নেই। কিন্তু জোর কি শুধু আস্ফালন, শুধু খামখেয়াল, জোর কি এই রকম অসঙ্কোচে পায়ের তলায়—কিন্তু এ সমস্ত তর্ক করা কেন? ঝগড়া করে ত যোগ্যতা লাভ করা যায় না! অযোগ্য, অযোগ্য, অযোগ্য! না হয় তাই হল—কিন্তু ভালোবাসার ত মূল্য তাই—সে যে অযোগ্যতাকেও সফল করে তোলে। যোগ্যের জন্যে

পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে—অযোগ্যের জন্যেই বিধাতা কেবল এই ভালোবাসাটুকু রেখেছিলেন।

একদিন বিমলকে বলেছিলুম তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে—সে ছিল ঘরগড়া বিমল, ছোট জায়গা এবং ছোট কর্ত্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক ম্যুনিসিপালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মত?

আমি লোভী? যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার অনেক বেশি? না, আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেই জন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিষ চাইনি —আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনো মতেই ধরা যায় না। স্মৃতি সংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাইনি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ বিকশিত বিমলকে দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল।

একটা কথা তখন ভাবিনি মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্তরূপে সত্যরূপেই দেখতে চাই তাহলে তার উপরে একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়। একথা কেন ভাবিনি? স্ত্রীর উপর স্বামীর নিত্য-দখলের অহঙ্কারে?—না, তা নয়। ভালোবাসার উপর একান্ত ভরসা ছিল বলেই।

সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ সহ্য করবার শক্তি আমার আছে

এই অহঙ্কার আমার মনে ছিল। আজ তার পরীক্ষা হচ্চে। মরি আর বাঁচি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব এই অহঙ্কার এখনো মনে রেখে দিলুম।

আজ পর্য্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারেনি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্ব্বলতা বলেই জানি। যে দুর্ব্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না;—ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্য্যের পরে বিমলের ধৈর্য্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দ্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন কি, অন্যায়কারীকে দেখ্‌তে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।

ভেবেছিলুম বড় জায়গায় এসে জীবনকে যখন সে বড় করে দেখ্‌বে তখন দৌরাত্ম্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু আজ দেখ্‌তে পাচ্চি ওটা বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন করে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে তুল্‌তে চায়—অন্য সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে।

তেমনি আমার পণ এই যে কোনো একটা উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মত দেশের কাজে লাগ্‌ব না। আমি বরঞ্চ কাজের ত্রুটি সহ্য করি তবু চাকরবাকরকে মারধোর করতে পারিনে, কারো উপর রেগেমেগে হঠাৎ কিছু একটা বল্‌তে বা করতে আমার সমস্ত দেহ মনের ভিতর একটা সঙ্কোচ বোধ হয়। আমি জানি আমার এই সঙ্কোচকে মৃদুতা বলে বিমল মনে

মনে অশ্রদ্ধা করে—আজ সেই একই কারণ থেকে সে ভিতরে ভিতরে আমার উপরে রাগ করে উঠ্‌চে যখন দেখ্‌চে আমি বন্দেমাতরম্‌ হেঁকে চারিদিকে যা-ইচ্ছে-তাই করে বেড়াইনে।

আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাইনি এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েচি। দেশের লোক ভাবচে আমি খেতাব চাই কিম্বা পুলিসকে ভয় করি; পুলিস ভাবচে ভিতরে আমার কুমৎলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেচি।

কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে', যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার করে' মা বলে' দেবী বলে' মন্ত্র পড়ে যাদের কেবলি সম্মোহনের দরকার হয় তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত করে দিলেই আমরা আর বল পাইনে। হয় কোনো কল্পনাকে, নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার করে না বসালে সে নড়তে চায় না। যতক্ষণ সহজ সত্যে আমরা স্বাদ পাইনে, যতক্ষণ এই রকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীন ভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয়নি। ততক্ষণ, আমাদের অবস্থা যেমনি হোক্, হয় কোনো কাল্পনিক ভূত নয় কোনো

সত্যকার ওঝা, নয় একসঙ্গে দুইয়ে মিলে, আমাদের উপর উৎপাত করবেই।

সেদিন সন্দীপ আমাকে বল্লে তোমার অন্য নানা গুণ থাকতে পারে কিন্তু তোমার কল্পনাবৃত্তি নেই ;—সেই জন্যেই স্বদেশের এই দিব্যমূর্ত্তিকে তুমি সত্য করে দেখ্‌তে পার না। দেখ্‌লুম বিমলও তাতে সায় দিলে। আমি আর উত্তর করলুম না। তর্কে জিতে সুখ নেই। কেন না এ ত বুদ্ধির অনৈক্য নয়, এ যে স্বভাবের ভেদ। ছোট ঘরকন্নার সীমাটুকুর মধ্যে এই ভেদ ছোট আকারেই দেখা দেয় সেই জন্যে সেটুকুতে মিলনগানের তাল কেটে যায় না। বড় সংসারে এই ভেদের তরঙ্গ বড়—সেখানে এই তরঙ্গ কেবলমাত্র কলধ্বনি করে না, আঘাত করে।

কল্পনাবৃত্তি নেই? অর্থাৎ আমার মনের প্রদীপে তেলবাতি থাকতে পারে কেবল শিখার অভাব! আমি ত বলি সে অভাব তোমাদেরই। তোমরা চকমকি পাথরের মত আলোকহীন, তাই এত ঠুক্‌তে হয় এত শব্দ করতে হয় তবে একটু একটু স্ফুলিঙ্গ বেরয়—সেই বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গে কেবল অহঙ্কার বাড়ে, দৃষ্টি বাড়ে না।

আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেচি, সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে। তার প্রকৃতি স্থূল অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বলেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে বড় নাম দিয়ে সাজিয়ে

তোলে। ভোগের তৃপ্তির মতই বিদ্বেষের আশু চরিতার্থতা তার পক্ষে উগ্ররূপে দরকারী। টাকা সম্বন্ধে সন্দীপের একটা লোলুপতা আছে সে কথা বিমল এর পূর্ব্বে আমাকে অনেকবার বলেচে। আমি যে তা বুঝিনি তা নয় কিন্তু সন্দীপের সঙ্গে টাকা সম্বন্ধে কৃপণতা করতে আমি পারতুম না। ও যে আমাকে ফাঁকি দিচ্চে একথা মনে করতেও আমার লজ্জা হত। আমি যে ওকে টাকার সাহায্য করচি সেটা পাছে কুশ্রী হয়ে দেখা দেয় এই জন্যে ও সম্বন্ধে আমি কোনো রকম তক্‌রার করতে চাইতুম না। আজ কিন্তু বিমলকে একথা বোঝানো শক্ত হবে যে, দেশের সম্বন্ধে সন্দীপের মনের ভাবের অনেক খানিই সেই স্থূল লোলুপতার রূপান্তর। সন্দীপকে বিমল মনে মনে পূজা করচে, তাই আজ সন্দীপের সম্বন্ধে বিমলের কাছে কিছু বল্‌তে আমার মন ছোট হয়ে যায়, কি জানি হয় ত তার মধ্যে আমার মনের ঈর্ষা এসে বেঁধে, হয় ত অত্যুক্তি এসে পড়ে। সন্দীপের যে ছবি আমার মনে জাগ্‌চে তার রেখা হয় ত আমার বেদনার তীব্র তাপে বেঁকেচুরে গিয়েচে। তবু মনে রাখার চেয়ে লিখে ফেলা ভালো।

আমার মাষ্টার মশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আজ আমার এই জীবনের প্রায় ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত দেখ্‌লুম তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। আমি যে বাড়িতে জন্মেচি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না—কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্ত্তিখানি নিয়ে

আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেচেন—তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েচি।

সেই চন্দ্রনাথবাবু সেদিন আমার কাছে এসে বল্লেন, সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে?

কোথাও অমঙ্গলের একটু হাওয়া দিলেই তাঁর চিত্তে গিয়ে ঘা দেয়, তিনি কেমন করে বুঝতে পারেন। সহজে তিনি চঞ্চল হন না কিন্তু সেদিন সাম্‌নে তিনি মস্ত বিপদের একটা ছায়া দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে কত ভালোবাসেন সে ত আমি জানি।

চায়ের টেবিলে সন্দীপকে বল্লুম, তুমি রংপুরে যাবে না? সেখান থেকে চিঠি পেয়েচি, তারা ভেবেচে আমিই তোমাকে জোর করে ধরে রেখেচি।

বিমল চা-দানি থেকে চা ঢালছিল। একমুহূর্ত্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে সন্দীপের মুখের দিকে একবার কটাক্ষমাত্রে চাইলে।

সন্দীপ বল্লে, আমরা এই যে চারদিকে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী প্রচার করে বেড়াচ্চি, ভেবে দেখ্‌লুম এতে কেবল শক্তির বাজে খরচ হচ্চে। আমার মনে হয় এক-একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে যদি আমরা কাজ করি তা হলে ঢের বেশি স্থায়ী কাজ হতে পারে।

এই বলে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, আপনার কি তাই মনে হয় না?

বিমল কি উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে পেলে না। একটু পরে বল্লে, দুরকমেই দেশের কাজ হতে পারে। চারদিকে ঘুরে কাজ করা কিম্বা এক জায়গায় বসে কাজ করা, সেটা নিজের ইচ্ছা কিম্বা স্বভাব অনুসারে বেচে নিতে হবে। ওর মধ্যে যে ভাবে কাজ করা আপনার মন চায় সেইটেই আপনার পথ।

সন্দীপ বল্লে, তবে সত্য কথা বলি। এতদিন বিশ্বাস ছিল ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেশকে মাতিয়ে বেড়ানই আমার কাজ। কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝেছিলুম। ভুল বোঝবার একটা কারণ ছিল এই যে আমার অন্তরকে সব সময়ে পূর্ণ রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো এক-জায়গায় পাইনি। তাই কেবল দেশে দেশে নতুন নতুন লোকের মনকে উত্তেজিত করে সেই উত্তেজনা থেকেই আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ করতে হত। আজ আপনিই আমার কাছে দেশের বাণী। এ আগুন ত আজ পর্য্যন্ত আমি কোনো পুরুষের মধ্যে দেখিনি। ধিক্ এত দিন আপন শক্তির অভিমান করেছিলুম। দেশের নায়ক হবার গর্ব্ব আর রাখিনে। আমি উপলক্ষ্য মাত্র হয়ে আপনার এই তেজে এইখানে থেকেই সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে তুলতে পারব এ আমি স্পর্দ্ধা করে বল্‌তে পারি। না, না, আপনি লজ্জা করবেন না—মিথ্যা লজ্জা সঙ্কোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মৌচাকের মক্ষিরাণী—আমরা আপনাকে চারিদিকে ঘিরে কাজ করব—কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই—তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট, আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

লজ্জায় এবং গৌরবে বিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল এবং চায়ের পেয়ালায় চা ঢাল্‌তে তার হাত কাঁপতে লাগল।

চন্দ্রনাথবাবু আর একদিন এসে বল্লেন, তোমরা দুজনে কিছুদিনের জন্যে একবার দার্জ্জিলিং বেড়াতে যাও—তোমার মুখ দেখে আমার বোধ হয় তোমার শরীর ভালো নেই। ভালো ঘুম হয় না বুঝি?

বিমলকে সন্ধ্যার সময় বল্লুম, বিমল দার্জ্জিলিঙে বেড়াতে যাবে?

আমি জানি দার্জ্জিলিঙে গিয়ে হিমালয় পর্ব্বত দেখবার জন্যে বিমলের খুব সখ ছিল। সেদিন সে বল্লে, না, এখন থাক্‌!

দেশের ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল।

আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোট জায়গা থেকে বড় জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা;—ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে বসে ছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলচ্চে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাইনে তাহলে বুঝব এতদিন যা নিয়ে ছিলুম সে কেবল ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সে দিন যদি আসে ত ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর জবরদস্তি? কিসের জন্যে? সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে?

৬

সন্দীপের আত্মকথা

যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েচে সেইটুকুই আমার, একথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্ব্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।

দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়— দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেই দিনই দেশ আমার হবে।

লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্চে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মান্‌তে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এই জন্যেই নীতিকে আজ পর্য্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠ্‌তে পারচে না।

যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায় পৃথিবীতে সেই আধ-মরা একদল লোক আছে নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক্। কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই সঙ্কোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যেই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু দামী সাজিয়ে রেখেচে। তারাই নদী সাঁৎরে আস্‌বে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা

লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিষ ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামী জিনেষের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ কর্ব্বে,—কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা, চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালোবাসে—তাই আধ-মরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্ত ফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না। নহবৎ-খানায় রসনচৌকি বাজ্‌চে—লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে গেল। বর কে? আমিই বর—যে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়তে পারে, বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহূত।

লজ্জা? না, আমি লজ্জা করিনে। যা দরকার আমি তা চেয়ে নিই, না চেয়েও নিই। লজ্জা করে যারা নেবার যোগ্য জিনিষ নিলে না তারা সেই না-নেবার দুঃখটাকে চাপা দেবার জন্যেই লজ্জাটাকে বড় নাম দেয়। এই যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্চে রিয়ালিটির পৃথিবী—কতকগুলো বড় কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি পেটে খালি হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল সে কেন এই শক্ত মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিল? আসমানে আকাশকুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা-তানে বাঁশি বাজাবার জন্যে ধর্ম্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল না কি? আমার সে বাঁশির বুলিতেও দরকার নেই, আমার সে আকাশকুসুমেও পেট ভরবে না। আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দল্‌ব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই,

পেতে আমার সঙ্কোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মত একেবারে পাৎলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চীঁচীঁ গলার ভর্ৎসনা আমার কানে পৌঁছবে না।

লুকোচুরি করতে আমি চাইনে কেননা তাতে কাপুরুষতা আছে কিন্তু দরকার হলে যদি করতে না পারি তবে সেও কাপুরুষতা। তুমি যা চাও তা তুমি দেয়াল গেঁথে রাখ্‌তে চাও সুতরাং আমি যা চাই তা আমি সিঁদ কেটে নিতে চাই। তোমার লোভ আছে তাই তুমি দেয়াল গাঁথ, আমার লোভ আছে তাই আমি সিঁধ কাটি। তুমি যদি কল কর আমি কৌশল করব। এইগুলোই হচ্চে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্য সাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড় বড় কাণ্ড কারখানা চল্‌চে। আর যে সব অবতার স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেইখানকার ভাষায় কথা কইতে থাকেন তাঁদের কথা বাস্তব নয়। সেই জন্যে এত চীৎকারে সে সব কথা কেবলমাত্র দুর্ব্বলদের ঘরের কোণে স্থান পায়; যারা সবল হয়ে পৃথিবী শাসন করে তারা সে সব কথা মান্‌তে পারে না। কেননা মান্‌তে গেলেই বলক্ষয় হয়; তার কারণ কথাগুলো সত্যই নয়। যারা এ কথা বুঝতে দ্বিধা করে না, মান্‌তে লজ্জা করে না তারাই কৃতকার্য্য হল, আর যে হতভাগা একদিকে প্রকৃতি আরেক দিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দুনৌকায় পা দিয়ে দুলে মরচে তারা না পারে এগোতে, না পারে বাঁচতে।

একদল মানুষ বাঁচবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে এই পৃথিবীতে

জন্মগ্রহণ করে। সূর্য্যাস্তকালের আকাশের মত মুমূর্ষুতার একটা সৌন্দর্য্য আছে, তারা তাই দেখে মুগ্ধ। আমাদের নিখিলেশ সেই জাতের জীব,—ওকে নিৰ্জ্জীব বল্লেই হয়। আজ চার বৎসর আগে ওর সঙ্গে আমার এই নিয়ে একদিন ঘোর তর্ক হয়ে গেছে। ও আমাকে বলে, "জোর না হলে কিছু পাওয়া যায় না সে কথা মানি, কিন্তু কাকে জোর বল, আর কোন্ জিনিষকে পেতে হবে তাই নিয়ে তর্ক। আমার জোর ত্যাগের দিকে জোর।"

আমি বল্লুম, অর্থাৎ লোকসানের নেশায় তুমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেচ।

নিখিলেশ বল্লে, হাঁ, ডিমের ভিতরকার পাখী যেমন তার ডিমের খোলাটাকে লোকসান করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। খোলাটা খুব বাস্তব জিনিষ বটে, তার বদলে সে পায় হাওয়া, পায় আলো—তোমাদের মতে সে বোধ হয় ঠকে।

নিখিলেশ এই রকম রূপক দিয়ে কথা কয় তার পরে আর তাকে বোঝানো শক্ত যে তৎসত্ত্বেও সেগুলো কেবল মাত্র কথা, সে সত্য নয়। তা বেশ, ও এই রকম রূপক নিয়েই সুখে থাকে ত থাক্—আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব, আমাদের দাঁত আছে নখ আছে, আমরা দৌড়তে পারি, ধরতে পারি, ছিঁড়তে পারি,—আমরা সকাল বেলায় ঘাস খেয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তারই রোমন্থনে দিন কাটাতে পারিনে অতএব এ পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে তোমরা রূপকওয়ালার দল তার দরজা আগ্‌লে থাকলে আমরা মান্‌তে পারব না। হয় চুরি করব, নয় ডাকাতি করব। নইলে যে আমাদের প্রাণ বাঁচবে না,—

আমরা ত মৃত্যুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পদ্মপাতার উপর শুয়ে শুয়ে দশম দশায় প্রাণত্যাগ করতে রাজী নই—তা এতে আমাকে বৈষ্ণব বাবাজিরা যতই দুঃখিত হোন্ না কেন!

আমার এই কথাগুলোকে সবাই বল্‌বে, ও তোমার একটা মত। তার কারণ, পৃথিবীতে যারা চল্‌চে তারা এই নিয়মেই চল্‌চে, অথচ বল্‌চে অন্য রকম কথা। এই জন্যে তারা জানেনা এই নিয়মটাই নীতি। আমি জানি। আমার এই কথাগুলো যে মতমাত্র নয় জীবনে তার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ওরা যে বাস্তব পৃথিবীর জীব, পুরুষদের মত ওরা ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না। ওরা আমার চোখে মুখে দেহে মনে কথায় ভাবে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়—সেই ইচ্ছা কোনো তপস্যার দ্বারা শুকিয়ে ফেলা নয়, কোনো তর্কের দ্বারা পিছন দিকে মুখ ফেরানো নয়, সে একেবারে ভরপূর ইচ্ছা—চাই চাই খাই খাই করতে করতে কোটালের বানের মত গর্জ্জে চলেছে। মেয়েরা আপনার ভিতর থেকে জানে এই দুর্দ্দম ইচ্ছাই হচ্চে জগতের প্রাণ। সেই প্রাণ আপনাকে ছাড়া আর কাউকে মানতে চায় না বলেই চারদিকে জয়ী হচ্চে। বারবার দেখলুম আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েচে, তারা মরবে কি বাঁচবে তার আর হুঁস থাকেনি। যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেইটেই হচ্চে বীরের শক্তি—অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি। যারা আর কোনো জগৎ পাবার আছে বলে কল্পনা করে তারা তাদের

ইচ্ছার ধারাকে মাটির দিক থেকে সরিয়ে আসমানের দিকেই নিয়ে যাক্—দেখি তাদের সেই ফোয়ারা কত দূর ওঠে, আর কত দিন চলে। এই আইডিয়াবিহারী সূক্ষ্ম প্রাণীদের জন্যে মেয়েদের সৃষ্টি হয়নি।

"এফিনিটি!" জোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে বিধাতা বিশেষ ভাবে এক-একটি মেয়ে এক-একটি পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েচেন, তাদের মিলই মন্ত্রের মিলের চেয়ে খাঁটি এমন কথা সময়মত দরকারমত অনেক জায়গায় বলেচি। তার কারণ, মানুষ মানতে চায় প্রকৃতিকে, কিন্তু একটা কথার আড়াল না দিলে তার সুখ হয় না। এই জন্যে মিথ্যে কথায় জগৎ ভরে গেল! এফিনিটি একটা কেন? এফিনিটি হাজারটা। একটা এফিনিটির খাতিরে আর সমস্ত এফিনিটিকে বরখাস্ত করে বসে থাক্‌তে হবে প্রকৃতির সঙ্গে এমন লেখাপড়া নেই। আমার জীবনে অনেক এফিনিটি পেয়েছি—তাতে করে আরো একটি পাবার পথ বন্ধ হয়নি। সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি—সেও আমার এফিনিটি দেখতে পেয়েচে। তার পরে? তার পরে আমি যদি জয় করতে না পারি তাহলে আমি কাপুরুষ!

৭

বিমলার আত্মকথা

আমার লজ্জা যে কোথায় গিয়েছিল তাই ভাবি। নিজেকে দেখবার আমি একটুও সময় পাইনি—আমার দিনগুলো রাতগুলো আমাকে নিয়ে একেবারে ঘূর্ণার মত ঘুরছিল। তাই সেদিন লজ্জা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার একটুও ফাঁক পায়নি।

একদিন আমার সামনেই আমার মেজ জা হাস্‌তে হাস্‌তে আমার স্বামীকে বল্লেন, ভাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ বাড়ীতে এতদিন বরাবর মেয়েরাই কেঁদে এসেচে এইবার পুরুষদের পালা এল, এখন থেকে আমরাই কাঁদাব। কি বল ভাই ছোটরাণী? রণবেশ ত পরেচ, রণরঙ্গিনী, এবার পুরুষের বুকে কসে হানো শেল।

এই বলে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তিনি একবার তাঁর চোখ বুলিয়ে নিলেন। আমার সাজে সজ্জায় ভাবে গতিকে ভিতরের দিক থেকে একটা কেমন রঙের ছটা ফুটে উঠছিল তার লেশ-মাত্র মেজ জায়ের চোখ এড়াতে পারেনি। আজ আমার একথা লিখতে লজ্জা হচ্চে কিন্তু সেদিন আমার কিছুই লজ্জা ছিল না। কেননা সেদিন আমার সমস্ত প্রকৃতি আপনার ভিতর থেকে কাজ করছিল, কিছুই বুঝে সুঝে করিনি।

আমি জানি সেদিন আমি একটু বিশেষ সাজগোজ করতুম। কিন্তু সে যেন অন্যমনে। আমার কোন্ সাজ সন্দীপবাবুর বিশেষ ভাল লাগত তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতুম। তা ছাড়া আন্দাজে বোঝবার দরকার ছিল না। সন্দীপবাবু সকলের সামনেই তার আলোচনা করতেন। তিনি আমার সাম্‌নে আমার স্বামীকে একদিন বল্লেন, নিখিল, যেদিন আমাদের মক্ষিরাণীকে আমি প্রথম দেখলুম সেই জরীর পাড়-দেওয়া কাপড় পরে চুপ করে বসে, চোখ দুটো যেন পথ-হারানো তারার মত অসীমের দিকে তাকিয়ে—যেন কিসের সন্ধানে কার অপেক্ষায় অতলস্পর্শ অন্ধকারের তীরে হাজার হাজার বৎসর ধরে এই রকম করে তাকিয়ে,—তখন আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল—মনে হল ওঁর অন্তরের অগ্নিশিখা যেন

বাইরে কাপড়ের পাড়ে পাড়ে ওঁকে জড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে। এই আগুনই ত চাই—এই প্রত্যক্ষ আগুন। মক্ষিরাণী, আমার এই একটি অনুরোধ রাখবেন, আরেকদিন তেমনি অগ্নিশিখা সেজে আমাদের দেখা দেবেন।

এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটি ছোট নদী—তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা—কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে এল—আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগ্‌ল; আমি আপনার রক্তের ভিতরকার সেই ধ্বনির ঠিক অর্থটা ত কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে আমি কোথায় গেল? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল? সন্দীপ বাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্য্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মত জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য্য সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার মত আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে।

আমাকে কি বিধাতা আজ একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করলেন? তাঁর এতদিনকার অনাদরের শোধ দিয়ে দিলেন? যে সুন্দরী ছিল না সে সুন্দরী হয়ে উঠল। যে ছিল সামান্য সে নিজের মধ্যে সমস্ত বাংলা দেশের গৌরবকে প্রত্যক্ষ অনুভব করলে। সন্দীপবাবু ত কেবল একটি মাত্র মানুষ নন—তিনি যে একলাই দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্তধারার মোহানার মত। তাই,

তিনি যখন আমাকে বল্লেন, মৌচাকের মক্ষিরাণী, তখন সেদিনকার সমস্ত দেশ-সেবকদের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে আমার অভিষেক হয়ে গেল। এর পরে আমাদের ঘরের কোণে আমার বড় জায়ের নিঃশব্দ অবজ্ঞা আর আমার মেজ জায়ের সশব্দ পরিহাস আমাকে স্পর্শ করতেই পারলে না। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।

সন্দীপবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন আমাকে যেন সমস্ত দেশের ভারি দরকার। সেদিন সে কথা আমার বিশ্বাস করতে বাধেনি। আমি পারি, সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্য-শক্তি এসেচে—সে এমন একটা কিছু, যাকে ইতিপূর্ব্বে আমি অনুভব করিনি, যা আমার অতীত। আমার অন্তরের মধ্যে এই যে একটা বিপুল আবেগ হঠাৎ এল, এ জিনিষটা কি সে নিয়ে আমার মনে কোন দ্বিধা ওঠবার সময় ছিল না;—এ যেন আমারই, অথচ এ যেন আমার নয়, এ যেন আমার বাইরেকার, এ যেন সমস্ত দেশের। এ যেন বানের জল, এর জন্যে কোনো খিড়কির পুকুরের জবাবদিহি নেই।

সন্দীপবাবু দেশের সম্বন্ধে প্রত্যেক ছোট বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতেন। প্রথমটা আমার ভারি সঙ্কোচ বোধ হত কিন্তু সেটা অল্প দিনেই কেটে গেল। আমি যা বলতুম তাতেই সন্দীপবাবু আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন। তিনি কেবলি বলতেন, আমরা পুরুষরা কেবলমাত্র ভাবতেই পারি, কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের আর ভাবতে হয় না। মেয়েদেরই বিধাতা মানস থেকে সৃষ্টি করেচেন আর পুরুষদের তিনি হাতে করে হাতুড়ি পিটিয়ে

গড়েচেন। শুন্‌তে শুন্‌তে আমার বিশ্বাস হয়েছিল আমার মধ্যে সহজ বুদ্ধি সহজ শক্তি এতই সহজ যে আমি নিজেই এতদিন তাকে দেখতে পাইনি।

দেশের চারিদিক থেকে নানা কথা নিয়ে সন্দীপবাবুর কাছে চিঠি আস্‌ত, সে সমস্তই আমি পড়তুম, এবং আমার মত না নিয়ে তার কোনোটার জবাব যেত না। মাঝে মাঝে এক একদিন সন্দীপ বাবু আমার সঙ্গে মতে মিল্‌তেন না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতুম না। কিন্তু তার দুদিন পরেই সকালে যেন ঘুম থেকে উঠেই তিনি একটা আলো দেখতে পেতেন এবং তখনি আমাকে ডাকিয়ে এনে বল্‌তেন, দেখুন সেদিন আপনি যা বলেছিলেন সেটাই সত্য, আমার সমস্ত তর্ক ভুল।—এক একদিন বল্‌তেন, আপনার যে পরামর্শটি নিইনি সেইটেতেই আমি ঠকেচি। আচ্ছা এর রহস্যটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে, সেদিন সমস্ত দেশে যা কিছু কাজ চল্‌ছিল তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।

আমাদের এই সমস্ত পরামর্শের মধ্যে আমার স্বামীর কোনো স্থান ছিল না। দাদা যেমন আপনার নাবালক ভাইটিকে খুবই ভালোবাসে অথচ কাজে কর্ম্মে তার বুদ্ধির উপর কোনো ভরসা রাখে না সন্দীপবাবু আমার স্বামীর সম্বন্ধে সেই রকম ভাবটা প্রকাশ করতেন। আমার স্বামী যে এ সব বিষয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মত, তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা একেবারে উল্টো রকম,

এ কথা সন্দীপবাবু যেন খুব গভীর স্নেহের সঙ্গে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌তেন। আমার স্বামীর এই সমস্ত অদ্ভুত মত ও বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের মধ্যে এমন একটি মজার রস আছে যেন সেই জন্যেই সন্দীপবাবু তাঁকে আরো বেশি করে ভালবাস্‌তেন। তাই তিনি নিরতিশয় স্নেহের সঙ্গেই আমার স্বামীকে দেশের সমস্ত দায় থেকে একেবারে রেহাই দিয়েছিলেন।

প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করবার অনেক ওষুধ আছে। যখন কোনো একটা গভীর সম্বন্ধের নাড়ী কাটা পড়তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জোগান ঘটে তা কেউ জান্‌তে পারে না—অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চল্‌ছিল, তখন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে আমি টেরই পেলুম না কত বড় নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘট্‌চে। এই বুঝি মেয়েদেরি স্বভাব—তাদের হৃদয়াবেগ যখন একদিকে প্রবল হয়ে জেগে উঠে তখন অন্যদিকে তাদের আর কিছুই সাড় থাকে না। এই জন্যেই আমরা প্রলয়ঙ্করী; আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়। আমরা নদীর মত, কূলের মধ্যে দিয়ে যখন বয়ে যাই তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেদনা

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,
নিয়ো হে নিয়ো !
হৃদয় বিদারি' হয়ে গেছে ঢালা,
পিয়ো হে পিয়ো !
তোমারি লাগিয়া এরে বুকে করে'
বহিয়া বেড়ানু সারারাতি ধরে',
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয় !

রোদনের রঙে লহরে লহরে
রঙীন্ হোলো।
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো গো তোলো !
মিশাক্ এ রসে তব নিশ্বাস
নবপ্রভাতের কুসুমের বাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো।

১৩ই পৌষ ১৩২১
শান্তিনিকেতন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যৌবনের পত্র

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কি কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস ;
নাই লজ্জা, নাই ত্রাস,
আকাশে ছড়ায় উচ্চহাস
চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
শিশির-মন্থর ।

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কি মনে করে'
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সঙ্গীতের ইঙ্গিতের সাথে ।

লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার ।
গলে মোর মন্দারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা ।

বিরহী তোমার লাগি
আছি জাগি
দক্ষিণ বাতাসে
ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আছি জাগি চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাসিতে
কত মধু মধ্যাহ্নের বাঁশিতে বাঁশিতে।”—

লিখেছে সে—
এস এস চলে এস বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এস পার।
ফেলে এস ক্লান্ত পুষ্পাহার।
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার ;
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।

২৩ পৌষ ১৩২১ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরুল।

সুরো

১

"হ্যাঁরে, বোদে, এখনো যে বড় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস্—আপিস যেতে হবে না ?"

"হবে না মনে করেই একটু গড়াচ্ছি।"

"গড়াচ্ছি ! বল্‌তে লজ্জা করে না ! আমি বু—আমি এই বয়—আমি—আমি তোর দাদা হয়ে কখনো এত বেলা অবধি গড়াই দেখেছিস ?"

"তোমার যে দাদা দিন দিন বয়স কম্‌ছে আর আমার বাড়ছে কাজেই তুমি এখন যত ভোরে উঠতে পার আমি কি তা পারি ? তাছাড়া আজ শরীর তেমন ভাল নেই, কেমন গা মাটি মাটি করছে।"

"গা মাটি মাটি কর্‌ছে ! আমার যেদিন গা মাটি মাটি করে আমি কি বেরোই না ?"

"তোমার বেরলেই বা কষ্ট কি ? উকীলগুলো বকে মরে তুমি বসে ঝিমোও ; তার পরে যা খুসী একটা রায় দিয়ে বিচারের শ্রাদ্ধ কর।"

"যাঃ, আর বাঁদরামী করতে হবে না ; কাজটা যদি হাতছাড়া হয়, আমি ঘরে বসিয়ে তোমার পেট ভরাতে পারব না। যা দিন কাল পড়েছে সংসার চালানো ভার, এত যে উপায় করছি কোথায় ধূলোর মত উড়ে যাচ্ছে চোখেও দেখতে পাই না।"

"বাস্তবিক ! তার উপর আবার এই লড়ায়ের হাঙ্গামে এসেন্স,

সাবান, পাউডার, কলপ প্রভৃতি বিলাতী সৌখীন জিনিষগুলোর এমন অসম্ভব দাম চড়ে গেছে, আমি ত ভেবেই পাই না দাদা কি করে নিত্যি নতুন জোগাড় করছ!”

“কি বল্লি রে ছোঁড়া! কলপ? কলপ? কবে তুই আমাকে কলপ লাগাতে দেখেছিস্? যত বড় না মুখ তত বড় কথা! ওরে জগুয়া, গাঁঠ গুলোয় ভাল করে তেল ডলে দেত।”

জগু। “হাঁ বাবু, তাই ত দিচ্ছে। এই পুরুবিয়া হাওয়া লাগলে বুড্‌ঢা লোগ্‌কো বদন্‌ হাঁত সব দুখ্‌তা। সে হামি জানে।”

“নাঃ, এরা আমাকে বাড়ীছাড়া করলে দেখছি! আমার গায়ে ব্যথা হয়েছে এ কথা তোকে কে বল্লে রে ব্যাটা? আমার চিরকাল ভাল করে তেল মাখা অভ্যেস। যা, স্নানের ঘরে গরম জল রেখে আয়।”

“এই গরমে গরম জল? ওহো, বুঝেছি, সেদিন নবীন বাবু বলে গেল যে গরম জলে নাইলে গায়ের চামড়া কুঁচ্‌কে যায় না, তাই বুঝি দাদা আজকাল গরম জলে চান কর?”

“তাই বুঝি দাদা গরম জলে চান কর! বেশ করি! খুব করি! তোর তাতে কি? ভাল চাস্‌ ত খাটিয়া ছেড়ে উঠে যা! সারারাত এই ছাতে পড়ে থাকিস্ বলেই ত সকাল বেলায় গা মাটি মাটি করে।”

“এত তাড়া কিসের? তুমি যতক্ষণে চান করে বেরোবে আমার তার মধ্যে দশবার চান করা ভাত খাওয়া অবধি সারা হয়ে যাবে।”

ন মরে বাল্‌কাকা মায় ন মরে বুঢ়উকা জোয়

গিরিজাসুন্দরীর মৃত্যুতে এই প্রবাদ বচনটি খাটিয়া গেল; শিশু কন্যা কালীতারা ও প্রৌঢ় স্বামী হরপ্রসাদ দুজনেই সমভাবে তার অভাব অনুভব করিল। কালীর তিন দিদিই বিবাহিতা, তারা কেহই ছেলেপুলেভরা সংসারে তাকে স্থান দিয়া আর ঝঞ্ঝাট বাড়াইতে রাজি হইল না। তখন হরপ্রসাদ ভাবিল বোদেটার বিবাহ দিলে সব গোল চোকে, আমি টাকা চাই না, দেখতে শুনতে ভাল একটি গরীব গৃহস্থের মেয়ে আন্‌ব, সে আমাদের সবাইকে টেনে করবে। টাকা চাই না, সুন্দর মেয়ের আর অভার কি! উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পাইয়া হরপ্রসাদ কাহাকেও কিছু না বলিয়া দেখিতে গেল; বোদের আর বিবাহ হইল না— দশম বর্ষীয়া বালিকা সুরসুন্দরী কালীতারার জননীর পদ গ্রহণ করিল।

সুরো মেয়েটি বড় লক্ষ্মী; সে অকপট চিত্তে ভক্তির সহিত বাপের বয়সী স্বামীর সেবা করিত। বামুন ঠাকুর ডাক দিতে না দিতে সে পানটি ছেঁচিয়া গম্ভীর ভাবে সাম্‌নে বসিয়া পাকা গিন্নিটির মত এটা খাও, ওটা খেলে না কেন, আজ বুঝি রান্না ভাল হয় নাই, ঝালের মাছটায় কাঁচা হলুদের গন্ধ বেরোচ্ছে ইত্যাদি নানা-প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ব্যঞ্জনের বাটিগুলি হাতের কাছে সরাইয়া দিত। অপরাহ্নে ফল ছাড়াইয়া, বেদানার রস ছাঁকিয়া, মিষ্টান্ন সাজাইয়া ভৃত্যের হাতে স্বামীর জলযোগের জন্য পাঠাইয়া দিত। আদালত-ফেরৎ হরপ্রসাদের ঘর্ম্মাক্ত কাপড়গুলি বাতাসে দিয়া কাচা কাপড়, মুখ ধুইবার জল হাতে হাতে জোগাইয়া

দিত আর সন্ধ্যাবেলায় কালীর সহিত বাজি রাখিয়া পাকা চুল তুলিত। বোতাম বসাইতে অল্পস্বল্প মেরামতের কাজে সুরো কদাচ আলস্য করিত না। তার ছোট বুদ্ধিটিতে যা ভাল বুঝিত খুসি মনে পালন করিত। পশ্চিমী বাঙালীর মেয়ে লজ্জা সরমের বড় ধার ধারিত না; স্বামীকে দেখিলে বারো আনা পিঠ খুলিয়া ষোল আনা মুখ ঢাকিবার জন্য ঘোমটা টানা কর্ত্তব্য, সুরো সে শিক্ষা পায় নাই। শিশু বয়সেই তার বাপ মা মরিয়াছে; বড় ভাইয়ের ঘরে সর্ব্বদা পরিজনহিতরতা, অক্লান্তকর্ম্মিণী, মিষ্টভাষিনী ভাইবউকেই সে আদর্শ বলিয়া জানিত এবং যতদূর সম্ভব তাহার উপদেশ মত চলিতে চেষ্টা করিত।

সুরোর যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হরপ্রসাদেরও এক অদ্ভুত যৌবনশ্রী ফুটিয়া উঠিল; তার কাঁচাপাকা চুলগুলি প্রথমে কটা ক্রমে একেবারে কালো হইয়া গেল; সে দাড়ি গোঁফ ফেলিয়া দিল এবং রাত থাকিতে উঠিয়া রোজ ক্ষৌর করিতে লাগিল; তার টোল-খাওয়া গাল দুটি দাঁতের চাড়া পাইয়া সামলাইয়া উঠিল আর তার বেশভূষার পারিপাট্য দেখিয়া বোদে হাসিয়া অস্থির হইল। সুরোকে আর পান ছেঁচিতে হয় না, দাঁতের ব্যথা সেরে গেছে আমার লক্ষ্মীকে আর কষ্ট করে পান ছেঁচতে হবে না বলিয়া হরপ্রসাদ সুরোর চিবুক ধরিয়া আদর করিত। কালী বা সুরোকে মাথায় হাত দিতে দেয় না, বলে, যেদিন মাথা ধরবে টিপে দিও, শুধু শুধু হাতে তেল লাগিয়ে লাভ নেই। ছাতের এক কোণে টিনে ঘেরা নূতন তৈরি স্নানের ঘরে হরপ্রসাদ কয়খানা সাবান নিঃশেষ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইত সে রহস্য ভেদ করিতে কাহারো

সাহসে কুলায় নাই—বোদেরও না। পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হইলে সে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ করে, তাহারাও হঠাৎ হরপ্রসাদকে চিনিতে পারে না, এবং বুড়ো বয়সে নাৎনীর যোগ্য মেয়েকে বিবাহ করিলে ভীমরতি কি ভীম আকার ধারণ করে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হরপ্রসাদের দিকে দেখাইয়া দেয়। একমাত্র নব্য উকীল মহলে ডেপুটি হরপ্রসাদের খাতির ধরে না—নলিন চৌধুরীর কাঁধে হাত দিয়া সেই ছোক্‌রার দলে পরিবেষ্টিত হইয়া সে বুঝিতেই পারে না লোকে তাকে দেখিয়া হাসে কেন?

২

ছুটির দিনটা পূর্ণ মাত্রায় রসালাপে যাপন করিবার পাছে কোন ব্যাঘাত ঘটে সেই জন্য হরপ্রসাদ নিজের গ্রামসম্পর্কীয়া এক মাসীর খোঁজ লইতে বোদের সহিত কালীকে প্রত্যেক রবিবারে পাঠাইয়া দিত। দুই এক রবিবার পার হইলে ব্যাপার বুঝিতে বোদের বাকি রহিল না; দাদার উপর তুষ্ট থাকিলে একেবারে সন্ধ্যা কাবার করিয়া ফিরিত আবার কখনো তফাতে গাড়ী রাখিয়া আচম্‌কা আসিয়া একতরফা প্রেমালাপে বাধা দিয়া দাদার অভিশাপ অর্জ্জন করিত।

সুরো ভাঁড়ার ঘরে তোলা উনানে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত, এমন সময় মস্ত একগাছা বেলফুলের গোড়ে মালা লইয়া হরপ্রসাদ ডাকিল, "সুরো, ও সুরো, দেখ তোমার জন্যে কি এনেছি।"

সুরো। "কি গা?"

হর। "'কি গা'! আহা, প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিলে! সেদিন না বল্লুম যে নলিনের বউ 'ভাই' বলে সাড়া দেয়?"

সুরো। "সে দেয় দিগ্‌গে। কি এনেছ দেখি! ওঃ, ফুলের মালা! একটু জল আছড়া দিয়ে রেখে দাও না কাল অবধি গন্ধ থাকবে।"

হর। "আচ্ছা, সুরো, তোমায় না মানা করেছি গরমে উনুন-তাতে বসে কিছু কোরো না, তোমার কষ্ট হয় মনে করলে ওসব আমার মুখে রোচে না, তার চেয়ে আমি বেশী খুসী হই যদি তুমি এখন ওসব ফেলে সেদিনকার সেই ঢাকাই কাপড়খানি পরে দেখাও; কিনে দিলুম তা একবার পরলেও না। এত অছেদ্দা কর কেন?"

সুরো। "কি মুস্কিল! ছিঁড়ে যাবে বলে ঘরে পরি না, তার জন্যে এত রাগ? তুমি যাও না আমি এইগুলো সেরে নিয়ে এই এলুম বলে।"

হর। "এলুম, এলুম, কর্ত্তে কর্ত্তে বোদেরাও এসে পড়বে।"

সুরো। "তা আসুক না, বেশ ত।"

হর। "অত তর্ক না করে ওঠই না। এই জগু! জগুয়া রে! এদিকে আয়! শীগ্‌গির বামনাকে ডেকে দে, তাকে কি করতে রাখা হয়েছে যে মা-জীকে গরমে খাবার তৈরি করতে হবে! যা, চট্ করে আস্‌তে বল।"

চাকরদের সম্মুখে স্বামীর অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ হইবার ভয়ে সুরো তাড়াতাড়ি পাচককে নিজের স্থান ছাড়িয়া দিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত সে মনে মনে অনুভব করিতেছে যে হরপ্রসাদ

বেতনভোগী ভৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া বন্ধুবান্ধব সকলকার কাছেই নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতেছে, আর সে কাহার জন্য? তারই জন্যই ত এই বৃদ্ধটি যুবকের বেশে সময় নাই অসময় নাই লোক-আনাগোনার রাস্তায়, যেখানে-সেখানে তার হাত চাপিয়া ধরে, মাথার কাপড় টানিয়া খুলিয়া দেয়, গায়ে এসেন্স ঢালিয়া দেয়—এই সেদিন ঠাকুরপো দেখিতে পাইয়া তবে না সকালে অত ঠাট্টা করিল! কি করিয়া বুঝাইবে যে সে পুরাতন স্বামীর সেবা করিয়া যত তৃপ্ত হইত এই নূতন স্বামীর সেবা তার মনে তেমন প্রীতি সঞ্চার করে না! হরপ্রসাদের কথাবার্ত্তা, আদর, ভালবাসা সবই তার মনে হয় যেন কার কাছে ধার করা, এ সব ছিব্‌লামী তার স্বামীর যোগ্য নয় এ কথা কে তাঁকে বলিবে? তার রূপের, তার নবপ্রস্ফুট যৌবনের অর্ঘ্য লইয়া সে তাঁকে দেবতা জানিয়া পূজা দেয় তবে কেন তিনি নিজেকে পরের কথা শুনিয়া তাহার চোখে খাটো করিতে চেষ্টা করিতেছেন? সে পরটি যে কে তাহাও সুরো বেশ জানিত ও বড় রাগ হইলে তার মুণ্ডপাত করিত—অবশ্য মনে মনে।

কত কথাই আজ বলিতে হইবে স্থির করিয়া সুরো আস্তে আস্তে হরপ্রসাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে এক গাল হাসিয়া, মালা ছড়াটি তার গলায় পরাইয়া হাত ধরিয়া যখন কাছে টানিয়া লইল, সুরো মাথা হেঁট করিয়া অঞ্চলের প্রান্ত খুঁটিতে লাগিল, যা বলিতে আসিল কিছুই বলিতে পারিল না।

হর। “সুরো, প্রাণ আমার, তুমি ফুল ভালবাস বলে আমি

কত দূর থেকে নিজে গিয়ে ফুলের মালাটি আনলুম আর তুমি আমাকে তার বদলে কিছু দিলে না ভাই?"

সুরো। "কি চাও? পাখার বাতাস দেব? গরম হচ্ছে?"

হর। "আঃ! ঐ এক কথাতে সব মাটি করে দিলে! এত করে মনে মনে সব জপ্‌তে জপ্‌তে এলুম সব ভণ্ডুল হয়ে গেল! পাখার বাতাস কি আমি চেয়ে ছিলুম? নলিনের বউ বলে, 'প্রাণনাথ'—"

সুরো। "সে যা খুসী বলুক, ও সব আমার ভাল লাগে না।"

হর। "কেন তোমার ভাল লাগে না ভাই? আমার ত বেশ লাগে। কি বলছিলুম, ঐ নলিনের বউ বলে, 'প্রাণনাথ! হৃদয়েশ্বর!'—"

সুরো। "দেখ, কাল থেকে তুমি আর নলিনের বাড়ী যেও না, সত্যি সত্যি যদি ওর বউ ও সব ছাইভস্ম বল্‌ত তাহলে কি ও তোমার সামনে সে কথা বল্‌তে পার্‌ত? তোমাকে নিয়ে তামাসা করে বোঝ না? নাও, ছাড় কে এসে পড়্‌বে!"

হর। "আসে আসুক! ভাল কথা। কি ছিলুম, হ্যাঁ, তুমি নলিনের উপর এত চট কেন? সে তোমার কত খবর নেয়, সেইত বলে দিলে ফুলের মালা নিয়ে এসে তোমায় পরিতে দিতে; সেদিনকার কাপড় খানা সেই ত পসন্দ করে কেনালে; তাকে দিয়েই ত তোমার তেল, এসেন্স আতর সব আনাই; আমাকে দেখ না, যেদিন থেকে ওর সঙ্গে মিশ্‌ছি আমার যেন ২০ বছর—এই বলছিলুম যে আমার—আমার—বুঝলে কি না—বড় ভাল ছেলে ও। সুরো, আমার আঁধার ঘরের আলো—"

সুরো। "ও কথাটাও কি নলিন তার বৌকে বলে?"

হর। "অ্যাঁ! অ্যাঁ! তার বৌকে? কে বল্লে তোমাকে?"

সুরো। "যেই বলুক না কেন, অন্যের কাছে শেখা বুলি আমার উপর ঝেড়ে আর আমাকে লজ্জা দিও না।"

হর। "ছি সুরো! ভাব করতে গেলুম কেঁদে ফেল্লি! আচ্ছা, ওটা আর বল্‌ব না—হল? লক্ষ্মী সোনা আমার—মাইরি বলছি ভাই এ কথাটা কেউ শিখিয়ে দেয় নি—অত দূরে সরে যেয়ো না, আমি কি বাঘ না শোর যে তোমাকে খেয়ে ফেল্‌ব!"

সুরো। "হ্যাঁ গা, সেদিন যে বল্লে যে এবার ছুটিতে গয়া কাশী দেখিয়ে আন্‌বে তার কি হল?"

হর। "বাপ্‌রে! ঐ চাঁদমুখ কি আমি দেশ বিদেশে নিয়ে ঘুরতে পারি তাহলে দ্বিতীয় সীতা হরণ হয়ে যাবে।"

সুরো। "কেন, তুমিও দশানন বধ করে সীতাকে ফিরিয়ে আনবে!"

হর। "আর কি ভাই, সেদিন—ওর নাম কি—আর কি সে জোর—কি বলছিলুম ভাল—আর কি সে যুগ আছে, এখন ঘোর কলি! বধ করতে গেলেই নিজেও সঙ্গে সঙ্গে বধ হতে হয়। অত ব্যস্ত কেন? নাতী পুতী হোক্ তারা তীর্থ ধর্ম্ম করাবে।"

সুরো। "বেশ। ঐ বুঝি ঠাকুরপোরা এল! যাই কালীকে খেতে দিগে, অনেক দেরী হল।"

হর। "আঃ! বসই না, যাবে এখন, আমার কাছ থেকে পালাতে পারলেই বাঁচ। আঃ জ্বালালে দেখ্‌ছি! বোদেটা উপরে আস্‌ছে বুঝি!"

গলার মালা খুলিয়া সুরো সরিয়া বসিতেই বোদে দরজার কাছে হাঁকিল, "দাদা!"

হর। "দাদা! কি বল্ না ছাই!"

বোদে। "মেজাজ এত গরম কেন? আচ্ছা দাদা, এতকাল ত আমরা কেউ জানতুমও না যে এই বিদেশে আবার এক মাসী আছে, তুমি হঠাৎ কোত্থেকে খবর পেলে? এক কাজ কর না, আমরাই বা গাড়ী ভাড়া করে অতদূর যাই কেন তার চেয়ে মাসীকে কাছে রাখলেই ত তুমি সব সময় তাঁর তত্ত্বাবধান করতে পার। সেই হলেই বেশ হয়, বৌদি কি বল?"

হর। "বৌদি কি বল! কিসে বেশ হয় আমাকে আর শেখাতে হবে না। যা, কালীকে বল খাবারের জায়গা করতে, ক্ষিদে পেয়েছে।"

বোদে। "মালাটা আমি নিয়ে চল্লুম।"

হর। "প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিলে!"

৩

কালীতারার বিবাহ হইয়া সে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। কলিকাতার বাইরে একখানি বাড়ী কিনিয়া পেন্সনপ্রাপ্ত হরপ্রসাদ সপরিবারে থাকে। এইবার স্ত্রীর নেশা ছুটিয়া তাকে বাড়ীর নেশায় ধরিয়াছে; ঘরে ঘরে পাথর বসাইতে হইবে, দক্ষিণের বারাণ্ডাটা বাড়াইতে হইবে, জানালাগুলো বড় করা দরকার, কোথায় সস্তাদরে মার্ব্বেল, কাট কাঠরা বিক্রয় হইতেছে স্নান নাই আহার নাই রৌদ্রের তাপে সে সারা সহর হাঁটকাইয়া বেড়ায়। এখন সে বেশ দস্তুর-মত বৃদ্ধ—নলিন তার ঘাড় হইতে নামিতেই সেও অন্নে অন্নে

নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া জাহির করিতে আপত্তি করিল না এমন কি আবশ্যক সময় ভিন্ন দাঁত জোড়াটির পর্য্যন্ত খবর লয় না।

এই পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধ স্বামীটিকে পাইয়া এতদিনে সুরো প্রাণ খুলিয়া স্নেহ প্রস্রবণ ঢালিয়া দিতে পারিল। সন্তানহীনার সমস্ত পুঞ্জীভূত সন্তানস্নেহ অপরিমিত ধারায় হরপ্রসাদের উপর পতিত হইল। সে এক দণ্ড স্বামীকে চোখের আড়াল করিতে চায় না। কোনো কাজে কোন দিন বাড়ী ফিরিতে দেরি হইলে সে বোদেকে মোড়ের কাছে দাঁড় করাইয়া একবার ঘর একবার বারাণ্ডায় ছটফট্ করিয়া বেড়ায়, যতই বোদে সান্ত্বনা দেয় যে দাদাকে ছেলেধরায় ধরে নাই নিশ্চয়ই, সে আশ্বাসবাক্য সুরো কানেও তোলে না। হরপ্রসাদের আর বেশভূষায় দৃষ্টি নাই কিন্তু সুরো ছাড়ে না, তাঁতিনী ডাকাইয়া নিজে সুন্দর সুন্দর পাড়ের কাপড় বাছিয়া রাখে; শীতকালের উপযুক্ত নানারঙের পশমের টুপি, মোজা, গেঞ্জি, গলাবন্ধ বুনিয়া রাখে ও সেগুলি পরাইয়া স্বামীকে কেমন মানাইয়াছে, বারম্বার কোন না কোন ছুতা করিয়া বাইরে গিয়া দেখিয়া আসিত। ছোট বৌ ঠাট্টা করে যে দিদি বড়-ঠাকুরের টাকের বাকি দুগাছি চুল আঁচড়ানোর চোটে আর টিঁকিতে দিবে না। নিদ্রিত স্বামীর গায়ে হাত দিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তার সমস্ত দেহ পুলকিত হইত। অযাচিতভাবে দিনের মধ্যে যখন-তখন হরপ্রসাদের পাশে দাঁড়াইয়া গায়ে হাত বুলাইতে থাকে, নয় তো মাথার কোন চুলটি স্থানচ্যুত হইয়াছে সেটি ঠিক করিয়া দেয়, কোঁচা পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া যাইবে বলিয়া তুলিয়া ধরিতে বলে। বোদে স্ত্রীকে বলে যে, দাদা আগে বৌদির পায়ের

ধূলো নিত কিনা তাই বৌদি এখন মাথায় হাত দিয়ে দাদাকে আশীর্ব্বাদ করে। যে যাই বলে সুরো গ্রাহ্য করে না, সে তার বৃদ্ধ স্বামীটিকে শিশুর মত চোখে চোখে রাখে। খাওয়ায়, পরায়, কখনো আবার অবাধ্যতা করিলে মৃদু ভর্ৎসনাও করে। একদিন হরপ্রসাদ যুবক সাজিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া স্ত্রীকে আঘাত করিয়াছিল। আজ সেই স্ত্রী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত ব্যবহার করিয়া তাকে আরো কত হাস্যভাজন করিয়া তুলিতেছে এ কথা সুরোর সম্মুখে কেহ আঁচেও বলিলে সে মহা খাপ্পা হইয়া উঠিত।

হরপ্রসাদও যে মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ না করিত তা নয়। স্ত্রী যে কাজ করিতে বারণ করিত বিশেষ করিয়া সেইটেই করিয়া সে আপনার পৌরুষাভিমান প্রচার করিত। সুরো কি তাকে কচি খোকা পাইয়াছে! সব কথায় কি তাকে স্ত্রীর অনুমতি লইতে হইবে! সময় সময় সুরোরও চেতনা হইত, ভাবিত, একি করিতেছি, আমি স্বামীর অধীনে থাকিব তা না তাঁকে নিজের অধীনে আনিতে চাই, আবার ভাবে, কই না, অধীনে ত আনিতে চাই না, আমি কি চাই তা ত নিজেই বুঝিতে পারি না। বোধ হয় কিছুই চাই না, শুধু নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়া, দুই হাতে তাঁর আশীর্ব্বাদ ভরিয়া লইয়া, জন্ম জন্ম তাঁকে পতিরূপে পাইবার জন্য ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করিতে চাই।

দেখিতে দেখিতে কয়েক বছর কাটিল। এ বছরে বসন্তের মহামারী পাড়ায় পাড়ায় দেখা দিয়াছে। হরপ্রসাদের মনে বসন্তের এমনি ভয় ঢুকিল যে গায়ে একজায়গায় মশাকামড়ের দাগ লাগিলে সাতবার করিয়া সে ডাক্তার ডাকিয়া পরীক্ষা করাইত। একদিন

রাত্রে সুরোর কপালে কি একটা দাগ দেখিয়া সমস্ত রাত আলাদা বিছানায় সে কাটাইল।

এমন সময় একদিন সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা করিয়া সুরোর জ্বর আসিল। বোদে হরপ্রসাদকে লুকাইয়া তেতালায় চিলের ছাদের ঘরে সুরোর জন্যে জায়গা করিয়া দিল। সেখানে তার সর্বাঙ্গ ভরিয়া বসন্ত দেখা দিল। বোদে হরপ্রসাদকে বলিল, পটলডাঙ্গায় তার বিধবা বোনটির বড় অসুখ, বৌদিদি তাঁকে দেখতে গিয়েচেন, কিছুদিন দেরি হবে।

হরপ্রসাদের এমনি অবস্থা স্ত্রী নহিলে সে এক পা নড়িতে পারে না। যতই সুরো সুরো করিয়া সে ব্যস্ত হয়, খাবার সাম্‌নে লইয়া সুরোর অনুপস্থিতিতে যতই খুঁৎখুঁৎ করে, কই ছুটিয়া কেহ ত আসে না। হৃদয়ের ভিতরটা অসুখ ও বিরক্তিতে ভরিয়া ভরিয়া উঠে। হরপ্রসাদ একবার পটলডাঙ্গায় গিয়া তার স্ত্রীর খোঁজ লইবে মনে করিল কিন্তু সে পাড়ায় বসন্তের প্রকোপ বেশি শুনিয়া সাহস হইল না।

এদিকে বোদে পুরাতন ভৃত্য জগুয়ার উপর দাদার ভার দিয়া বৌদিদির সেবায় নিযুক্ত হইল। না ছিল তার ভয়, না ছিল ঘৃণা। আহার নিদ্রা ছাড়িয়া সুরোর বিছানার পাশে বসিয়া কি করিয়া তার একটু যন্ত্রণার উপশম হইবে তারই উপায় বাহির করিত। সুরো বোদেকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু বোদে শুনিল না বলিয়াই সুরো প্রাণে বাঁচিল। অমন প্রাণের সঙ্গে শুশ্রূষা করিবার লোক তার আর কেহ ছিল না।

সুরো ত বাঁচিল কিন্তু তার দিকে চাহিয়া বোদের চোখে

জল আসিল। আহা অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা, তার এ কি পরিবর্ত্তন! দেখিলে যেন চেনা যায় না। সুরোও প্রথম দিন আপন চেহারা দেখিয়া মৃত্যুই শ্রেয় ভাবিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল মরণ হইলে তার স্বামীর দশা কি হইবে! আহা না জানি এতদিন তিনি কত কষ্টই পাইয়াছেন! আজ একবার ঠাকুরপোকে বলিব তাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিতে। একবার দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করি!

বোদে হরপ্রসাদকে ডাকিল, দাদা, চল, তোমাকে বৌদিদির কাছে নিয়ে যাই।

হর। কোথায়?

বোদে। উপরের ঘরে আছেন।

হর। না, যাব না।

বোদে। সে কি কথা, যাবেনা কেন?

হর। আমি যাব কেন? সে কি আস্‌তে পারে না?

বোদে। তাঁর বড় অসুখ করেছিল, এখনো কাহিল আছেন।

হর। মিছে কথা। একদিনের জন্যে তার ত অসুখ করতে শুনিনি।

বোদে। তোমার গা ছুঁয়ে বলচি, তাঁর অসুখ করেছিল, তুমি ভাব্‌বে বলে বলিনি।

হর। যা, যা, আর মিছে বল্‌তে হবে না। আমি কি আর বুঝিনে! ইদানীং তার কি আর কাজে মন ছিল? খাওয়াতেও আস্‌ত না, তেল মাখিয়েও দিত না,—জগুর হাতে পড়ে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে তবু তার মনে একটু ব্যথা লাগে না। আমি ওর সঙ্গে আর কথা বল্‌ব না।

এই ক'দিন যে কাজের অনিয়ম হইয়াছিল হরপ্রসাদের পীড়িত কল্পনায় তাহা সুদীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল যেন নমাস ছমাস ধরিয়াই এই রকম ব্যাপারটা ঘটিতেছে।

বোদে যত অনুনয় করে হরপ্রসাদের গোঁ ততই বাড়িতে থাকে। বোদে বৌদিদিকে আসিয়া বলিল, দাদা রাগ করিয়া আছেন।

বারান্দায় বসিয়া হরপ্রসাদ অপ্রসন্ন মনে তামাক খাইতেছিল। এমন সময় সাম্‌নের রাস্তা দিয়া হরিবোল শব্দে মড়া লইয়া গেল। কাল রাত্রি হইতে পাড়ায় ঘোষেদের বাড়ি হইতে কান্নার রব উঠিয়াছে। সকাল হইতে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়াছিল আবার জাগিয়া উঠিল। হরপ্রসাদের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

এমন সময় শীর্ণ মলিন সুরো ধীরে ধীরে পাশে আসিয়া তার কাঁধের উপর হাত রাখিল।

হরপ্রসাদ চমকিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। এ কে? এ যে ব্যাধি মূর্ত্তিমতী। এ যে মৃত্যুর দূতী! বোদে, বোদে! আমার ঘরে এ কে ঢুক্‌ল রে? সরে যা! সরে যা! সুরো! সুরো! আমার সুরো কোথায় গেল?

শ্রীমাধুরীলতা দেবী

ছবির অঙ্গ

এক বলিলেন বহু হইব, এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল—আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এই কথা বলে।

একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই, বহুর পরিচয়, যেখানে ভেদ ; এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল।

জগতে রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নয়, সংযম দেখি। সীমাটা অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাৎ করিয়া, আর সংযমটা অন্য সমস্তের সঙ্গে রফা করিয়া। রূপ একদিকে আপনাকে মানিতেছে, আর একদিকে অন্য সমস্তকে মানিতেছে তবেই সে টিঁকিতেছে।

তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, সূর্য্য ও চন্দ্র, দ্যুলোক ও ভূলোক, একের শাসনে বিধৃত। সূর্য্য চন্দ্র দ্যুলোক ভূলোক আপন-আপন সীমায় খণ্ডিত ও বহু—কিন্তু তবু তার মধ্যে কোথায় এককে দেখিতেছি? যেখানে প্রত্যেকে আপন আপন ওজন রাখিয়া চলিতেছে ; যেখানে প্রত্যেকে সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ভেদের দ্বারা বহুর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বহুর রক্ষা। যেখানে অনেককে টিঁকিতে হইবে সেখানে প্রত্যেককে আপন পরিমাণটি রাখিয়া আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়। জগৎ-সৃষ্টিতে সমস্ত রূপের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে পরিমাণের যে সংযম সেই সংযমই মঙ্গল, সেই সংযমই সুন্দর। শিব যে যতী।

আমরা যখন সৈন্যদলকে চলিতে দেখি তখন একদিকে দেখি

প্রত্যেকে আপন সীমার দ্বারা স্বতন্ত্র, আর-একদিকে দেখি প্রত্যেকে একটি নির্দ্দিষ্ট মাপ রাখিয়া ওজন রাখিয়া চলিতেছে। সেইখানেই সেই পরিমাণের সুষমার ভিতর দিয়া জানি ইহাদের ভেদের মধ্যেও একটি এক প্রকাশ পাইতেছে। সেই এক যতই পরিস্ফুট এই সৈন্যদল ততই সত্য। বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করিয়া পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ও অবশেষে পরস্পরকে পায়ের তলায় দলাদলি করিয়া চলে তখন বহুকেই দেখি, এককে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই দেখি ভূমাকে দেখি না—অথচ এই ভূমার রূপই কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ।

নিছক বহু কি জ্ঞানে কি প্রেমে কি কর্ম্মে মানুষকে ক্লেশ দেয়, ক্লান্ত করে,—এই জন্য মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে—নহিলে তার মন মানে না, তার সুখ থাকে না, তার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন সৌন্দর্য্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে এককে পাইবার জন্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। তার পরে, আমাদের শিল্পশাস্ত্র চিত্রকলা-সম্বন্ধে কি বলিতেছে বুঝিয়া দেখা যাক্।

সেই শাস্ত্রে বলে, ছবির ছয় অঙ্গ। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

"রূপভেদাঃ"—ভেদ লইয়া সুরু। গোড়ায় বলিয়াছি ভেদেই

রূপের সৃষ্টি। প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়াই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ছবির আরম্ভ হইল রূপের ভেদে—একের সীমা হইতে আরের সীমার পার্থক্যে।

কিন্তু শুধু ভেদে কেবল বৈষম্যই দেখা যায়। তার সঙ্গে যদি সুষমাকে না দেখানো যায় তবে চিত্রকলা ত ভূতের কীর্ত্তন হইয়া উঠে। জগতের সৃষ্টিকার্য্যে বৈষম্য এবং সৌষম্য রূপে রূপে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে; আমাদের সৃষ্টিকার্য্যে যদি তার অন্যথা ঘটে তবে সেটা সৃষ্টিই হয় না, অনাসৃষ্টি হয়।

বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত কর তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পারের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সঙ্গীত, তখনই একের সহিত অন্যের সুনিয়ত যোগ—তখনই সমস্ত বহু তাহার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একই সঙ্গীতকে প্রকাশ করে। ধ্বনি এখানে রূপ, এবং ধ্বনির সুষমা যাহা সুর তাহাই প্রমাণ। ধ্বনির মধ্যে ভেদ, সুরের মধ্যে এক।

এইজন্য শাস্ত্রে ছবির ছয় অঙ্গের গোড়াতে যেখানে "রূপভেদ" আছে সেইখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে "প্রমাণানি" অর্থাৎ পরিমাণ জিনিষ-টাকে একেবারে যমক করিয়া সাজাইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি ভেদ নহিলে মিল হয় না এই জন্যই ভেদ, ভেদের জন্য ভেদ নহে; সীমা নহিলে সুন্দর হয় না এই জন্যই সীমা, নহিলে আপনাতেই সীমার সার্থকতা নাই, ছবিতে এই কথাটাই জানাইতে হইবে। রূপটাকে তার পরিমাণে দাঁড় করানো চাই। কেননা আপনার সত্য-মাপে যে চলিল অর্থাৎ চারিদিকের মাপের সঙ্গে যার খাপ খাইল

সেই হইল সুন্দর। প্রমাণ মানেনা যে রূপ সেই কুরূপ, তাহা সমগ্রের বিরোধী।

রূপের রাজ্যে যেমন জ্ঞানের রাজ্যেও তেমনি। প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই ত কুযুক্তি। অর্থাৎ সমস্তের মাপকাঠিতে যার মাপে কমিবেশি হইল, সমস্তের তুলাদণ্ডে যার ওজনের গরমিল হইল সেই ত মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। শুধু আপনার মধ্যেই আপনি ত কেহ সত্য হইতে পারে না, তাই যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণ করার মানে অন্যকে দিয়া একেকে মাপা। তাই দেখি, সত্য এবং সুন্দরের একই ধর্ম্ম। একদিকে তাহা রূপের বিশিষ্টতায় চারিদিক হইতে পৃথক্ ও আপনার মধ্যে বিচিত্র, আর-একদিকে তাহা প্রমাণের সুষমায় চারিদিকের সঙ্গে ও আপনার মধ্যে সামঞ্জস্যে মিলিত। তাই যারা গভীর করিয়া বুঝিয়াছে তারা বলিয়াছে সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য।

ছবির ছয় অঙ্গের গোড়ার কথা হইল রূপভেদাঃ প্রমাণানি। কিন্তু এটা ত হইল বহিরঙ্গ—একটা অন্তরঙ্গও ত আছে।

কেন না, মানুষ ত শুধু চোখ দিয়া দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটি দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ এ কথা মানা চলিবে না—চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয় তবেই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

তাই শাস্ত্র "রূপভেদাঃ প্রমাণানি"তে ষড়ঙ্গের বহিরঙ্গ সারিয়া অন্তরঙ্গের কথায় বলিতেছেন—"ভাবলাবণ্য যোজনং"—চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে—চোখের কাজের উপরে

মনের কাজ ফলাইতে হইবে; কেন না শুধু কারু কাজটা সামান্য, চিত্র করা চাই—চিত্রের প্রধান কাজই চিৎকে দিয়া।

ভাব বলিতে কি বুঝায় তাহা আমাদের এক রকম সহজে জানা আছে। এই জন্যই তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টায় যাহা বলা হইবে তাহাই বুঝা শক্ত হইবে। স্ফটিক যেমন অনেকগুলা কোণ লইয়া দানা বাঁধিয়া দাঁড়ায় তেমনি "ভাব" কথাটা অনেকগুলা অর্থকে মিলাইয়া দানা বাঁধিয়াছে। এ সকল কথার মুস্কিল এই যে, ইহাদের সব অর্থ আমরা সকল সময়ে পূরাভাবে ব্যবহার করি না, দরকার-মত ইহাদের অর্থচ্ছটাকে ভিন্ন পর্য্যায়ে সাজাইয়া এবং কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া নানা কাজে লাগাই। ভাব বলিতে feelings, ভাব বলিতে idea, ভাব বলিতে characteristics, ভাব বলিতে suggestion, এমন আরো কত কি আছে।

এখানে ভাব বলিতে বুঝাইতেছে অন্তরের রূপ। আমার একটা ভাব, তোমার একটা ভাব; সেইভাবে আমি আমার মত, তুমি তোমার মত। রূপের ভেদ যেমন বাহিরের ভেদ, ভাবের ভেদ তেমনি অন্তরের ভেদ।

রূপের ভেদ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে ভাবের ভেদ সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। অর্থাৎ কেবল যদি তাহা এক-রোখা হইয়া ভেদকেই প্রকাশ করিতে থাকে তবে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। তাহা লইয়া সৃষ্টি হয় না, প্রলয়ই হয়। ভাব যখন আপন সত্য ওজন মানে, অর্থাৎ আপনার চারিদিককে মানে, বিশ্বকে মানে, তখনই তাহা মধুর। রূপের ওজন যেমন তাহার প্রমাণ, ভাবের ওজন তেমনি তাহার লাবণ্য।

কেহ যেন না মনে করেন ভাব কথাটা কেবল মানুষের সম্বন্ধেই খাটে। মানুষের মন অচেতন পদার্থের মধ্যেও একটা অন্তরের পদার্থ দেখে। সেই পদার্থটা সেই অচেতনের মধ্যে বস্তুতই আছে কিম্বা আমাদের মন সেটাকে সেইখানে আরোপ করে সে হইল তত্ত্বশাস্ত্রের তর্ক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। এইটুকু মানিলেই হইল স্বভাবতই মানুষের মন সকল জিনিষকেই মনের জিনিষ করিয়া লইতে চায়।

তাই আমরা যখন একটা ছবি দেখি তখন এই প্রশ্ন করি এই ছবির ভাবটা কি? অর্থাৎ ইহাতে ত হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখিলাম, চোখে দেখার বৈচিত্র্য দেখিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে চিত্তের কোন্ রূপ দেখা যাইতেছে—ইহার ভিতর হইতে মন মনের কাছে কোন্ লিপি পাঠাইতেছে? দেখিলাম একটা গাছ—কিন্তু গাছ ত ঢের দেখিয়াছি, এ গাছের অন্তরের কথাটা কি, অথবা যে আঁকিল গাছের মধ্যদিয়া তার অন্তরের কথাটা কি সেটা যদি না পাইলাম তব গাছ আঁকিয়া লাভ কিসের? অবশ্য উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের বইয়ে যদি গাছের নমুনা দিতে হয় তবে সে আলাদা কথা। কেননা সেখানে সেটা চিত্র নয় সেটা দৃষ্টান্ত।

শুধু-রূপ শুধু-ভাব কেবল আমাদের গোচর হয় মাত্র। "আমাকে দেখ" "আমাকে জান" তাহাদের দাবি এই পর্য্যন্ত। কিন্তু "আমাকে রাখ" এ দাবি করিতে হইলে আরো কিছু চাই। মনের আম্-দরবারে আপন-আপন রূপ লইয়া ভাব লইয়া নানা জিনিষ হাজির হয়, মন তাহাদের কাহাকেও বলে, "বোসো", কাহাকেও বলে, "আচ্ছা, যাও।"

যাহারা আর্টিষ্ট তাহাদের লক্ষ্য এই যে তাহাদের সৃষ্ট পদার্থ

মনের দরবারে নিত্য আসন পাইবে। যে সব গুণীর সৃষ্টিতে রূপ আপনার প্রমাণে, ভাব আপনার লাবণ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে তাহারাই ক্লাসিক হইয়াছে, তাহারাই নিত্য হইয়াছে।

অতএব চিত্রকলায় ওস্তাদের ওস্তাদী, রূপে ও ভাবে তেমন নয়, যেমন প্রমাণে ও লাবণ্যে। এই সত্য-ওজনের আন্দাজটি পুঁথিগত বিদ্যায় পাইবার জো নাই। ইহাতে স্বাভাবিক প্রতিভার দরকার। দৈহিক ওজনবোধটি স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে তবেই চলা সহজ হয়। তবেই নূতন নূতন বাধায়, পথের নূতন নূতন আঁকেবাঁকে আমরা দেহের গতিটাকে অনায়াসে বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তানে লয়ে মিলাইয়া চলিতে পারি। এই ওজনবোধ একেবারে ভিতরের জিনিষ যদি না হয় তবে রেলগাড়ির মত একই বাঁধা রাস্তায় কলের টানে চলিতে হয়, এক ইঞ্চি ডাইনে বাঁয়ে হেলিলেই সর্ব্বনাশ। তেমনি রূপ ও ভাবের সম্বন্ধে যার ওজনবোধ অন্তরের জিনিষ সে "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির" পথে কলাসৃষ্টিকে চালাইতে পারে। যার সে বোধ নাই সে ভয়ে ভয়ে একই বাঁধা রাস্তায় ঠিক এক লাইনে চলিয়া পোটো হইয়া কারিগর হইয়া ওঠে, সে সীমার সঙ্গে সীমার নূতন সম্বন্ধ জমাইতে পারে না। এই জন্য নূতন সম্বন্ধমাত্রকে সে বাঘের মত দেখে।

যাহা হউক এতক্ষণ ছবির ষড়ঙ্গের আমরা দুটি অঙ্গ দেখিলাম, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। এইবার পঞ্চম অঙ্গে বাহির ও ভিতর যে-কোঠায় এক হইয়া মিলিয়াছে তাহার কথা আলোচনা করা যাক্। সেটার নাম "সাদৃশ্যং"। নকল করিয়া যে সাদৃশ্য মেলে এতক্ষণে সেই কথাটা আসিয়া পড়িল এমন যদি কেহ মনে করেন তবে

শাস্ত্রবাক্য তাঁহার পক্ষে বৃথা হইল। ঘোড়াগরুকে ঘোড়াগরু করিয়া আঁকিবার জন্য রেখা প্রমাণ ভাব লাবণ্যের এত বড় উদ্যোগপর্ব্ব কেন? তাহা হইলে এমন কথাও কেহ মনে করিতে পারেন উত্তর-গোগৃহে গোরু-চুরি কাণ্ডের জন্যই উদ্যোগপর্ব্ব, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের জন্য নহে।

সাদৃশ্যের দুইটা দিক আছে। একটা, রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য; আর-একটা, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য। একটা বাহিরের, একটা ভিতরের। দুটাই দরকার। কিন্তু সাদৃশ্যকে মুখ্যভাবে বাহিরের বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না।

যখনি রেখা ও প্রমাণের কথা ছাড়াইয়া ভাব লাবণ্যের কথা পাড়া হইয়াছে তখনি বোঝা গিয়াছে গুণীর মনে যে ছবিটি আছে সে প্রধানত রেখার ছবি নহে তাহা রসের ছবি। তাহার মধ্যে এমন একটি অনির্ব্বচনীয়ত্ব আছে যাহা প্রকৃতিতে নাই। অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবেই অন্তরের সহিত বাহিরের মিল হয়। অদৃশ্য তবেই দৃশ্যে আপনার প্রতিরূপ দেখে। নানারকম চিত্রবিচিত্র করা গেল, নৈপুণ্যের অন্ত রহিল না, কিন্তু ভিতরের রসের ছবির সঙ্গে বাহিরের রূপের ছবির সাদৃশ্য রহিল না; রেখাভেদ ও প্রমাণের সঙ্গে ভাব ও লাবণ্যের জোড় মিলিল না;—হয়ত রেখার দিকে ত্রুটি রহিল নয়ত ভাবের দিকে—পরস্পর পরস্পরের সদৃশ হইল না। বরও আসিল, কনেও আসিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে মিলনের মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, বাহিরের লোক হয়ত পেট

ভরিয়া সন্দেশ খাইয়া খুব জয়ধ্বনি করিল কিন্তু অন্তরের খবর যে জানে সে বুঝিল সব মাটি হইয়াছে। চোখ-ভোলানো চাতুরী-তেই বেশি লোক মজে, কিন্তু, রূপের সঙ্গে রসের সাদৃশ্যবোধ যার আছে, চোখের আড়ে তাকাইলেই যে-লোক বুঝিতে পারে রসটি রূপের মধ্যে ঠিক আপনার চেহারা পাইয়াছে কিনা, সেইত রসিক। বাতাস যেমন সূর্য্যের কিরণকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিবার কাজ করে তেমনি গুণীর সৃষ্ট কলাসৌন্দর্য্যকে লোকালয়েব সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিবার ভার এই বসিকের উপর। কেননা যে ভরপুর করিয়া পাইয়াছে সে স্বভাবতই না দিয়া থাকিতে পারেনা,—সে জানে তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে। সর্ব্বত্র এবং সকল কালেই মানুষ এই মধ্যস্থকে মানে। ইহারা ভাবলোকের ব্যাঙ্কের বর্ত্তা—এরা নানাদিক হইতে নানা ডিপজিটের টাকা পায়—সে টাকা বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নহে;—সংসারে নানা কারবারে নানা লোক টাকা খাটাইতে চায়, তাহাদের নিজের মূলধন যথেস্ট নাই—এই ব্যাঙ্কার নহিলে তাহাদের কাজ বন্ধ।

এমনি করিয়া রূপের ভেদ প্রমাণে বাঁধা পড়িল, ভাবের বেগ লাবণ্যে সংযত হইল, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য পটের উপর সুসম্পূর্ণ হইয়া ভিতরে বাহিরে পূরাপূরি মিল হইয়া গেল—এই ত সব চুকিল। ইহার পর আর বাকি রহিল কি?

কিন্তু আমাদের শিল্পশাস্ত্রের বচন এখনো যে ফুরাইল না। স্বয়ং দ্রৌপদীকে সে ছাড়াইয়া গেল। পাঁচ পার হইয়া যে ছয়ে আসিয়া ঠেকিল সেটা "বর্ণিকাভঙ্গং"। রঙের ভঙ্গিমা।

এইখানে বিষম খট্‌কা লাগিল। আমার পাশে এক গুণী

বসিয়া আছেন তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রূপ, অর্থাৎ রেখার কারবার যেটা ষড়ঙ্গের গোড়াতেই আছে আর এই রঙেরভঙ্গী যেটা তার সকলের শেষে স্থান পাইল চিত্রকলায় এ দুটোর প্রাধান্য তুলনায় কার কত?

তিনি বলিলেন, বলা শক্ত।

তাঁর পক্ষে শক্ত বই কি? দুটির পরেই যে তাঁর অন্তরের টান, এমন স্থলে নিরাসক্ত মনে বিচার করিতে বসা তাঁর দ্বারা চলিবে না। আমি অব্যবসায়ী, অতএব বাহির হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ।

রং আর রেখা এই দুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয়। এই সীমার নির্দ্দেশই ছবির প্রধান জিনিষ। অনির্দ্দিষ্টতা গানে আছে, গন্ধে আছে কিন্তু ছবিতে থাকিতে পারে না।

এই জন্যই কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না। বর্ণটা রেখার আনুষঙ্গিক।

সাদার উপরে কালোর দাগ এই হইল ছবির গোড়া। আমরা সৃষ্টিতে যাহা চোখে দেখিতেছি তাহা অসীম আলোকের সাদার উপরকার সসীম দাগ। এই দাগটা আলোর বিরুদ্ধ তাই আলোর উপরে ফুটিয়া উঠে। আলোর উল্টা কালো, আলোর বুকের উপরে ইহার বিহার।

কালো আপনাকে আপনি দেখাইতে পারে না। স্বয়ং শুধু অন্ধকার, দোয়াতের কালীর মত। সাদার উপর যেই

দাগ কাটে অমনি সেই মিলনে সে দেখা দেয়। সাদা আলোকের পটটি বৈচিত্র্যহীন ও স্থির, তার উপরে কালো রেখাটি বিচিত্রনৃত্যে ছন্দে ছন্দে ছবি হইয়া উঠিতেছে। শুভ্র ও নিস্তব্ধ অসীম রজতগিরিনিভ, তারই বুকের উপর কালীর পদক্ষেপ চঞ্চল হইয়া সীমায় সীমায় রেখায় রেখায় ছবির পরে ছবির ছাপ মারিতেছে। কালীরেখার সেই নৃত্যের ছন্দটি লইয়া চিত্রকলার রূপভেদাঃ প্রমাণানি। নৃত্যের বিচিত্র বিক্ষেপগুলি রূপের ভেদ, আর তার ছন্দের তালটিই প্রমাণ।

আলো আর কালো, অর্থাৎ আলো আর না-আলোর দ্বন্দ্ব খুবই একান্ত। রংগুলি তারই মাঝখানে মধ্যস্থতা করে। ইহারা যেন বীণার আলাপের মীড়—এই মীড়ের দ্বারা সুর যেন সুরের অতীতকে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে ইসারায় দেখাইয়া দেয়—ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে সুর আপনাকে অতিক্রম করিয়া চলে। তেমনি রঙের ভঙ্গী দিয়া রেখা আপনাকে অতিক্রম করে; রেখা যেন অরেখার দিকে আপন ইসারা চালাইতে থাকে। রেখা জিনিষটা সুনির্দ্দিষ্ট,—আর রং জিনিষটা নির্দ্দিষ্ট অনির্দ্দিষ্টের সেতু, তাহা সাদা কালোর মাঝখানকার নানা টানের মীড়। সীমার বাঁধনে বাঁধা কালো-রেখার তারটাকে সাদা যেন খুব তীব্র করিয়া আপনার দিকে টানিতেছে, কালো তাই কড়ি হইতে অতিকোমলের ভিতর দিয়া রঙে রঙে অসীমকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতেছি রং জিনিষটা রেখা এবং অরেখার মাঝখানের সমস্ত ভঙ্গী। রেখা ও অরেখার মিলনে যে ছবির সৃষ্টি সেই ছবিতে এই মধ্যস্থের প্রয়োজন। অরেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালীর নৃত্য সেখানে

এই রংগুলি যোগিনী। শাস্ত্রে ইহাদের নাম সকলের শেষে থাকিলেও ইহাদের কাজ নেহাৎ কম নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাদার উপর শুধু-রেখার ছবি হয়, কিন্তু সাদার উপর শুধু-রঙে ছবি হয় না। তার কারণ, রং জিনিষটা মধ্যস্থ—দুই পক্ষের মাঝখানে ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র জায়গায় তার অর্থই থাকে না।

এই গেল বর্ণিকাভঙ্গ।

এই ছবির ছয় অঙ্গের সঙ্গে কবিতার কিরূপ মিল আছে তাহা দেখাইলেই কথাটা বোঝা হয় ত সহজ হইবে।

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী। সৈন্যদলের চালের মত সেই বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে—তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য্য।

এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই; তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।

বহিঃসাদৃশ্য, অর্থাৎ রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য, অর্থাৎ যেটাকে দেখা যায় সেইটাকে ঠিকঠাক করিয়া বর্ণনা করা কবিতার প্রধান জিনিষ নহে। তাহা কবিতার লক্ষ্য নহে উপলক্ষ্য মাত্র। এইজন্য বর্ণনামাত্রই যে-কবিতার পরিণাম, রসিকেরা তাহাকে উঁচুদরের কবিতা বলিয়া গণ্য করেন না। বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা ও ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করা ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেরই লক্ষ্য।

স্বষ্টিকর্ত্তা একেবারেই আপন পরিপূর্ণতা হইতে স্বষ্টি করিতেছেন তাঁর আর-কোনো উপসর্গ নাই। কিন্তু বাহিরের স্বষ্টি মানুষের ভিতরের তারে ঘা দিয়া যখন একটা মানস পদার্থকে জন্ম দেয়, যখন একটা রসের সুর বাজায় তখনই সে আর থাকিতে পারে না, বাহিরে স্বষ্ট হইবার কামনা করে। ইহাই মানুষের সকল স্বষ্টির গোড়ার কথা। এই জন্যই মানুষের স্বষ্টিতে ভিতর বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত। এই জন্য মানুষের স্বষ্টিতে বাহিরের জগতের আধিপত্য আছে। কিন্তু একাধিপত্য যদি থাকে, যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়াই কোনো আর্টিষ্টের কাজ হয় তবে তার দ্বারা স্বষ্টিই হয় না। শরীর বাহিরের খাবার খায় বটে কিন্তু তাহাকে অবিকৃত বমন করিবে বলিয়া নয়। নিজের মধ্যে তাহার বিকার জন্মাইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইবে বলিয়া। তখন সেই খাদ্য একদিকে রসরক্তরূপে বাহ্য আকার, আরেক দিকে শক্তি স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যরূপে আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই শরীরের স্বষ্টি-কার্য্য। মনের স্বষ্টিকার্য্যও এমনিতর। তাহা বাহিরের বিশ্বকে বিকারের দ্বারা যখন আপনার করিয়া লয় তখন সেই মানস পদার্থটা একদিকে বাক্য রেখা সুর প্রভৃতি বাহ্য আকার, অন্যদিকে সৌন্দর্য্য শক্তি প্রভৃতি আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই মনের স্বষ্টি—যাহা দেখিলাম অবিকল তাহাই দেখানো স্বষ্টি নহে।

তারপরে, ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গং, কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা (Suggestiveness)। এই ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত ও অব্যক্তর মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা

বাণীর নির্দ্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীর দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

আসল কথা, সকল প্রকৃত আর্টেই একটা বাহিরের উপকরণ, আর, একটা চিত্তের উপকরণ থাকা চাই—অর্থাৎ একটা রূপ, আর-একটা ভাব। সেই উপকরণকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়; বাহিরের বাঁধন প্রমাণ, ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তার পরে সেই ভিতর বাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে কিসের জন্য? সাদৃশ্যের জন্য। কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য? না ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য। বাহিরের রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয় তবে ভাব ও লাবণ্য কেবল যে অনাবশ্যক হয় তাহা নহে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই সাদৃশ্যটিকে ব্যঞ্জনার রঙে রঙাইতে পারিলে সোনায় সোহাগা—কারণ তখন তাহা সাদৃশ্যের চেয়ে বড় হইয়া ওঠে,—তখন তাহা কতটা যে বলিতেছে তাহা স্বয়ং রচয়িতাও জানে না—তখন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি তাহার সংকল্পকেও ছাড়াইয়া যায়।

অতএব, দেখা যাইতেছে ছবির যে ছয় অঙ্গ, সমস্ত আর্টের অর্থাৎ আনন্দরূপেরই তাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাষার কথা

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত আমার অভিভাষণ অবলম্বন করে,' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়, আষাঢ় মাসের 'নারায়ণ' পত্রে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এই সমালোচনার জন্য আমি তাঁর নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সমাজে এবং সাহিত্যে যে-সকল বিষয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে, তার সম্যক্ আলোচনা ও বিচার হওয়া আমি নিতান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করি। যাঁরা কোন নূতন মতের প্রচার করতে চান, তাঁদের কথা সমাজের এবং সাহিত্যের গোলে-হরিবোলে প্রায়ই চাপা পড়ে যায়। কেন না, প্রচলিত পদ্ধতির দলীয় লোক গণনায় অসংখ্য, এবং তাদের তুলনায় নূতন মতের পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা নগণ্য বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে মতভেদ যে আছে, সমাজের নিকট তাই প্রতিপন্ন করাই কঠিন, —সমাজকে নূতন মত গ্রাহ্য করানো ত দূরের কথা। এরূপ অবস্থায়, যিনি নব্যপন্থীদের নূতন মত সমর্থন করবার সুযোগ দেন, তিনি তাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

যে ভাষা আজকাল সাহিত্যে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তার নাম সাধুভাষা। তার জোর এই যে, এখন মুলুক তার। বঙ্গসাহিত্য আজ তার দখলে। যারা তার উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হয়েছে, সাহিত্যের আদালতে সকল প্রকার প্রমাণ প্রয়োগের ভার, সকল প্রকার কৈফিয়তের দায় তাদেরই উপর অর্শায়। সুতরাং যিনি আমাদের প্রমাণ দর্শাতে বলেন, তাঁর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, আর

যিনি আমাদের কৈফিয়ৎ তলব করেন, তাঁর নিকটও আমরা সমান কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় এই ভাষার কথা নিয়ে কোনরূপ তর্কবিতর্ক করবার সুযোগ আমাদের দেন নি। তাঁর প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে' অনুমান করা যায় যে, তিনি সাধুভাষার পক্ষে, এবং বাঙ্গলা ভাষার বিপক্ষে। কিন্তু তিনি কোথায়ও তাঁর এই মত স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন নি। সাবধানের মার নেই, সম্ভবতঃ এই বচনটি মনে রেখে, তিনি তাঁর প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। তাই তিনি আমার অভিভাষণের উতোর গান নি,—শুধু আমার উপর দু'টি একটি চাপান দিয়েছেন। আমি যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

ভাষা সম্বন্ধে আমার মতামতের জবাবদিহি করবার পূর্ব্বে আমি বীরবলের হয়ে দুয়েকটি কথা বল্‌তে চাই। সিংহ মহাশয় লিখেছেন যে—

"চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ বীরবলী ভাষায় রচনা করেন নাই। তিনি নিজেই তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। 'বিদূষকের আসন' হইতে 'বীরবলী ঢঙ' চলে, কিন্তু তাহা 'সভাপতির আসনের বহুনিম্নে' অবস্থিত। পরক্ষণেই তিনি বলেন এই সভাপতির আসন হইতে নামিয়াই আমি আবার আমার বীরবলী ভাষা আরম্ভ করিব।"

আমার যতদূর স্মরণ হয়, আমি এরূপ কোন কথা বলিনি। বীরবলী ঢঙ নামক একটা বিশেষ ঢঙের অস্তিত্ব থাকলেও, বীরবলী ভাষা নামে কোন বিশেষ ভাষা নেই। একই ভাষা নানা ঢঙে লেখা যায়। ঢঙ অর্থে সংস্কৃতে যা'কে বলে রীতি, এবং ইংরাজীতে Style। একই ইংরাজী ভাষা যে পৃথক পৃথক লেখকের হাতে পৃথক পৃথক মূর্ত্তি ধারণ

করে, এ কথা সর্ব্বলোকবিদিত। এমন কি, সংস্কৃত ভাষাও বৈদর্ভী, গৌড়ীয়, পাঞ্চালী প্রভৃতি নানা রীতিতে লিখিত হত। আমি অবশ্য সকলকে লেখায় মৌখিক ভাষা অনুসরণ করতে বলি; কিন্তু কাউকেও বীরবলী ঢঙ অনুকরণ করতে অনুরোধ করিনে। তার কারণ, বীরবল রচনার যে পথ অবলম্বন করেছেন, সে পথ সঙ্কীর্ণ, কুটিল ও বন্ধুর। তা' ছাড়া, সে পথে কাঁটা আছে। এ পথ সাহিত্যের বামমার্গ। আমি সকলকে দক্ষিণমার্গ অবলম্বন করতে পরামর্শ দিই,—সাহিত্যের সেই সরল সমতল ও প্রশস্ত রাজপথ, যে পথে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতির বড় বড় মালগাড়ি অবাধে যাতায়াত করতে পারে। বীরবলের মতামতেরও ষোল-আনা দায়ীত্ব নিতে আমি রাজি নই। কমলাকান্তের মতের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণ দায়ী করা কি সঙ্গত হবে? সভাপতির আসন গ্রহণ করলেই বক্তাকে বীরবলী ঢং ত্যাগ করতে হয়, কেননা কোন সভার কোনও সভাপতি মস্কাঠাট্টার ওজুহাতে নিজ কথার দায়ীত্ব এড়াতে পারেন না।

তর্কস্থলে আমরা ফাঁক পেলেই প্রশ্নচ্ছলে অপরকে ঠোকা দেই। এই ভাবে এবং এই উদ্দেশ্যে সিংহ মহাশয় যে-সকল ছোটখাট প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর দেওয়া আমি অনাবশ্যক মনে করি। তা ছাড়া সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। কেননা তিনি আমার অভিভাষণের উপর আক্রমণ করেন নি—শুধু তার চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করেছেন।

সিংহ মহাশয়ের মুখ্য প্রশ্ন এই যে, মৌখিক ভাষাকে কি করে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে? কেননা সমগ্র বঙ্গের

মৌখিক ভাষা এক নয়, দেশভেদ এবং জাতিভেদ অনুসারে মুখের কথা নানা আকার ধারণ করে।

মৌখিক ভাষার অনুসরণ করলে সাহিত্যে প্রাদেশিকতা এসে পড়বে—এ ভয় অনেকেই পান; এবং সাহিত্যকে এই দোষ হতে মুক্ত রাখবার অভিপ্রায়ে তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, সমস্ত বঙ্গ দেশের জন্য এমন একটি ভাষা রচনা করতে হবে, যা বাঙ্গলার কোন প্রদেশেরই ভাষা নয়। সাধুভাষার স্বপক্ষে এই হচ্ছে সর্ব্বপ্রধান যুক্তি। এ যুক্তির বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য কথা আমি ইতি-পূর্ব্বে আমার "চল্‌তিভাষা বনাম সাধুভাষা, ওরফে বাবু-বাংলা" নামক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছি। সংক্ষেপে আমার কথা এই:— সাহিত্যের রাজ্য অধিকার করবার জন্য নানা প্রাদেশিক ভাষার ভিতর প্রথমে লড়াই চলে। সে লড়াইয়ে, যে প্রাদেশিক ভাষার রসনাবল সব চেয়ে বেশি, সেই ভাষা জয়লাভ করে,—বাদবাকি সব উপভাষা হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্যের ভাষা তার কোন একটি বিশেষ প্রদেশের মৌখিক ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই মৌখিক ভাষার সঙ্গে যোগ রক্ষা করেই সাহিত্যের ভাষা পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। যুগে যুগে মৌখিক ভাষার অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষারও রূপান্তর ঘটে। Shakespeareএর ভাষায় এ যুগে ইংরাজিতে গদ্য পদ্য কিছুই লিখিত হয় না। অথচ ইংরাজি ভাষায় আজও সাহিত্য রচিত হয়। যদি কোনও দেশে কোনও কারণে লিখিত ভাষা কথিত ভাষার অনুসরণ না করে, তাহলে অচিরে সে ভাষা কালগ্রাসে পতিত হয়। আমাদের দেশে পুঁথিগত

প্রাকৃতের দুর্দ্দশার ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়। বঙ্গদেশে সাহিত্যের ভাষা দক্ষিণবঙ্গের মৌখিক ভাষা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ও ভাষা আকাশ থেকে পড়েনি—মানুষের মুখ থেকেই বেরিয়েছে। সুতরাং কালক্রমে দক্ষিণবঙ্গের মুখের কথার যে বদল হয়েছে, আমাদের নবসাহিত্যের ভাষাকেও সেই বদল অল্পাধিক পরিমাণে অঙ্গীকার কর্‌তে হবে—নইলে আমাদের সাহিত্য রস-রক্তহীন হয়ে পড়্‌বে। শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়, দর্শণেন্দ্রিয়ের নয়,—এই সত্যটি ভুলে গেলেই মানুষে লেখ্যপটের পূজা কর্‌তে আরম্ভ করে। পূর্ব্বে যা বলা গেল তার সত্যতা এতই প্রত্যক্ষ যে, স্বয়ং সিংহ মহাশয়ও বলেছেন—

"অবশ্য ভাষার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে দক্ষিণবঙ্গের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এবং আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত ভাষাও এই অঞ্চলের ভাষারই অনুরূপ সন্দেহ-নাই—কিন্তু এ অঞ্চলের ভাষাতেও যে প্রাদেশিকতা আছে তাহা বর্জ্জন করা আবশ্যক।"

এ কথার উত্তর আমি পরে দেব।

সিংহ মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—

"শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষাই যদি সাহিত্যরচনার উপযোগী ভাষা হয়, তবে সে শিক্ষিত সম্প্রদায় অর্থে কাহাদিগকে বুঝিব? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে বাদ দিব কি? তাঁহারা "কলম" না বলিয়া "লেখনী" বলেন—"দোয়াত" না বলিয়া "মস্যাধার"—"আদালত" না বলিয়া "বিচারালয়" বলেন ইত্যাদি।"

ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা বঙ্গের অপর সকল সমাজের মৌখিক ভাষার তুলনায় যে সংস্কৃত-শব্দভূয়িষ্ঠ,—এ

কথা আমি অস্বীকার করিনে। তবে পণ্ডিত মহাশয়েরা যে ভুলেও দোয়াত কলমের নাম মুখে আনেন না, এ কথা আমার জানা ছিল না। কলমের চর্চ্চা করবার বিপক্ষে ত কোন শাস্ত্রীয় বিধান নেই। মহম্মদগজ্‌নির বহুপূর্ব্বে ও পদার্থটি ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ এবং সংস্কৃত কাব্যে স্থানলাভ করেছিল। মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর রচনায় ওশব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন—

কলমাগ্রনির্গতমসীবিন্দুব্যাজেন সাঞ্জনাশ্রুকণৈঃ।
কায়স্থলুণ্ঠ্যমানা রোদতি খিন্নেব রাজ্যশ্রীঃ॥ (কলাবিলাসঃ)।

অন্বার্থ—

"কায়স্থ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিতা এবং খিন্না রাজ্যশ্রী কলমাগ্রনির্গত মসীবিন্দুর ছলে সাঞ্জন অশ্রুকণা বিসর্জ্জন করেন।"

তারপর সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা "আদালত"কে কেন যে "বিচারালয়" বল্‌বেন তাও বোঝা কঠিন, কেননা সংস্কৃতভাষায় Law Courtএর নাম অধিকরণমণ্ডপ, ব্যবহারমণ্ডপ, ব্যবহারসভা প্রভৃতি। ইংরাজি Trial শব্দের সংস্কৃত প্রতিবাক্য "বিচার" নয়। ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে পড়েই Law Court ভাষায় "বিচারালয়" আকার ধারণ করেছে। "মস্যাধার" শব্দ ব্যবহার কর্‌বার ভিতর বিপদ আছে। ভৃত্যকে "মস্যাধার" আনয়ন কর্‌তে বল্‌লে, "নস্যাধার" আনীত হবারই বেশী সম্ভাবনা—কেননা ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু মসী নয়,—নস্য।

সিংহ মহাশয় বলেন যে, একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কথায় কথায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন; অপর দিকে ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায় তেমনি ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করেন। অতএব

"যতদিন ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের কথোপকথনের মধ্যে ইংরেজি কথার বুক্‌নী দেওয়া না ছাড়িবেন, ততদিন কথোপকথনের ভাষায় গ্রন্থরচনা করিলে তাহা শাপভ্রষ্ট ইংরাজি ভাষাই হইবে।"

আমি ত চিরকাল এই কথাই বলে আস্‌ছি যে একদিকে সংস্কৃত, অপর দিকে ইংরেজি,—এই দোটানার মধ্যে পড়ে আমাদের মাতৃভাষা মারা যাচ্ছে। এবং এই দুটি ভাষার মিলনে যে কিম্ভুত কিমাকার নবভাষার সৃষ্টি হচ্ছে, তারি নাম সাধুভাষা। ইংরেজি বুক্‌নি ছাড়্‌তে হলে যে সংস্কৃত বুক্‌নি ধরতে হবে—এ কথা আমি স্বীকার করি নে। ইংরেজি বুক্‌নি এখন পর্য্যন্ত আমাদের মুখেই রয়েছে, কিন্তু সংস্কৃত বুক্‌নি সাহিত্যে স্থান পেয়েছে—তাও আবার খাঁটি সংস্কৃত নয়—ইংরেজি কথা ভেঙ্গে যোড়াতাড়া দিয়ে আমাদের হাতে-গড়া বাঙ্গলা সংস্কৃত। সাহিত্যের ভাষাকে মৌখিক ভাষার অনুসরণ কর্‌তে হবে, অনুকরণ করতে হবে না। সুতরাং আমাদের শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মুখের ভাষার উপর যে-সকল ইংরাজি ও সংস্কৃত শব্দ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, লেখায় সেগুলি বর্জ্জন কর্‌তে হবে। মনে রাখবেন যে সেই শব্দগুলিই দূরে নিক্ষেপ কর্‌তে হবে, যেগুলি আজও প্রক্ষিপ্ত হিসাবে গণ্য ;—কিন্তু যে-সকল ইংরাজি এবং সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা ভাষার সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, সেগুলি লেখায় বাদ দেওয়া চল্‌বে না।

এস্থলে একটি কথার পুনরুল্লেখ করার দরকার, যে কথা আমি পূর্ব্বে বহুবার বলেছি। ভাষার বিশেষত্ব তার বাক্যের—(Sentence) উপরে নির্ভর করে—পদের (Word) উপরে নয়। ভাষার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় তার ব্যাকরণে পাওয়া যায়—অভিধানে নয়। প্রতি জীবন্ত

ভাষায় নিত্য নূতন শব্দের আমদানি হয়, এবং অনেক প্রাচীন শব্দ ঝরে পড়ে। কিন্তু ভাষার গঠন অতি স্বল্প মাত্রায় এবং অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়। আমার সঙ্গে সিংহ মহাশয়ের মতের প্রভেদ এই যে, গত দু'তিনশ' বৎসরের মধ্যে মুখের ভাষার গঠনের যে পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমি লেখায় তা গ্রাহ্য করতে বলি। সিংহ মহাশয় বলেন যে, দক্ষিণবঙ্গের ভাষাতেও যে প্রাদেশিকতা আছে, তাহা বর্জ্জন করা আবশ্যক। তাঁর মতে "করছি" হচ্ছে এই প্রাদেশিকতার উদাহরণ। তিনি দেখিয়েছেন যে, ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের সঙ্গে আমার মতের পোনেরো-আনা-তিন-পাই মিল থাক্‌লেও, ঐ এক পাই অমিলের জন্য তাঁদের রচনা সাহিত্যসমাজে আদৃত, এবং আমার ভাষা নিন্দিত। এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, প্রতি জীবন্ত ভাষা Evolutionএর নিয়মের অধীন। এবং সেই ইভলিউশনের দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে "করছি"—"করিতেছি" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ form—কেননা "করিতেছি"তে কৃ এবং অস এই যোড়া ধাতুরই একত্র অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়,—অপর পক্ষে "কর্‌ছি"তে অস ধাতু বিভক্তিতে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে আমি আমার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বিস্তর আলোচনা করেছি।

কথিত ভাষার বদল যত সহজে হয়, লিখিত ভাষার অবশ্য তত সহজে হয় না,—অথচ একথাও সত্য যে, কোন জীবন্ত ভাষা হ্রাস-বৃদ্ধির নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত নয়। যা জড় কিম্বা মৃত, এ পৃথিবীতে একমাত্র তাই নিজের শক্তিতে নিজেকে বদ্‌লে নিতে পারে না। যাঁরা সাধুভাষার সাধুতা রক্ষা কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর

হয়েছেন, তাঁরাও স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের চোখের সুমুখেই সে ভাষার চেহারা বিলকুল ফিরে গেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার সঙ্গে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষার তুলনা কর্‌লেই, নবসাহিত্য যে কতদূর মৌখিক ভাষার কাছে এগিয়ে এসেছে, তা নিতান্ত অন্যমনস্ক পাঠকও প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌বেন। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়াতে, বাঙ্গালীর ভাষার ঐক্য নষ্ট হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। জাতিভেদ এবং প্রদেশভেদ অনুসারে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে, শুধু ভাষা কেন, অপর অনেক বিষয়েও যে প্রভেদ বিস্তর, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। কোনও কৃত্রিম উপায়ে সে পার্থক্য দূর করা যাবে না, বড় জোর চাপা দেওয়া যেতে পারে। সাধুভাষা যদি নিতান্ত কৃত্রিম ভাষা না হয়ে পড়ে, এবং যদি তা দক্ষিণবঙ্গের মৌখিক ভাষার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ না করে, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্যের প্রসাদে বাঙ্গালীর শুধু ভাষার নয়—সমাজেরও ঐক্য গড়ে উঠবে।

যদিচ সিংহ মহাশয়ের প্রবন্ধের নাম "ভাষার কথা," তবুও তাতে ভাষার অপেক্ষা সাহিত্যের আলোচনাই ঢের বেশি-পরিমাণে করা হয়েছে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতের কোনরূপ বিচার করা আমি অনাবশ্যক মনে করি—কেননা তাঁর মোদ্দা কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের লেখা বোঝা যায় না। তাঁর প্রবন্ধ পড়ে আমার শুধু এই মনে হয় যে, মানুষের বোঝবার ক্ষমতার সীমা আছে, কিন্তু তার না বোঝবার ক্ষমতা অসীম।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অব্যক্ত বাসনা

(প্রাচীন ফরাসী কবি হইতে)

সাধ যায় বালা—আঃ রে দুরন্ত সরম !
এমন ক'দিন আর মরি জ্বলে জ্বলে ?
দূরে যারে লজ্জা ভয়—দূরে যা সম্ভ্রম !
প্রাণের গোপন ব্যথা দিই তবে বলে।
"সাধ যায় অয়ি বালা, তুমি যে দরদী
মোর দুঃখে"...কি বলিরে, রুষিবে দেবতা।
না—না পোড়া আশা নিয়ে যতই দগধি'
মনে মনে,—মনে থাকে মনের যা কথা।
কিন্তু কেন মর্ম্মে রাখি এ আগুন জ্বেলে,—
যা হয় তা হোক, তাহে দিই জল ঢেলে।
বলি আমি—তার পরে খেদ নাই কোনো।
"সাধ যায়"...বুক ফাটে, মুখ নাহি ফুটে,
বলিব—বলিরে তবু—প্রাণ কণ্ঠে উঠে !
সাধ যায়—ওগো তুমি শোনো তুমি শোনো।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

সবুজ পত্র

ঘরে বাইরে

সন্দীপের আত্মকথা

আমি বুঝতে পারচি একটা গোলমাল বেধেছে। সেদিন তার একটু পরিচয় পাওয়া গেল।

নিখিলেশের বৈঠকখানার ঘরটা আমি আসার পর থেকে সদর ও অন্দরে মিশিয়ে একটা উভচর জাতীয় পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে বাইরের থেকে আমার অধিকার ছিল, ভিতরের থেকে মক্ষির বাধা ছিল না।

আমাদের এই অধিকার যদি আমরা কিছু-কিছু হাতে রেখে রয়ে-বসে ভোগ করতুম তাহলে হয় ত লোকের একরকম সয়ে যেত। কিন্তু বাঁধ যখন প্রথম ভাঙে তখনি জলের তোড়টা হয় বেশি। বৈঠকখানা ঘরে আমাদের সভাটা এম্‌নি জোরে চল্‌তে লাগল যে, আর কোনো কথা মনেই রইল না।

বৈঠকখানা ঘরে যখন মক্ষি আসে আমার ঘর থেকে আমি একরকম করে টের পাই। খানিকটা বালা-চুড়ির খানিকটা এটা-ওটার শব্দ পাওয়া যায়। ঘরের দরজাটা বোধ করি সে একটু অনাবশ্যক জোরে ঘা দিয়েই খোলে। তার পরে বইয়ের আলমারির কাঁচের পাল্লাটা একটু আঁট আছে সেটা টেনে খুল্‌তে গেলে যথেষ্ট শব্দ হয়ে ওঠে। বৈঠকখানায় এসে দেখি দরজার দিকে পিছন করে মক্ষি শেল্‌ফ্ থেকে মনের মত বই বাছাই করতে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী। তখন তাকে এই দুরূহ কাজে সাহায্য করবার প্রস্তাব করতেই সে চম্‌কে উঠে আপত্তি করে—তার পরে অন্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে।

সেদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পূর্ব্বোক্ত রকমের শব্দ লক্ষ্য করেই ঘর থেকে রওনা হয়েছিলুম। পথের মাঝখানে বারান্দায় দেখি এক দরোয়ান খাড়া। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই আমি চলেছিলুম—এমন সময় সে পথ আগ্‌লে বল্লে, বাবু, ওদিকে যাবেন না।

যাব না? কেন?

বৈঠকখানা ঘরে রাণীমা আছেন।

আচ্ছা, তোমার রাণীমাকে খবর দাও যে সন্দীপবাবু দেখা করতে চান।

না, সে হবে না, হুকুম নেই।

ভারি রাগ হল, গলা একটু চড়িয়ে বল্লুম,—আমি হুকুম করচি তুমি জিজ্ঞাসা করে এস।

গতিক দেখে দরোয়ান একটু থম্‌কে গেল। তখন আমি

তাকে পাশে ঠেলে ঘরের দিকে এগলুম। যখন প্রায় দরজার কাছ-বরাবর পৌঁচেছি এমন সময় তাড়াতাড়ি সে কর্ত্তব্য পালন করবার জন্যে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরে বল্লে, বাবু, যাবেন না।

কি! আমার গায়ে হাত! আমি হাত ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম। এমন সময়ে মক্ষি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখে দরোয়ান আমাকে অপমান করবার উপক্রম করচে।

তার সেই মূর্ত্তি আমি কখনো ভুল্‌ব না। মক্ষি যে সুন্দরী সেটা আমার আবিষ্কার। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক ওর দিকে তাকাবে না। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, যাকে আমাদের রূপ-রসজ্ঞ লোকেরা নিন্দা করে বলে "ঢ্যাঙা"। ওর ঐ লম্বা গড়নটিই আমাকে মুগ্ধ করে—যেন প্রাণের ফোয়ারার ধারা—সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়গুহা থেকে বেগে উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেচে। ওর রং শাম্‌লা—কিন্তু সে যে ইস্পাতের তলোয়ারের মত শাম্‌লা—কি তেজ আর কি ধার! সেই তেজ সেদিন ওর সমস্ত মুখে চোখে ঝিক্‌মিক্ করে উঠ্‌ল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে তর্জ্জনী তুলে রাণী বল্লে, নন্‌কু চলা যাও!—

আমি বল্লুম, আপনি রাগ করবেন না—নিষেধ যখন আছে তখন আমিই চলে যাচ্চি।

মক্ষি কম্পিত স্বরে বল্লে, না আপনি যাবেন না—ঘরে আসুন।

এ ত অনুরোধ নয়, এ হুকুম। আমি ঘরে এসে চৌকিতে বসে একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগ্‌লুম। মক্ষি একটা

কাগজের টুক্‌রোয় পেন্সিল দিয়ে কি লিখে বেহারাকে ডেকে বল্লে, বাবুকে দিয়ে এসো।

আমি বল্লুম, আমাকে মাপ করবেন, ধৈর্য্য রাখ্‌তে পারিনি— দরোয়ানটাকে মেরেচি।

মক্ষি বল্লে, বেশ করেচেন।

কিন্তু ও বেচারার ত কোনো দোষ নেই—ও ত কর্ত্তব্য পালন করেচে।

এমন সময় নিখিল ঘরে ঢুক্‌ল। আমি দ্রুত চৌকি থেকে উঠে তার দিকে পিঠ করে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

মক্ষি নিখিলকে বল্লে, আজ নন্‌কু দরোয়ান সন্দীপবাবুকে অপমান করেচে।

নিখিল এম্‌নি ভালোমানুষের মত আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, "কেন?" যে আমি আর থাক্‌তে পারলুম না। মুখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালুম। ভাবলুম, সাধুলোকের সত্যের বড়াই স্ত্রীর কাছে টেঁকে না, যদি তেমন স্ত্রী হয়।

মক্ষি বল্লে, সন্দীপবাবু বৈঠকখানায় আস্‌ছিলেন সে ওঁর পথ আটক করে বল্লে, হুকুম নেই।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলে, কার হুকুম নেই?

মক্ষি বল্লে, তা কেমন করে বল্‌ব?

রাগে ক্ষোভে মক্ষির চোখ দিয়ে জল পড়ে-পড়ে আর কি!

দরোয়ানকে নিখিল ডেকে পাঠালে। সে বল্লে, হুজুর, আমার ত কসুর নেই। হুকুম তামিল করেচি।

কার হুকুম?

বড় রাণীমা মেজ রাণীমা আমাকে ডেকে বলে দিয়েচেন।

ক্ষণকালের জন্যে সবাই আমরা চুপ করে রইলুম।

দরোয়ান চলে গেলে মক্ষি বল্লে, নন্‌কুকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

নিখিল চুপ করে রইল। আমি বুঝলুম ওর ন্যায়বুদ্ধিতে খট্‌কা লাগ্‌ল। ওর খট্‌কার আর অন্ত নেই।

কিন্তু বড় শক্ত সমস্যা! সোজা মেয়ে ত নয়। নন্‌কুকে ছাড়ানোর উপলক্ষে জায়েদের উপর অপমানের শোধ তোলা চাই।

নিখিল চুপ করেই রইল। তখন মক্ষির চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগ্‌ল। নিখিলের ভালোমানুষির পরে তার ঘৃণার আর অন্ত রইল না।

নিখিল কোনো কথা না বলে উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

পরদিন সেই দরোয়ানকে দেখা গেল না। খবর নিয়ে শুন্‌লুম, তাকে নিখিল মফস্বলের কোন্ কাজে নিযুক্ত করে পাঠিয়েচে— দরোয়ানজির তাতে লাভ বই ক্ষতি হয়নি।

এইটুকুর ভিতরে নেপথ্যে কত ঝড় বয়ে গেছে সে ত আভাসে বুঝতে পারচি। বারে বারে কেবল এই কথাই মনে হয়। নিখিল অদ্ভুত মানুষ, একেবারে সৃষ্টিছাড়া!

এর ফল হল এই যে এর পরে কিছুদিন মক্ষি রোজই বৈঠকখানায় এসে বেহারাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ করতে আরম্ভ করলে—কোনোরকম প্রয়োজনের কিম্বা আকস্মিকতার ছুতোটুকু পর্য্যন্ত রাখ্‌লে না।

এমনি করেই ভাবভঙ্গী ক্রমে আকার ইঙ্গিতে, অস্পষ্ট ক্রমে

স্পষ্টতায় জমে উঠ্‌তে থাকে। এ যে ঘরের বউ, বাইরের পুরুষের পক্ষে একেবারে নক্ষত্রলোকের মানুষ। এখানে কোনো বাঁধা পথ নেই।

এই পথহীন শূন্যের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে টানাটানি জানাজানি, অদৃশ্য হাওয়ায়-হাওয়ায় সংস্কারের পর্দ্দা একটার পর আর-একটা উড়িয়ে দিয়ে কোন্ এক সময়ে একেবারে উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝখানে এসে পৌঁছন,—সত্যের এ এক আশ্চর্য্য জয়যাত্রা।

সত্য নয় ত কি! স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের যে মিলের টান, সেটা হল একটা বাস্তব জিনিষ; ধূলোর কণা থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারা পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ তার পক্ষে; আর মানুষ তাকে কতকগুলো বচন দিয়ে আড়ালে রাখতে চায়, তাকে ঘরগড়া বিধি নিষেধ দিয়ে নিজের ঘরের জিনিষ করে' বানাতে বসেছে। যেন সৌরজগৎকে গলিয়ে জামাইয়ের জন্যে ঘড়ির চেন্ করবার ফরমাস। তারপরে বাস্তব যেদিন বস্তুর ডাক শুনে জেগে ওঠে, মানুষের সমস্ত কথার ফাঁকি একমুহূর্ত্তে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আপনার জায়গায় এসে দাঁড়ায় তখন ধর্ম্ম বল বিশ্বাস বল কেউ কি তাকে ঠেকাতে পারে? তখন কত ধিক্কার, কত হাহাকার, কত শাসন—কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে কি শুধু মুখের কোথায়? সে ত জবাব দেয় না, সে শুধু নাড়া দেয়, সে যে বাস্তব।

তাই চোখের সাম্‌নে সত্যের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখ্‌তে আমার ভারি চমৎকার লাগ্‌চে। কত লজ্জা, কত ভয়, কত

দ্বিধা,—তাই যদি না থাক্‌বে তবে সত্যের রস রইল কি? এই যে পা কাঁপ্‌তে থাকা, এই যে থেকে-থেকে মুখ ফেরানো, এ বড় মিষ্টি; আর, এই ছলনা, শুধু অন্যকে নয়, নিজেকে। বাস্তবকে যখন অবাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তখন ছলনা তার প্রধান অস্ত্র। কেননা বস্তুকে তার শত্রুপক্ষ লজ্জা দিয়ে বলে, তুমি স্থূল। তাই, হয় তাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে থাকতে, নয় মায়া আবরণ পরে বেড়াতে হয়। যে রকম অবস্থা তাতে সে জোর করে বল্‌তে পারে না যে, হাঁ আমি স্থূল, কেননা আমি সত্য, আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্লজ্জ, নির্দ্দয়,—যেমন নির্লজ্জ নির্দ্দয় সেই প্রচণ্ড পাথর যা বৃষ্টির ধারায় পাহাড়ের উপর থেকে লোকালয়ের মাথার উপরে গড়িয়ে এসে পড়ে, তার পরে যে বাঁচুক্ আর যে মরুক্!

আমি সমস্তই দেখ্‌তে পাচ্চি। ঐ যে পর্দ্দা উড়ে-উড়ে পড়চে, ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্চি প্রলয়ের রাস্তায় যাত্রার সাজসজ্জা চল্‌চে; —ঐ যে লাল ফিতেটুকু ছোট্টো এতটুকু, রাশি রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্চে, ওযে কালবৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা; ঐ যে পাড়ের এতটুকু ভঙ্গী, ঐ যে জ্যাকেটের এতটুকু ইঙ্গিত আমি যে স্পষ্ট অনুভব করচি তার উত্তাপ। অথচ এসব আয়োজন অনেকটা অগোচরে হচ্চে এবং অগোচরে থাক্‌চে, যে করচে সেও সম্পূর্ণ জানে না।

কেন জানে না? তার কারণ, মানুষ বরাবর বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে-দিয়ে বাস্তবকে স্পষ্ট করে জানবার এবং মানবার উপায় নিজের হাতে নষ্ট করেছে। বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে। তাই

মানুষের তৈরি রাশি-রাশি ঢাকাঢুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে তাকে নিজের কাজ করতে হয়—এই জন্যে তার গতিবিধি জান্‌তে পারিনে, অবশেষে হঠাৎ যখন সে একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে তখন তাকে আর অস্বীকার করবার জো থাকে না। মানুষ তাকে সয়তান বলে বদ্‌নাম দিয়ে তাড়াতে চেয়েচে, এই জন্যেই সাপের মূর্ত্তি ধরে' স্বর্গোদ্যানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে, আর কানে-কানে কথা কয়েই মানবপ্রেয়সীর চোখ ফুটিয়ে দিয়ে তাকে বিদ্রোহী করে তোলে; তার পর থেকে আর আরাম নেই, তার পরে মরণ আর কি!

আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আস্‌চে এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠ্‌চে। যা চাই সে খুব কাছে আস্‌বে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতে ছাড়ব না—মাঝখানে যা-কিছু আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে ধূলোয় লুটবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই ত আনন্দ, এই ত বাস্তবের তাণ্ডব নৃত্য—তার পরে মরণ বাঁচন, ভালো মন্দ, সুখ দুঃখ তুচ্ছ তুচ্ছ তুচ্ছ!

আমার মক্ষিরাণী স্বপ্নের ঘোরেই চল্‌চে—সে জানেনা কোন্ পথে চল্‌চে। সময় আসবার আগে তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি যে কিছুই লক্ষ্য করিনে এইটে জানানোই ভালো। সেদিন আমি যখন খাচ্ছিলুম মক্ষিরাণী আমার মুখের দিকে একরকম করে তাকিয়ে ছিল, একেবারে ভুলে গিয়েছিল এই চেয়ে থাকার অর্থটা কি। আমি হঠাৎ একসময়ে

তার চোখের দিকে চোখ তুল্‌তেই তার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। আমি বল্লুম, আপনি আমার খাওয়া দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। অনেক জিনিষ লুকিয়ে রাখ্‌তে পারি কিন্তু আমার ঐ লোভটা পদে পদে ধরা পড়ে। তা দেখুন, আমি যখন নিজের হয়ে লজ্জা করিনে তখন আপনি আমার হয়ে লজ্জা করবেন না।

সে ঘাড় বেঁকিয়ে আরো লাল হয়ে উঠে বল্‌তে লাগ্‌ল, না, না, আপনি—

আমি বল্লুম, আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালবাসে—ঐ লোভের উপর দিয়েই ত মেয়েরা তাদের জয় করে। আমি লোভী তাই বরাবর মেয়েদের কাছ থেকে আদর পেয়ে-পেয়ে আজ আমার এমন দশা হয়েছে যে, আর লজ্জার লেশমাত্র নেই। অতএব আপনি একদৃষ্টে অবাক্ হয়ে আমার খাওয়া দেখুন না, আমি কিচ্ছু কেয়ার করিনে। এই ডাঁটাগুলির প্রত্যেকটিকে চিবিয়ে একেবারে নিঃসত্ব করে ফেলে দেব তবে ছাড়ব—এই আমার স্বভাব।

আমি কিছুদিন আগে আজকাল্‌কার দিনের একখানি ইংরিজি বই পড়ছিলুম তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে। সেইটে আমি ওদের বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিলুম। একদিন দুপুর বেলায় আমি কি জন্যে সেই ঘরে ঢুকেই দেখি মক্ষিরাণী সেই বইটা হাতে করে নিয়ে পড়চে—পায়ের শব্দ পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটার উপর আরেকটা বই চাপা দিয়ে উঠে পড়ল। যে বইটা চাপা দিল সেটা লংফেলোর কবিতা।

আমি বল্লুম, দেখুন আপনারা কবিতার বই পড়তে লজ্জা পান কেন আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। লজ্জা পাবার কথা পুরুষের, কেননা, আমরা কেউবা এটর্ণি, কেউবা এঞ্জিনিয়ার; আমাদের যদি কবিতা পড়তেই হয় তাহলে অর্দ্ধেকরাত্রে দরজা বন্ধ করে পড়া উচিত। কবিতার সঙ্গেই ত আপনাদের আগাগোড়া মিল। যে বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি করেচেন তিনি যে গীতিকবি, —জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে বসে "ললিতলবঙ্গলতা"য় হাত পাকিয়েচেন।

মক্ষিরাণী কোনো জবাব না দিয়ে হেসে লাল হয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই আমি বল্লুম, না, সে হবেনা—আপনি বসে বসে পড়ুন। আমি একখানা বই ফেলে গিয়েছিলুম সেটা নিয়েই দৌড় দিচ্চি।

আমার বইখানা টেবিল থেকে তুলে নিলুম। বল্লুম, ভাগ্যে এ বই আপনার হাতে পড়েনি তাহলে আপনি হয়ত আমাকে মারতে আস্‌তেন।

মক্ষি বল্লে, কেন?

আমি বল্লুম, কেননা, এ কবিতার বই নয়। এতে যা আছে সে একেবারে মানুষের মোটা কথা, খুব মোটা করেই বলা, কোনোরকম চাতুরী নেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল এ বইটা নিখিল পড়ে।

একটুখানি ভ্রূকুঞ্চিত করে মক্ষি বল্‌লে, কেন বলুন দেখি?

আমি বল্লুম, ও যে পুরুষ মানুষ, আমাদেরই দলের লোক। এই স্থূল জগৎটাকে ও কেবলি ঝাপ্‌সা করে দেখ্‌তে চায় সেই

জন্যেই ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধে। আপনি ত দেখচেন সেই-জন্যেই আমাদের স্বদেশী ব্যাপারটাকে ও লংফেলোর কবিতার মত ঠাউরেছে—যেন ফি-কথায় মধুর ছন্দ বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে এইরকম ওর মৎলব। আমরা গন্থের গদা নিয়ে বেড়াই, আমরা ছন্দ ভাঙার দল।

মক্ষি বল্লে, স্বদেশীর সঙ্গে এ বইটার যোগ কি ?

আমি বল্লুম, আপনি পড়ে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবেন। কি স্বদেশ কি অন্য সব বিষয়েই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চল্‌তে চায়, তাই পদে পদে মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি বাধে, তখন ও স্বভাবকে গাল দিতে থাকে;—কিছু-তেই একথাটা ও মান্‌তে চায় না যে, কথা তৈরি হবার বহু আগেই আমাদের স্বভাব তৈরি হয়ে গেছে—কথা থেমে যাবার বহু পরেও আমাদের স্বভাব বেঁচে থাক্‌বে।

মক্ষি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল তার পরে গম্ভীরভাবে বল্লে, স্বভাবের চেয়ে বড় হতে চাওয়াটাই কি আমাদের স্বভাব নয় ?

আমি মনে মনে হাস্‌লুম—ওগো ও রাণী, এ তোমার আপন বুলি নয়, এ নিখিলেশের কাছে শেখা। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ, প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বভাবের রসে দিব্যি টস্‌টস্‌ করচ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুনেছ অমনি তোমার সমস্ত রক্তমাংস সাড়া দিতে সুরু করেছে—এতদিন এরা তোমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখ্‌তে পারবে কেন ? তুমি যে জীবনের আগুনের তেজে শিরায় শিরায় জ্বলচ আমি কি জানিনে ? তোমাকে সাধুকথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখ্‌বে আর কতদিন ?

আমি বল্লুম, পৃথিবীতে দুর্ব্বল লোকের সংখ্যাই বেশি ; তারা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঐ রকমের মন্ত্র দিন রাত পৃথিবীর কানে আউড়ে-আউড়ে সবল লোকের কান খারাপ করে দিচ্চে। স্বভাব যাদের বঞ্চিত করে কাহিল করে রেখেচে তারাই অন্যের স্বভাবকে কাহিল করবার পরামর্শ দেয়।

মক্ষি বল্লে, আমরা মেয়েরাও ত দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের ষড়যন্ত্রে আমাদেরও ত যোগ দিতে হবে।

আমি হেসে বল্লুম, কে বল্লে দুর্ব্বল ? পুরুষ মানুষ তোমাদের অবলা বলে স্তুতিবাদ করে-করে তোমাদের লজ্জা দিয়ে দুর্ব্বল করে রেখেছে। আমার বিশ্বাস তোমরাই সবল। তোমরা পুরুষের মন্ত্রে-গড়া দুর্গ ভেঙে ফেলে ভয়ঙ্করী হয়ে মুক্তি লাভ করবে এ আমি লিখে পড়ে দিচ্চি। বাইরেই পুরুষরা হাঁক-ডাক করে বেড়ায় কিন্তু তাদের ভিতরটা ত দেখচ তারা অত্যন্ত বদ্ধ জীব। আজ পর্য্যন্ত তারাই ত নিজের হাতে শাস্ত্র গড়ে নিজেকে বেঁধেছে, নিজের ফুঁয়ে এবং আগুনে মেয়ে জাতকে সোনার শিকল বানিয়ে অন্তরে-বাইরে আপনাকে জড়িয়েছে। এমনি করে নিজের ফাঁদে নিজেকে বাঁধবার অদ্ভুত ক্ষমতা যদি পুরুষের না থাকৃত তাহলে পুরুষকে আজ ধরে রাখত কে ? নিজের তৈরি ফাঁদই পুরুষের সব চেয়ে বড় উপাস্য দেবতা। তাকেই পুরুষ নানা রঙে রাঙিয়েচে, নানা সাজে সাজিয়েচে, নানা নামে পূজো দিয়েচে। কিন্তু মেয়েরা ? তোমরাই দেহ দিয়ে মন দিয়ে পৃথিবীতে রক্তমাংসের বাস্তবকে চেয়েচ, বাস্তবকে জন্ম দিয়েচ, বাস্তবকে পালন করেচ।

মক্ষি শিক্ষিত মেয়ে, সহজে তর্ক করতে ছাড়ে না,—সে বল্লে,

তাই যদি সত্যি হত তাহলে পুরুষ কি মেয়েকে পছন্দ করতে পারত ?

আমি বল্লুম, মেয়েরা সেই বিপদের কথা জানে—তারা জানে পুরুষ জাতটা স্বভাবত ফাঁকি ভালোবাসে সেই জন্যে তারা পুরুষের কাছ থেকেই কথা ধার করে ফাঁকি সেজে পুরুষকে ভোলাবার চেষ্টা করে। তারা জানে খাদ্যের চেয়ে মদের দিকেই স্বভাবমাতাল পুরুষ জাতটার ঝোঁক বেশি, এই জন্যেই নানা কৌশলে নানা ভাবে-ভঙ্গীতে তারা নিজেকে মদ বলেই চালাতে চায়, আসলে তারা যে খাদ্য সেটা যথাসাধ্য গোপন করে রাখে। মেয়েরা বস্তুতন্ত্র, তাদের কোনো মোহের উপকরণের দরকার করে না—পুরুষের জন্যেই ত যত রকম-বেরকম মোহের আয়োজন। মেয়েরা মোহিনী হয়েছে নেহাৎ দায়ে পড়ে।

মক্ষি বল্লে, তবে এ মোহ ভাঙতে চান কেন ?

আমি বল্লুম, স্বাধীনতা চাই বলে। দেশেও স্বাধীনতা চাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধেও স্বাধীনতা চাই। দেশ আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব সেই জন্যে আমি কোনো নীতিকথার ধোঁয়ায় তাকে এতটুকু আড়াল করে দেখতে পারব না—আমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, তুমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেই জন্যে মাঝখানে কেবল কতকগুলো কথা ছড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষকে দুর্গম দুর্বোধ করে তোলার ব্যবসায় আমি একটুও পছন্দ করিনে।

আমার মনে ছিল যে-লোক ঘুমতে ঘুমতে চল্‌চে তাকে হঠাৎ চমকিয়ে দেওয়া কিছু নয়। কিন্তু আমার স্বভাবটা যে দুর্দ্দাম, ধীরে সুস্থে চলা আমার চাল নয়। জানি যে কথা সেদিন বললুম

তার ভঙ্গীটা তার সুরটা বড় সাহসিক—জানি এরকম কথার প্রথম আঘাত কিছু দুঃসহ—কিন্তু মেয়েদের কাছে সাহসিকেরই জয়। পুরুষরা ভালোবাসে ধোঁয়াকে, আর মেয়েরা ভালোবাসে বস্তুকে—সেই জন্যেই পুরুষ পূজো করতে ছোটে তার নিজের আইডিয়ার অবতারকে, আর মেয়েরা তাদের সমস্ত অর্ঘ্য এনে হাজির করে প্রবলের পায়ের তলায়।

আমাদের কথাটা ঠিক যখন গরম হয়ে উঠতে চলেচে এমন সময় আমাদের ঘরের মধ্যে নিখিলের ছেলেবেলাকার মাষ্টার চন্দ্রনাথবাবু এসে উপস্থিত। মোটের উপরে পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই ছিল কিন্তু এই সব মাষ্টারমশায়দের উৎপাতে এখান থেকে বাস ওঠাতে ইচ্ছে করে। নিখিলেশের মত মানুষ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সংসারটাকে ইস্কুল বানিয়ে রেখে দিতে চায়। বয়স হল তবু ইস্কুল পিছন-পিছন চল্‌ল, সংসারে প্রবেশ করলে সেখানেও ইস্কুল এসে ঢুক্‌ল। উচিত, মরবার সময়ে ইস্কুলমাষ্টারটিকে সহমরণে টেনে নিয়ে যাওয়া। সেদিন আমাদের আলাপের মাঝখানে অসময়ে সেই মূর্ত্তিমান ইস্কুল এসে হাজির। আমাদের সকলেরই ধাতের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা করে আছে বোধ করি। আমি যে এ-হেন দুর্ব্বৃত্ত আমিও কেমন থমকে গেলুম। আর আমাদের মক্ষি,—তার মুখ দেখেই মনে হল সে এক মুহূর্ত্তেই ক্লাসের সব চেয়ে ভালো ছাত্রী হয়ে একেবারে প্রথম সারে গম্ভীর হয়ে বসে গেল—তার হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল পৃথিবীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একটা দায় আছে। এক-একটা মানুষ রেলের পয়েণ্টস্‌ম্যানের মত পথের ধারে বসে থাকে তারা ভাবনার গাড়িকে

খামকা এক লাইন থেকে আর এক লাইনে চালান করে দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন—"মাপ করবেন আমি"—কথাটা শেষ করতে না করতেই মক্ষি তাঁর পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে, আর বল্লে, মাষ্টার মশায়, যাবেন না, আপনি বসুন।—সে যেন ডুব-জলে পড়ে গেছে, মাষ্টারমশায়ের আশ্রয় চায়। ভীরু! কিম্বা আমি হয়ত ভুল বুঝচি। এর ভিতরে হয়ত একটা ছলনা আছে। নিজের দাম বাড়াবার ইচ্ছা। মক্ষি হয়ত আমাকে আড়ম্বর করে জানাতে চায় যে, তুমি ভাব্‌চ, তুমি আমাকে অভিভূত করে দিয়েচ! কিন্তু তোমার চেয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে আমি ঢের বেশি শ্রদ্ধা করি।—তাই কর না। মাষ্টারমশায়দের ত শ্রদ্ধা করতেই হবে। আমি ত মাষ্টারমশায় নই—আমি ফাঁকা শ্রদ্ধা চাইনে। আমি ত বলেইচি ফাঁকিতে আমার পেট ভরবে না;—আমি বস্তু চিনি।

চন্দ্রনাথবাবু স্বদেশীর কথা তুল্লেন। আমার ইচ্ছে ছিল তাঁকে এক-টানা বকে যেতে দেব, কোনো জবাব করব না। বুড়ো-মানুষকে কথা কইতে দেওয়া ভালো—তাতে তাদের মনে হয় তারাই বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্চে—বেচারারা জান্‌তে পারে না তাদের রসনা যেখানে চল্‌চে সংসার তার থেকে অনেক দূরে চল্‌চে। প্রথমে খানিকটা চুপ করেই ছিলুম—কিন্তু সন্দীপচন্দ্রের ধৈর্য্য আছে এ বদ্‌নাম তার পরম শত্রুরাও দিতে পারবে না। চন্দ্রনাথবাবু যখন বল্লেন, দেখুন আমরা কোনো দিনই চাষ করিনি, আজ এখনি হাতে হাতে ফসল পাব এমন আশা যদি করি তবে—

আমি থাকৃতে পারলুম না—আমি বল্লুম, আমরা ত ফসল চাইনে। আমরা বলি মাফলেষু কদাচন।

চন্দ্রনাথবাবু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন—বল্লেন, তবে আপনারা কি চান ?

আমি বল্লুম, কাঁটাগাছ—যার আবাদে কোন খরচ নেই।

মাষ্টারমশায় বল্লেন, কাঁটাগাছ পরের রাস্তা কেবল বন্ধ করে না, নিজের রাস্তাতেও সে জঞ্জাল।

আমি বল্লুম, ওটা হল ইস্কুলে পড়াবার নীতিবচন। আমরা ত খড়ি-হাতে বোর্ডে বচন লিখ্‌চিনে। আমাদের বুক জ্বলচে এখন সেইটেই বড় কথা—এখন আমরা পরের পায়ের তেলোর কথা মনে রেখেই পথে কাঁটা দেব—তারপরে যখন নিজের পায়ে বিঁধবে তখন না হয় ধীরে সুস্থে অনুতাপ করা যাবে। সেটা এমনিই কি বেশি ? মরবার বয়স যখন হবে তখন ঠাণ্ডা হবার সময় হবে, যখন জ্বলুনির বয়স তখন ছটফট করাটাই শোভা পায় !

চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বল্লেন, ছট্‌ফট্‌ করতে চান করুন কিন্তু সেইটেকেই বীরত্ব কিম্বা কৃতিত্ব মনে করে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েচে তারা ছটফট করেনি তারা কাজ করেচে। কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মত দেখে এসেচে তারাই আচম্‌কা ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে করে অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।

খুব একটা কড়া জবাব দেবার জন্যই যখন কোমর বেঁধে দাঁড়াচ্চি এমন সময় নিখিল এল। চন্দ্রনাথবাবু উঠে মক্ষির দিকে চেয়ে বল্লেন, আমি এখন যাই, মা, আমার কাজ আছে।

তিনি চলে যেতেই আমি আমার সেই ইংরিজি বইটা দেখিয়ে নিখিলকে বল্লুম, মক্ষিরাণীকে এই বইটার কথা বল্‌ছিলুম।

পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা মানুষকে মিথ্যের দ্বারা ফাঁকি দিতে হয় আর এই ইস্কুলমাষ্টারের চিরকেলে ছাত্রটিকে সত্যের দ্বারা ফাঁকি দেওয়াই সহজ। নিখিলকে জেনেশুনে ঠক্‌তে দিলেই তবে ও ভালো করে ঠকে। তাই ওর সঙ্গে দেখা-বিন্তির খেলাই ভালো খেলা।

নিখিল বইটার নাম পড়ে দেখে চুপ করে রইল। আমি বল্লুম, মানুষ নিজের এই বাসের পৃথিবীটাকে নানান্ কথা দিয়ে ভারি অস্পষ্ট করে তুলেচে, এই সব লেখকেরা ঝাঁটা হাতে করে উপরকার ধুলো উড়িয়ে দিয়ে ভিতরকার বস্তুটাকে স্পষ্ট করে তোলবার কাজে লেগেচে। তাই আমি বলছিলুম এ বইটা তোমার পড়ে দেখা ভালো।

নিখিল বল্লে আমি পড়েচি।

আমি বল্লুম, তোমার কি বোধ হয়?

নিখিল বল্লে এরকম বই নিয়ে যারা সত্য-সত্য ভাবতে চায় তাদের পক্ষে ভালো—যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে বিষ।

আমি বল্লুম, তার অর্থ টা কি?

নিখিল বল্লে, দেখ, আজকের দিনের সমাজে যে লোক এমন কথা বলে যে, নিজের সম্পত্তিতে কোনো মানুষের একান্ত অধিকার নেই সে যদি নির্লোভ হয় তবেই তার মুখে একথা সাজে—আর সে যদি স্বভাবতই চোর হয় তবে কথাটা তার মুখে ঘোর মিথ্যে। প্রবৃত্তি যদি প্রবল থাকে তবে এসব বইয়ের ঠিক মানে পাওয়া যাবে না।

আমি বল্লুম, প্রবৃত্তিই ত প্রকৃতির সেই গ্যাস্‌পোষ্ট, যার আলোতে আমরা এসব রাস্তার খোঁজ পাই। প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপড়ে ফেলেই দিব্য দৃষ্টি পাবার দুরাশা করে।

নিখিল বল্লে, প্রবৃত্তিকে আমি তখনি সত্য বলে মনে মানি যখন তার সঙ্গে-সঙ্গেই নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। চোখের ভিতরে কোনো জিনিষ গুঁজে দেখ্‌তে গেলে চোখ্‌কেই নষ্ট করি, দেখতেও পাইনে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিষ দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে সত্যকেও দেখতে পায় না।

আমি বল্লুম, দেখ নিখিল, ধর্ম্মনীতির সোনাবাঁধানো চষমার ভিতর দিয়ে জীবনটাকে দেখা তোমার একটা মানসিক বাবুগিরি,—এইজন্যেই কাজের সময় তুমি বাস্তবকে ঝাপ্‌সা দেখ, কোনো কাজ তুমি জোরের সঙ্গে করতে পার না।

নিখিল বল্লে, জোরের সঙ্গে কাজ করাটাকেই আমি কাজ করা বলিনে।

তবে ?

মিথ্যা তর্ক করে কি হবে ? এসব কথা নিয়ে নিস্ফল বক্‌তে গেলে এর লাবণ্য নষ্ট হয়।

আমার ইচ্ছে ছিল মক্ষি আমাদের তর্কে যোগ দেয়। সে এ পর্য্যন্ত একটি কথা না বলে চুপ করে বসে ছিল। আজ হয়ত আমি তার মনটাকে কিছু বেশি নাড়া দিয়েছি। তাই মনের মধ্যে দ্বিধা লেগে গেছে—ইস্কুল মাষ্টারের কাছে পাঠ বুঝে নেবার ইচ্ছে হচ্চে।

কি জানি আজকের মাত্রাটা অতিরিক্ত বেশি হয়েছে কিনা। কিন্তু বেশ করে নাড়া দেওয়াটা দরকার। চিরকাল যেটাকে অনড়

বলে মন নিশ্চিন্ত আছে সেটা যে নড়ে এইটিই গোড়ায় জানা চাই।

নিখিলকে বল্লুম, তোমার সঙ্গে কথা হল ভালই হল। আমি আর একটু হলেই এ বইটা মক্ষিরাণীকে পড়তে দিচ্ছিলুম।

নিখিল বল্লে, তাতে ক্ষতি কি? ও বই যখন আমি পড়েচি তখন বিমলই বা পড়বে না কেন? আমার কেবল একটি কথা বুঝিয়ে বলবার আছে। আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিষকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করচে—এমনিভাবে আলোচনা চল্‌চে যেন মানুষ পদার্থটা কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব, কিম্বা জীবতত্ত্ব, কিম্বা মনস্তত্ত্ব, কিম্বা বড়জোর সমাজতত্ত্ব—কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব-তত্ত্বকে নিয়ে সব-তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্চে, দোহাই তোমাদের, সে কথা ভুলোনা। তোমরা আমাকে বল, আমি ইস্কুল মাষ্টারের ছাত্র—আমি নই, সে তোমরা—মানুষকে তোমরা সায়ান্সের মাষ্টারের কাছ থেকে চিন্‌তে চাও—তোমাদের অন্তরাত্মার কাছ থেকে নয়।

আমি বল্লুম, নিখিল, আজকাল তুমি এমন উত্তেজিত হয়ে আছ কেন?

সে বল্লে, আমি যে স্পষ্ট দেখছি তোমরা মানুষকে ছোট করচ, অপমান করচ।

কোথায় দেখচ?

হাওয়ার মধ্যে, আমার বেদনার মধ্যে। মানুষের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড়, যিনি তাপস, যিনি সুন্দর, তাঁকে তোমরা কাঁদিয়ে মারতে চাও!

এ কী তোমার পাগলামির কথা!

নিখিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, দেখ সন্দীপ, মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে, তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি—জেনে শুনে, বুঝে সুঝে।

এই কথা বলেই সে ঘরের থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমি অবাক্ হয়ে তার এই কাণ্ড দেখচি এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দেখি টেবিলের উপর থেকে দুটো তিনটে বই মেঝের উপর পড়ল, আর মক্ষিরাণী ত্রস্তপদে আমার থেকে যেন একটু দূর দিয়ে চলে গেল।

অদ্ভুত মানুষ ঐ নিখিলেশ। ও বেশ বুঝেচে ওর ঘরের মধ্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেচে কিন্তু তবু আমাকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দেয় না কেন? আমি জানি ও অপেক্ষা করে আছে বিমল কি করে। বিমল যদি ওকে বলে তোমার সঙ্গে আমার জোড় মেলেনি তবেই ও মাথা হেঁট করে মৃদুস্বরে বল্‌বে, তাহলে দেখচি ভুল হয়ে গেছে। ভুলকে ভুল বলে মান্‌লেই সব চেয়ে বড় ভুল করা হয় একথা বোঝবার জোর ওর নেই। আইডিয়ায় মানুষকে যে কত কাহিল করে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল নিখিল। ও রকম পুরুষ মানুষ আর দ্বিতীয় দেখিনি—ও নিতান্তই প্রকৃতির একটা খেয়াল। ওকে নিয়ে একটা ভদ্র রকমের গল্প কি নাটক গড়াও চলে না, ঘর করা ত দূরের কথা।

তার পরে মক্ষি—বেশ বোধ হচ্ছে আজকে ওর ঘোর ভেঙে গেছে। ও যে কোন্ স্রোতে ভেসেচে হঠাৎ আজ সেটা বুঝতে

পেরেচে। এখন ওকে জেনে-শুনে হয় ফিরতে হবে নয় এগোতে হবে। তা নয়, এখন থেকে ও একবার এগোবে একবার পিছবে। তাতে আমার ভাবনা নেই। কাপড়ে যখন আগুন লাগে তখন ভয়ে যতই ছুটোছুটি করে আগুন ততই বেশি করে জ্বলে ওঠে। ভয়ের ধাক্কাতেই ওর হৃদয়ের বেগ আরো বেশি করে বেড়ে উঠবে। আরো ত এমন দেখেছি। সেই ত বিধবা কুসুম ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতেই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছিল। আর আমাদের হষ্টেলের কাছে যে ফিরিঙ্গি মেয়ে ছিল সে আমার উপরে রাগ করলে; এক-একদিন মনে হত সে আমাকে রেগে যেন ছিঁড়ে ফেলে দেবে। সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে যেদিন সে চিৎকার করে যাও যাও বলে আমাকে ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে—তারপরে যেমনি আমি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছি অমনি সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। ওদের আমি খুব জানি—রাগ বল, ভয় বল, লজ্জা বল, ঘৃণা বল এ সমস্তই জ্বালানি কাঠের মত ওদের হৃদয়ের আগুনকে বাড়িয়ে তুলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে জিনিষ এ আগুনকে সামলাতে পারে সে হচ্ছে আইডিয়াল। মেয়েদের সে বালাই নেই। ওরা পুণ্যি করে, তীর্থ করে, গুরু ঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হয়ে পড়ে' প্রণাম করে—আমরা যেমন করে আপিস করি—কিন্তু আইডিয়ার ধার দিয়ে যায় না।

আমি নিজের মুখে ওকে বেশি কিছু বলব না—এখনকার কালের কতকগুলো ইংরেজি বই ওকে পড়তে দেব। ও

ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারুক্ যে, প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডারন্। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড় জানাটা মডারন্ নয়। "মডারন্" এই কথাটার যদি আশ্রয় পায় তাহলেই ও জোর পাবে—কেননা ওদের তীর্থ চাই, গুরু ঠাকুর চাই, বাঁধা সংস্কার চাই—শুধু আইডিয়া ওদের কাছে ফাঁকা।

যাই হোক্, এ নাট্যটা পঞ্চম অঙ্ক পর্য্যন্ত দেখা যাক্। এ কথা জাঁক করে বল্‌তে পারব না আমি কেবলমাত্র দর্শক, উপরের তলায় রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্ছি। বুকের ভিতরে টান পড়চে, থেকে থেকে শিরগুলো ব্যথিয়ে উঠচে। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় যখন শুই তখন এতটুকু ছোঁওয়া, এতটুকু চাওয়া, এতটুকু কথা অন্ধকার ভর্ত্তি করে কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনের ভিতরটায় একটা পুলক ঝিলমিল্ করতে থাকে,—মনে হয় যেন রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে একটা সুরের ধারা বইচে।

এই টেবিলের উপরকার ফোটো-ষ্ট্যাণ্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষির ছবি ছিল। আমি সে ছবিটি খুলে নিয়েছিলুম। কাল মক্ষিকে সেই ফাঁকটা দেখিয়ে বল্লুম, কৃপণের কৃপণতার দোষেই চুরি হয় অতএব এই চুরির পাপটা কৃপণে চোরে ভাগাভাগি করে নেওয়াই উচিত। কি বলেন?

মক্ষি একটু হাস্‌লে, বল্লে, ও ছবিটা ত তেমন ভালো ছিল না।

আমি বল্লুম, কি করা যাবে? ছবি ত কোনো মতেই ছবির চেয়ে ভালো হয় না। ও যা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

মক্ষি একখানা বই খুলে তার পাতা ওল্‌টাতে লাগল। আমি বল্লুম, আপনি যদি রাগ করেন আমি ওর ফাঁকটা কোনো রকম করে ভরিয়ে দেব।

আজ ফাঁকটা ভরিয়েচি। আমার এ ছবিটা অল্প বয়সের—তখনকার মুখটা কাঁচা-কাঁচা, মনটাও সেই রকম ছিল। তখনও ইহকাল পরকালের অনেক জিনিষ বিশ্বাস করতুম। বিশ্বাসে ঠকায় বটে কিন্তু ওর একটা মস্ত গুণ এই, ওতে মনের উপর একটা লাবণ্য দেয়।

নিখিলের ছবির পাশে আমার ছবি রইল—আমরা দুই বন্ধু।

নিখিলেশের আত্মকথা

আগে কোনোদিন নিজের কথা ভাবিনি। এখন প্রায় মাঝে-মাঝে নিজেকে বাইরে থেকে দেখি। বিমল আমাকে কেমন চোখে দেখে সেইটে আমি দেখবার চেষ্টা করি। বড় গম্ভীর—সব জিনিষকে বড় বেশি গুরুতর করে দেখা আমার অভ্যাস।

আর কিছু না, জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো। তাই করেই ত চল্‌চে। সমস্ত জগতে আজ যত দুঃখ ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে আছে তাকে ত আমরা মনে-মনে ছায়ার মত মায়ার মত উড়িয়ে দিয়ে তবেই অনায়াসে নাচ্চি খাচ্চি—তাকে যদি এক মুহূর্ত্ত সত্য বলে ধরে রেখে দেখতে পারতুম তাহলে কি মুখে অন্ন রুচত, না, চোখে ঘুম থাক্‌ত?

কেবল নিজেকেই সেই সমস্ত উড়ে-যাওয়া ভেসে-যাওয়ার দলে দেখতে পারিনে। মনে করি কেবল আমারই দুঃখ জগতের বুকে

অনন্তকালের বোঝা হয়ে-হয়ে জমে উঠছে। তাই এত গম্ভীর—তাই নিজের দিকে তাকালে দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়!

ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখনা। সেখানে যুগ-যুগান্তের মহামেলায় লক্ষ-কোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে? সে তোমার স্ত্রী। কাকে বল তোমার স্ত্রী? ঐ শব্দটাকে নিজের ফুঁয়ে ফুলিয়ে তুলে দিনরাত্রি সাম্‌লে বেড়াচ্চ—জান, বাইরে থেকে একটা পিন্‌ ফুট্‌লেই এক মুহূর্ত্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্তটা চুপ্‌সে যাবে!

আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই! ও যদি বল্‌তে চায়, না, আমি আমিই—তখনই আমি বল্‌ব, সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী! ওটা কি একটা যুক্তি, ওটা কি একটা সত্য? ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায়?

স্ত্রী! এই কথাটিকে যে আমার জীবনের যা কিছু মধুর যা কিছু পবিত্র সব দিয়ে বুকের মধ্যে মানুষ করেচি, একদিনো ওকে ধূলোর উপর নামাইনি। ঐ নামে কত পূজার ধূপ, কত সাহানার বাঁশি, কত বসন্তের বকুল, কত শরতের শেফালি! ও যদি কাগজের খেলার নৌকার মত আজ হঠাৎ নর্দ্দমার ঘোলা জলে ডুবে যায় তাহলে সেই সঙ্গে আমার—

ঐ দেখ, আবার গাম্ভীর্য্য! কাকে বল্‌চ নর্দ্দমা, কাকে বল্‌চ ঘোলা জল? ওসব হল রাগের কথা। তুমি রাগ করবে বলেই জগতে এক জিনিষ আর হবে না। বিমল যদি তোমার না হয় ত সে তোমার নয়ই, যতই চাপাচাপি রাগারাগি করবে ততই ঐ

কথাটাই আরো বড় করে প্রমাণ হবে। বুক ফেটে যায় যে—তা যাক্। তাতে বিশ্ব দেউলে হবে না, এমন কি, তুমিও দেউলে হবে না। জীবনে মানুষ যা-কিছু হারায় তার সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি বড়—সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার পার আছে—এই জন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদ্‌তও না।

কিন্তু সমাজের দিক থেকে—সে সব কথা সমাজ ভাবুক্‌গে, যা করতে হয় করুক্। আমি কাঁদ্‌চি আমার আপন কান্না, সমাজের কান্না নয়। বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তাহলে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক্, আমি বিদায় হলুম।

দুঃখ ত আছেই। কিন্তু একটা দুঃখ বড় মিথ্যে হবে, সেটা থেকে নিজেকে যে করে পারি বাঁচাবই। কাপুরুষের মত একথা মনে করতে পারব না যে, অনাদরে আমার জীবনের দাম কমে গেল। আমার জীবনের মূল্য আছে—সেই মূল্য দিয়ে আমি কেবল আমার ঘরের অন্তঃপুরটুকু কিনে রাখবার জন্যে আসিনি। আমার যা বড় ব্যবসা সে কিছুতেই দেউলে হবে না, আজ এই কথাটা খুব সত্য করে ভাববার দিন এসেছে।

আজ যেমন নিজেকে তেমনি বিমলকেও সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখ্‌তে হবে। এতদিন আমি আমারই মনের কতকগুলি দামী আইডিয়াল দিয়ে বিমলকে সাজিয়ে ছিলুম। আমার সেই মানসী মূর্ত্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জায়গায় যে মিলছিল তা নয় কিন্তু তবু আমি তাকে পূজা করে এসেচি আমার মানসীর মধ্যে।

সেটা আমার গুণ নয়, সেইটেই আমার মহদ্দোষ। আমি

লোভী—আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম—বাইরের বিমল তার উপলক্ষ্য হয়ে পড়েছিল। বিমল যা সে তাইই—তাকে যে আমার খাতিরে তিলোত্তমা হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বকর্ম্মা আমারই ফরমাস খাট্‌চেন না কি ?

তাহলে আজ একবার আমাকে সমস্ত পরিষ্কার করে দেখে নিতে হবে। মায়ার রঙে যে সব চিত্র বিচিত্র করেচি সে আজ খুব শক্ত করে মুছে ফেলব। এতদিন অনেক জিনিষ আমি দেখেও দেখিনি। আজ একথা স্পষ্ট বুঝেছি বিমলের জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র ; বিমলের সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিল্‌তে পারে সে হচ্চে সন্দীপ। এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কেননা আজ আমার নিজের কাছেও নিজের বিনয় করবার দিন নেই। সন্দীপের মধ্যে অনেক গুণ আছে যা লোভনীয়, সেই গুণে আমাকেও এতদিন সে আকর্ষণ করে এসেছে কিন্তু খুব কম করেও যদি বলি তবু একথা আজ নিজের কাছে বল্‌তে হবে যে, মোটের উপর সে আমার চেয়ে বড় নয়। স্বয়ম্বর সভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মালা সন্দীপই পায় তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তাঁরই বিচার করলেন যিনি মালা দিলেন—আমার নয়। আজ আমার একথা অহঙ্কার করে বলা নয়। আজ নিজের মূল্যকে নিজের মধ্যে যদি একান্ত সত্য করে' না জানি, ও না স্বীকার করি, আজকেকার এই আঘাতকে যদি আমার এই মানবজন্মের চরম অপমান বলেই মেনে নিতে

হয়, তাহলে আমি আবর্জ্জনার মত সংসারের আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়ব, আমার দ্বারা আর কোনো কাজই হবে না।

অতএব আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক্। চেনাশোনা হল—বাহিরকেও বুঝলুম অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভ লোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল, তাই আমি। সে ত পঙ্গু আমি নয়, দরিদ্র-আমি নয়। সে অন্তঃপুরের রোগীর পথ্যে মানুষ-করা রোগা-আমি নয়, সে বিধাতার শক্তহাতের-তৈরি-আমি। যা তার হবার তা হয়ে গেছে, আর তার কিছুতে মার নেই।

এইমাত্র মাষ্টারমশায় আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে বল্লেন, নিখিল, শুতে যাও, রাত একটা হয়ে গেছে।

অনেক রাত্রে বিমল খুব গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে না পড়লে আমার পক্ষে শুতে যাওয়া ভারি কঠিন হয়। দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় কথাবার্ত্তাও চলে,—কিন্তু বিছানার মধ্যে একলা-রাতের নিস্তব্ধতায় তার সঙ্গে কি কথা বল্‌ব? আমার সমস্ত দেহমন লজ্জিত হয়ে ওঠে।

আমি মাষ্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখনো ঘুমোননি কেন?

তিনি একটু হেসে বল্লেন, আমার এখন ঘুমোবার বয়স গেছে, এখন জেগে থাকবার বয়স।

এই পর্য্যন্ত লেখা হয়ে শুতে যাব-যাব করচি এমন সময়ে আমার জানলার সামনের আকাশে শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেল—আর তারি মধ্যে থেকে একটি বড় তারা

জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল। আমার মনে হল আমাকে সে বল্‌লে, কত সম্বন্ধ ভাঙচে গড়চে স্বপ্নের মত—কিন্তু আমি ঠিক আছি;—আমি বাসরঘরের চিরপ্রদীপের শিখা; আমি মিলনরাত্রির চিরচুম্বন।

সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত বুক ভরে উঠে মনে হল—এই বিশ্ববস্তুর পর্দ্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখ্‌লুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধূলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখনি বলি আয়নাটা আমারই করে নিই, বাক্সর ভিতর ভরে রাখি, তখনি ছবি সরে যায়। থাক্‌ না, আমার আয়নাতেই বা কি, আর ছবিতেই বা কি! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট্‌ রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখ্‌চে।

একটা সয়তান অন্ধকারের কোণে দাঁড়িয়ে বল্‌চে এসব তোমার ছেলেভোলানো কথা। তা হোক্‌ না, ছেলেকে ত ভোলাতেই হবে—লক্ষ ছেলে, কোটি ছেলে, ছেলের পর ছেলে—কত ছেলের কত কান্না! এত ছেলেকে কি মিথ্যে দিয়ে ভোলানো চলে? আমার প্রেয়সী আমাকে ঠকাবে না—সে সত্য, সে সত্য—এই জন্যে বারে-বারে তাকে দেখ্‌লুম, বারে-বারে তাকে দেখ্‌ব—ভুলের ভিতর দিয়েও তাকে দেখেচি, চোখের জলের ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়েও তাকে দেখা গেল। জীবনের হাটের ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখেচি, হারিয়েচি, আবার দেখেচি, মরণের ফুকরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাকে দেখব। ওগো নিষ্ঠুর, আর পরিহাস

কোরো না—যে পথে তোমার পায়ের চিহ্ন পড়েছে, যে বাতাসে তোমার এলোচুলের গন্ধ ভরে আছে এবার যদি তার ঠিকানা ভুল করে থাকি তবে সেই ভুলে আমাকে চিরদিন কাঁদিয়ো না। ঐ ঘোম্‌টা-খোলা তারা আমাকে বল্‌চে, না, না, ভয় নেই, যা চিরদিন থাকবার তা চিরদিনই আছে।

এইবার দেখে আসি আমার বিমলকে,—সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে না জাগিয়ে তার ললাটে একটি চুম্বন রেখে দিই। সেই চুম্বন আমার পূজার নৈবেদ্য। আমার বিশ্বাস মৃত্যুর পরে আর সবই ভুলব, সব ভুল, সব কান্না—কিন্তু এই চুম্বনের স্মৃতির স্পন্দন কোনো একটা জায়গায় থেকে যাবে—কেননা, জন্মের পর জন্মে এই চুম্বনের মালা যে গাঁথা হয়ে যাচ্চে সেই প্রেয়সীর গলায় পরানো হবে বলে।

এমন সময়ে আমার ঘরের মধ্যে আমার মেজো ভাজ এসে ঢুক্‌লেন। তখন আমাদেব পাহারার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজ্‌ল।

ঠাকুরপো, তুমি করচ কি? লক্ষ্মী ভাই, শুতে যাও—তুমি নিজেকে এমন করে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে দেখ্‌তে পারিনে!

এই বল্‌তে বল্‌তে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়তে লাগ্‌ল।

আমি একটি কথাও না বলে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে শুতে গেলুম।

বিমলার আত্মকথা

গোড়ায় কিছুই সন্দেহ করিনি, ভয় করিনি; আমি জানতুম দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করচি। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কি প্রচণ্ড

উল্লাস! নিজের সর্ব্বনাশ করাই নিজের সব চেয়ে আনন্দ এই কথা সেদিন প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম।

জানিনে, হয়ত এমনি করেই একটা অস্পষ্ট আবেগের ভিতর দিয়ে এই নেশাটা একদিন আপনিই কেটে যেত। কিন্তু সন্দীপ বাবু যে থাক্‌তে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুল্লেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, তাঁর চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হয়ে আমার পায়ে ধরে। অথচ তার মধ্যে এমন একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছার জোর, যেন সে নিষ্ঠুর ডাকাতের মত আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।

আমি সত্য কথা বল্‌ব এই দুর্দ্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়-মূর্ত্তি দিনরাত আমার মনকে টেনেছে। মনে হতে লাগ্‌ল বড় মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া! তাতে কত লজ্জা, কত ভয়, কিন্তু বড় তীব্র মধুর সে!

আর কৌতূহলের অন্ত নেই,—যে মানুষকে ভাল করে জানিনে, যে মানুষকে নিশ্চয় করে পাব না, যে মানুষের ক্ষমতা প্রবল, যে মানুষের যৌবন সহস্রশিখায় জ্বলচে, তার ক্ষুব্ধ কামনার রহস্য—সে কি প্রচণ্ড, কি বিপুল! এ ত কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। যে সমুদ্র বহুদূরে ছিল, পড়া বইয়ের পাতায় যার নাম শুনেচি মাত্র—এক ক্ষুধিত বন্যায় মাঝখানের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে, যেখানে খিড়কির ঘাটে আমি বাসন মাজি, জল তুলি, সেইখানে আমার পায়ের কাছে ফেনা এলিয়ে দিয়ে তার অসীমতা নিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল!

আমি গোড়ায় সন্দীপ বাবুকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম

কিন্তু সে ভক্তি গেল ভেসে—তাঁকে শ্রদ্ধাও করিনে, এমন কি, তাঁকে অশ্রদ্ধাই করি। আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। এও আমি, প্রথমে না হোক্, ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পেরেচি যে সন্দীপের মধ্যে যে জিনিষটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্য মাত্র।

তবু আমার এই রক্তে-মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওরই হাতে বাজতে লাগ্‌ল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে,—কিন্তু বীণা ত বাজ্‌ল। আর সেই সুরে যখন আমার দিনরাত্রি ভরে উঠ্‌ল তখন আমার আর দয়ামায়া রইল না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজ, আর তোমার যা কিছু আছে সব মজিয়ে দাও এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন, আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে বল্‌তে লাগ্‌ল।

এ কথা আর বুঝতে বাকি নেই যে আমার মধ্যে একটা কিছু আছে যেটা—কি বল্‌ব! যার জন্যে মনে হয় আমার মরে যাওয়াই ভালো।

মাষ্টার মশায় যখন একটু ফাঁক পান আমার কাছে এসে বসেন। তাঁর একটা শক্তি আছে তিনি মনটাকে এমন একটা শিখরের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন যেখান থেকে নিজের জীবনের পরিধিটাকে এক মুহূর্ত্তেই বড় করে দেখতে পাই—বরাবর যেটাকে সীমা বলে মনে করে এসেচি তখন দেখি সেটা সীমা নয়।

কিন্তু কি হবে! আমি অমন করে দেখতেই চাই নে। যে নেশায় আমাকে পেয়েচে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক্ এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারিনে। সংসারের

দুঃখ ঘটুক, আমার মধ্যে আমার সত্য পলে-পলে কালো হয়ে মরুক্ কিন্তু আমার এই নেশা চিরকাল টিঁকে থাক্ এই ইচ্ছা যে কিছুতেই ছাড়াতে পারচিনে। আমার ননদ মুনুর স্বামী যখন মদ খেয়ে মুনুকে মারত, তারপরে মেরে অনুতাপে হাউ হাউ করে কাঁদত, শপথ করে বল্‌ত আর কখনো মদ ছোঁব না, আবার তার পর দিন সন্ধ্যাবেলাতেই মদ নিয়ে বসত—দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে ঘৃণায় জ্বলত। আজকে দেখি আমার মদ খাওয়া যে তার চেয়ে ভয়ানক—এ মদ কিনে আন্‌তে হয় না, গ্লাসে ঢাল্‌তে হয় না —রক্তের ভিতর থেকে আপ্‌না-আপনি তৈরি হয়ে উঠচে। কি করি! এম্‌নি করেই কি জীবন কাট্‌বে?

এক একবার চম্‌কে উঠে আপনার দিকে তাকাই আর ভাবি আমি আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন—এক সময়ে হঠাৎ দেখতে পাব এ-আমি সত্য নয়। এযে ভয়ানক অসংলগ্ন, এর যে আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নেই—এযে, মায়া যাদুকরের মত কালো কলঙ্ককে ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে রঙীন করে তুলেচে। এযে কি হল, কেমন করে হল, কিছুই বুঝতে পারচি নে।

একদিন আমার মেজ জা এসে হেসে বল্লেন, আমাদের ছোট রাণীর গুণ আছে! অতিথিকে এত যত্ন, সে যে ঘর ছেড়ে এক তিল নড়তে চায় না। আমাদের সময়েও অতিথিশালা ছিল কিন্তু অতিথির এত বেশি আদর ছিল না—তখন একটা দস্তুর ছিল স্বামীদেরও যত্ন করতে হত। বেচারা ঠাকুরপো একাল ঘেঁষে জন্মেছে বলেই ফাঁকিতে পড়ে গেছে। ওর উচিত ছিল অতিথি হয়ে এ বাড়িতে আসা, তাহলে কিছুকাল টিকতে পারত—এখন

বড় সন্দেহ। ছোট রাক্কুসী, একবার কি তাকিয়ে দেখতেও নেই ওর মুখের ছিরি কি রকম হয়ে গেছে!

এ সব কথা একদিন আমার মনে লাগ্‌তই না; তখন ভাবতুম আমি যে ব্রত নিয়েছি এরা তার মানেই বুঝতে পারে না। তখন আমার চারিদিকে একটা ভাবের আব্রু ছিল—তখন ভেবেছিলুম আমি দেশের জন্য প্রাণ দিচ্চি আমার লজ্জা সরমের দরকার নেই।

কিছুদিন থেকে দেশের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনকার আলোচনা, মডারন্ কালের স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ, এবং অন্য হাজার রকমের কথা। তারই ভিতরে-ভিতরে ইংরিজি কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার আমদানি—সেই সমস্ত কবিতার মধ্যে এমন একটা সুর লাগানো চলচে যেটা হচ্ছে খুব মোটা তারের সুর। এই সুরের স্বাদ আমার ঘরে আমি এতদিন পাইনি—আমার মনে হতে লাগ্‌ল, এইটেই পৌরুষের সুর, প্রবলের সুর।

কিন্তু আজ আর কোনো আড়াল রইল না—কেন যে সন্দীপ বাবু দিনের পর দিন বিনা কারণে এমন করে কাটাচ্চেন, কেনই যে আমি যখন-তখন তাঁর সঙ্গে বিনা প্রয়োজনের আলাপ-আলোচনা করচি আজ তার কিছুই জবাব দেবার নেই।

তাই আমি সেদিন নিজের উপর, আমার মেজ জায়ের উপর, সমস্ত জগতের ব্যবস্থার উপর খুব রাগ করে বল্লুম, না, আমি আর বাইরের ঘরে যাব না—মরে গেলেও না।

দুদিন বাইরে গেলুম না। সেই দুদিন প্রথম পরিষ্কার করে বুঝলুম কত দূরে গিয়ে পৌঁচেছি। মনে হল যেন একেবারে

জীবনের স্বাদ চলে গেছে। যেন সমস্তই ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ঠেলে-ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হল কার জন্যে যেন আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে আছে—যেন সমস্ত গায়ের রক্ত বাইরের দিকে কান পেতে রয়েছে।

খুব বেশি করে কাজ করবার চেষ্টা করলুম। আমার শোবার ঘরের মেজে যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল—তবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালিয়ে সাফ করালুম। আলমারীর ভিতর জিনিষ-পত্র এক ভাবে সাজানো ছিল, সে সমস্ত বের করে ঝেড়ে ঝুড়ে বিনা প্রয়োজনে অন্য রকম করে সাজালুম। সেদিন নাইতে আমার বেলা দুটো হয়ে গেল। সেদিন বিকেলে চুল বাঁধা হল না, কোনোমতে এলোচুলটা পাকিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরটা গোছাবার কাজে লোকজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা গেল। দেখি ইতিমধ্যে ভাঁড়ারে চুরি অনেক হয়ে গেছে—তা নিয়ে কাউকে বক্‌তে সাহস হল না, পাছে একথা কেউ মনে-মনেও জবাব করে, এতদিন তোমার চোখ দুটো ছিল কোথা?

সেদিন ভূতে পাওয়ার মত এই রকম গোলমাল করে কাটল। তার পরদিনে বই পড়বার চেষ্টা করলুম। কি পড়লুম কিছুই মনে নেই—কিন্তু এক-একবার দেখি ভুলে অন্যমনস্ক হয়ে বই-হাতে ঘুরতে ঘুরতে অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার রাস্তার জান্‌লার একটা খড়খড়ি খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। সেইখান থেকে আঙিনার উত্তর দিকে আমাদের বাইরের এক-সার ঘর দেখা যায়। তার মধ্যে একটা ঘর মনে হল আমার জীবন-সমুদ্রের ওপারে চলে গিয়েছে। সেখানে আর খেয়া বইবে না। চেয়ে আছি ত চেয়েই

আছি। নিজেকে মনে হল আমি যেন পশু´ দিনকার আমির ভূতের মত—সেই সব জায়গাতেই আছি তবুও নেই।

এক সময় দেখতে পেলুম, সন্দীপ একখানা খবরের কাগজ হাতে করে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম তাঁর মুখের ভাবে বিষম চাঞ্চল্য। এক-একবার মনে হতে লাগ্‌ল যেন উঠোনটার উপর বারান্দার রেলিংগুলোর উপর রেগে-রেগে উঠ্‌ছেন। খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—যদি পারতেন ত খানিকটা আকাশ যেন ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না। যেই আমি বৈঠকখানার দিকে যাব মনে করচি এমন সময় হঠাৎ দেখি পিছনে আমার মেজ জা দাঁড়িয়ে! "ওলো, অবাক করলি যে!"—এই কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। আমার বাইরে যাওয়া হল না।

পরের দিন সকালে গোবিন্দর মা এসে বল্লে, ছোটরাণীমা ভাঁড়ার দেবার বেলা হল।

আমি বল্লুম, হরিমতিকে বের করে নিতে বল্।—এই বলে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে জান্‌লার কাছে বসে বিলিতি শেলাইয়ের কাজ করতে লাগলুম। এমন সময়ে বেহারা এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বল্লে, সন্দীপ বাবু দিলেন।—সাহসের আর অন্ত নেই;—বেহারাটা কি মনে করলে? বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগ্‌ল। চিঠি খুলে দেখি তাতে কোন সম্ভাষণ নেই, কেবল এই কটি কথা আছে,—"বিশেষ প্রয়োজন। দেশের কাজ। সন্দীপ"

রইল আমার শেলাই পড়ে। তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটুখানি চুল ঠিক করে নিলুম। সাড়িটা যেমন ছিল

তাই রইল, জ্যাকেট একটা বদল করলুম। আমি জানি তাঁর চোখে এই জ্যাকেট্‌টির সঙ্গে আমার একটি বিশেষ পরিচয় জড়িত আছে।

আমাকে যে-বারান্দা দিয়ে বাইরে যেতে হবে তখন সেই বারান্দায় বসে আমার মেজো জা তাঁর নিয়মমত সুপুরি কাটচেন। আজ আমি কিছুই সঙ্কোচ করলুম না। মেজো জা জিজ্ঞাসা করলেন— বলি চলেচ কোথায়?

আমি বল্লুম, বৈঠকখানা ঘরে।

এত সকালে? গোষ্ঠলীলা বুঝি?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলুম। মেজো জা গান ধরলেন—

"রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে!
অগাধ জলের মকর যেমন,
ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনাদৃতা

১

দুইটি কন্যা ও তিনটি পুত্রের ভার স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিয়া হরমণি যখন চির অবসর গ্রহণ করিল, নীলু বড় ফাঁপরে পড়িয়া গেল। সে বেচারা ছাপাখানায় কাজ করিত, বেতন যাহা পাইত মাসে মাসে স্ত্রীর হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত, সামান্য ২০৲ টাকায় কি করিয়া এতগুলি প্রাণীর ভরণপোষণ সম্ভব তাহা তাহাকে একদিনও ভাবিতে হয় নাই। প্রত্যহ নিয়মিত ৯॥ টার সময় সে ডাক দিত, "বড় বৌ, ভাত বাড়, আমি নাইতে যাচ্ছি।" স্নান সারিয়া যেখানে হর পাখা হাতে ভাত আগলাইয়া মাছি তাড়াইতেছে বসিয়া গিয়া সপাসপ্ নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া পানটি হাতে লইয়া আপিসের দিকে চলিয়া যাইত। নীলুর খাওয়ার কোন কষ্ট ছিল না, মাছটি তরকারীটি যে সময়কার যা পাওয়া যাইত, নীলুর পাতে পড়িতই পড়িত, পরিবারের সকলেই তাহার মত রাজভোগে আছে সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না এবং মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকের যে আহার সম্বন্ধে অতিরিক্ত লোভ আছে এবং সেটা যে অত্যন্ত নিন্দনীয় সে কথা চাণক্যের শ্লোক মিশাইয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিত। হর চুপ করিয়া শুনিত; স্বামী চলিয়া গেলে ছেলেগুলিকে খাওয়াইবার সময় তাহার চোখের জল সামলান দায় হইত। খোকা দুধ না হইলে আর ভাত খাইবে না; পটলা এখন খাইবে না, মার সঙ্গে খাইবে, মা

নিজের জন্য বড় মাছ লুকাইয়া রাখিয়াছে; টুলি বলে, বাবা কেন সব তরকারী খাইয়া ফেলে, আমাদের জন্যে একটুও রাখে না; রুচির সবে বিবাহ হইয়াছে সে মাকে ধমকায়, না খাওয়াইতে পারিবি ত শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিস্ না কেন? রুচি জানে না তাহার গহনায় ২॥০ ভরি সোনা কম পড়িয়াছিল, তাহা পূরণ করিতে না পারিলে তাহার শ্বশুর বধূকে স্থান দিতে পারিবে না। "লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, আজকের মত খাও, কাল দিদিমার বাড়ী যাব, কত সন্দেশ আনব, সব তোমাদের দেব"; এইরূপ এক-একদিন এক-এক ছলনা করিয়া ছেলেদের ভুলাইয়া নিজে যে হর ফ্যানের জলে ভাত চটকাইয়া নুন মাখিয়া খাইত তাহাতে তাহার তিলমাত্র দুঃখ ছিল না, সে কটাও নিজে না গিলিয়া যদি ছেলেদের দিতে পারিত তবেই তাহার আপশোষের নিবারণ হইত।

হরমণির ভায়েদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, কিন্তু সেখানে হাত পাতিয়া নিজের দৈন্য স্বীকার করিতে সে অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিত। রুচির বিবাহ মামাদের সাহায্যে হইয়াছে, আবার সে একা নয়, তার অন্য দুইটি সধবা বোনেরও তাহারি সমান অবস্থা, বিধবা বোনটি মার কাছেই থাকে; মা সকলকেই মাসে ২।৫ টাকা করিয়া দেন। টানাটানির সংসারে সে টাকা-কয়টি ছেলেদের অসুখ-বিসুখে ডাক্তারের ফিতে ও পথ্যতে কোথায় তলাইয়া যাইত। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, দুশ্চিন্তা ও অনাহারের ফল ফলিল—দারুণ যক্ষ্মা ধরিল, নিজে বুঝিতে পারিয়া একটি দিনের জন্যও স্বামীকে সে কথা জানায় নাই—জানাইতেও হইল না, নীলু একদিন আপিসের ফেরতা বাড়ী আসিয়া দেখিল কলেরায়

স্ত্রী আক্রান্ত। পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তারের দ্বারা সেদিন চিকিৎসা চলিল, পরদিন যখন মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল তখন শ্বশুরবাড়ী খবর পাঠাইল; ডাক্তার সঙ্গে লইয়া যখন ভাই আসিল, তখন হরমণির ছুটি হইয়া গিয়াছে।

২

চোরবাগানের ঘোষাল বাড়ীর কর্ত্রী রোগ ও বৃদ্ধ বয়সে অনেক শোকের তাড়নায় ভগ্নদেহা। সংসারের সমস্ত ভার বিধবা কন্যা শঙ্করীর উপর, মাতার পরিচর্য্যা হইতে খুঁটিনাটি কোন কাজটি সে অন্যকে করিতে দিত না এবং তার মত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে এমন কর্ম্মদক্ষ বধূও তাদের ঘরে ছিল না; যে দুটি ছিল তাহারা বিবাহ অবধি সেবা পাইয়াছে বলিয়া সেবা করিতে অনভ্যস্ত।

হরমণির মৃত্যুর পর শোকাকুলা জননীকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া শঙ্করী ভগ্নীপতির সংসার ঘাড়ে লইল। মাসীর সকল যত্ন ব্যর্থ করিয়া মাতৃদুগ্ধবঞ্চিত কোলের সন্তানটি উপযুক্ত খাদ্যাভাবে মায়ের অনুসরণ করিল। শঙ্করীরও রুগ্না মাতাকে ফেলিয়া অধিক দিন থাকিবার উপায় নাই। সে টাকার জোগাড় করিয়া অবিলম্বে কচিকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিল; এবং পটলা ও টুলুর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নীলুর এক দূরসম্পর্কীয়া গরীব আত্মীয়াকে নীলুর তরফ হইতে মাসিক ২৲ টাকা সাহায্য অঙ্গীকার করিয়া দেশ হইতে আনাইল। নীলু বিস্তর আপত্তি জানাইল যে সে নিজে খাইতে পায় না আবার এ এক পরের বোঝা সে কেমন করিয়া বহিবে। বরং শঙ্করী যদি টুলুকে সঙ্গে লইয়া যায়, নীলু

তাহা হইলে বাড়ী বিক্রয় করিয়া পটুলাকে লইয়া আপিসের কাছাকাছি মেসে গিয়া থাকে। কিন্তু এ কথায় শঙ্করী কান দিল না; এমনিইত সে পূজা আহ্নিকেরও সময় পায় না, ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও অবকাশ নাই, এর উপর আবার টুলিকে লইয়া গেলে ধকল ত বাড়িবেই, তাছাড়া ভ্রাতৃ-জায়ারাও বিশেষ সন্তুষ্ট হইবে না; ছোট মেয়ে, একটু বাল্‌সালেই মাও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবেন; সাত পাঁচ ভাবিয়া টুলির মুখের দিকে চাহিয়া চোখের জল সম্বরণ করিয়া শঙ্করী সেই দিনই মায়ের কাছে চলিয়া আসিল।

আষাঢ় মাস। যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়। রাস্তা ঘাট জলে ডুবিয়া গিয়াছে। কলিকাতার জনসমাকীর্ণ পথে লোক নাই, জায়গায়-জায়গায় আরোহীপূর্ণ ট্রাম চলৎশক্তিহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে; সাঁতার ছাড়া ভিন্ন গম্য স্থানে পৌছান অসম্ভব দেখিয়া যাত্রীরা কেহ ট্রাম কোম্পানিকে গালি দিয়া যৎকিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করিতেছে; কেহ বা কোন বছরে কোন সময়টিতে ঠিক এমনিতর বর্ষা নাবিয়াছিল তার দিন ক্ষণ লইয়া অপর একজনের সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া তুলিয়াছে; আর একজন সেই অতীত দিনে হাওয়ার বেগে ছিন্ন ছাতাটি হাতে লইয়া পান-ওয়ালার চালার নীচে আশ্রয় লইয়াছিল, বৃষ্টি কম পড়িতে খানিক দূর অগ্রসর হইয়া ট্রাম ধরিয়া টিকিট কিনিতে কোমরে হাত দিয়া দেখে পয়সার গেঁজেটি নাই, সেই করুণ কাহিনী শুনাইয়া অতীত লোকসানকে বর্ত্তমান আসর জমাইবার কাজে লাগাইতেছে।

প্রকৃতির এই নিষ্প্রয়োজন বাড়াবাড়িতে সকলকারি কাজে

একটা না একটা বাগ্‌ড়া পড়িয়াছে কেবল পাড়ার ডানপিঠে ছেলেগুলোর আনন্দের সীমা নাই। ঘোষালদের কিলু একখানা জলচৌকিতে বসিয়া পরমানন্দে নৌকা বাহিতেছিল, তার ছোট ভাই পানু আরো খানিক আগে মোড়ের মাথায় তারি মত সুশান্ত গুটিকতক ছেলেকে সাঁতার শিখাইতেছিল; সে দৌড়ে আসিয়া এক সময় দাদাকে খবর দিল, "ওরে পালা, পালা, নীলু পিসে গাড়ী করে আসছে, এখুনি দিদিমাকে বলে দেবে।" কলতলায় কাদা ধুইয়া পরিত্যক্ত ধুতি কোমরে আঁটিতে আঁটিতে দুটি ভাই উপরে হাজির হইয়া দেখিল, পিসিমা ফুলুরী ভাজিতেছেন, আর নীলু পিসের আগমনবার্ত্তা জানান হইল না।

৩

ঝড়ের বেগ কমিয়া গিয়াছে, বৃষ্টি ধরে-ধরে। শঙ্করী টুলুর হাত ধরিয়া একেবারে মায়ের ঘরে উপস্থিত হইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল, "দেখলে মা একবার কাণ্ড-খানা! বল্লে না, কইলে না, এমন দিনে মানুষে যখন কুকুর বেড়ালটা ঘরের বার করে না, হতচ্ছাড়া কি না এই এক ফোঁটা মেয়েকে লোকেদের নাচ্‌দরজায় নামিয়ে চলে গেল! ভাগ্যিস্ আজ সকাল সকাল কাপড় কাচ্‌তে গেছ্‌লুম, দেখি কলের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, মাথা দিয়ে যেন মা গঙ্গার স্রোত বইছে; ছুটে পানুর কাপড়খানা টেনে এনে পরিয়ে এই তোমার কাছে আন্‌ছি।"

মা। "তাত দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমি ঘাটের মড়া, আমাকে আর জ্বালাস্‌নে। বৌ কর্ত্তাদের জিজ্ঞেস করে যা ব্যবস্থা হয় কর্। হ্যাঁরে টুলি, বাপ্ কোথায় গেল?"

টুলি। "বাবা ডিল্লি, বালিতে কালা এচেচে তাই আমাকে মাচির কাছে যেতে বল্লে।"

শঙ্করী। "শুনেছিলুম তাদের আপিস দিল্লিতে উঠে যাবে তাই বুঝি বাড়ীখানা ভাড়া দিয়ে মেয়েটাকে এখানে রেখে পটলাকে নিয়ে চলে গেল। আচ্ছা বাপ্ যাহোক! সে ফেল্‌তে পারে, আমরা ত আর হরর পেটের মেয়ে ভাসিয়ে দিতে পারি না।

এই ছোট্ট চার বছরের মেয়েটি ঘোষাল-বাড়ীর মূর্ত্তিমতী অশান্তি-স্বরূপা হইয়া দাঁড়াইল। বসত বাড়ী ভাড়া দিয়া সেই যে নীলু ডুব মারিল তা দিল্লি গেল কি মক্কায় গেল কেহ কোন খবর পাইল না।

অল্প দিনেই বড় বউ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে যেদিন হইতে এই ছোটলোকের মেয়ে তাদের ঘরে আসিয়াছে সেদিন হইতে তার ছেলেমেয়েগুলি আর বাগ্ মানে না। পড়াশুনো করে না, দুপুর বেলায় ঐ মা খেগো মেয়েটার সঙ্গে দস্যিবৃত্তি করিয়া বেড়ায়। এরূপ অবস্থায় এ বাড়ীতে থাকা অসম্ভব। ছোট বউ বলে, খুকীর খাবার যতই সাবধানে রাখে কে ঢাকা খুলিয়া খাইয়া যায়, ছোট বাবুর গন্ধতৈল, এসেন্সের শিশি কে রোজ ভাঙ্গিয়া রাখিয়া দেয়; ছাদে কাপড় শুকাইতে দিলে বাছিয়া বাছিয়া দেশী কাপড়গুলির খুঁট্ কে দাঁতে করিয়া ছিঁড়িয়া দেয়; এসব অত্যাচার ঠাকুরঝির জন্যই হইয়াছে, তিনি আদরে আদরে মেয়েটার মাথা খাইতেছেন, মা কি আর কারো মরে না গা, তা বলিয়া কি সে যা খুসী করিবে? শঙ্করীর আদর মানে সে সময়মত টুলিকে ডাকিয়া দুবেলা খাওয়ায়, মামীদের অনুযোগ শুনিলেই তাকে কখনো কখনো ঘরে বন্ধ করিয়া শাস্তি দেয়, কখনো বা নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়া বুঝাইবার

চেষ্টা করে যে মামাতো ভাই বোনদের সহিত তার আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তারা যত খুসী দুষ্টামি করিতে পারে কিন্তু টুলিকে এই বয়স হইতেই শিশুসুলভ চঞ্চলতা দমন করিয়া, মামাদের অনুগ্রহে যে দুবেলা পেট ভরিয়া ভাত পাইতেছে সেজন্য মামীদের নিকট সর্ব্বদাই জোড়হাতে কৃতজ্ঞতা জানাইতে হইবে। টুলু ত সবই বোঝে! সে কখনো রাগিয়া ছোট দুটি হাতে প্রাণপণে মাসীর পিঠে কিল বর্ষণ করে, কখনো, "আমাকে মায়ের কাছে রেখে আয়, আর আমি তোদের বাড়ী থাক্‌ব না", বলিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে থাকে।

অনেক দিন ধরিয়া বড় বউয়ের সাধ শাশুড়ী-ননদ-হীন নিষ্কণ্টক সংসারের গৃহিণীপনা করে; পূজাবকাশে স্বামী বাড়ী আসিলে সে নানা তর্কযুক্তি দেখাইয়া স্বামীর সঙ্গে তার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। ধনীকন্যা ছোট বউও ঘন ঘন বাপের বাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করিল। টুলুর উপর দোষ চাপাইয়া দুই বধূ নিজের নিজের মনস্কামনা সাধিবার অবসর পাইলেন; লাভের মধ্যে সে বেচারী সকলকার চক্ষুশূল হইল।

৪

ভগবান যাদের কষ্ট দিয়াছেন রগড়াইয়া রগড়াইয়া তাদেরও দিন কাটিয়া যায়। মামারা টুলুর বিবাহ দিয়াছে। সে যেদিন শ্বশুরবাড়ী গেল সকলেই যেন পরিত্রাণ পাইল, যেন বাড়ীর অলক্ষ্মী বিদায় হইল, কেবল শঙ্করী বিছানায় শুইয়া বুকের উপর একটি ছোট কোমল হস্তস্পর্শের অভাবে চোখের জলে বালিশ ভাসাইয়া দিল। তার নারী-হৃদয়ের সুপ্ত মাতৃত্ব টুলুর স্পর্শে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে তার ছোট বালিশটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুমা খাইতে লাগিল আর ধীরে ধীরে তার উপর

হাত বুলাইতে লাগিল—যেন সে টুলির মাথায় হাত বুলাইতেছে। ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া টুলির কত মঙ্গল কামনা করিল কিন্তু দরবারে গরীব শঙ্করীর দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল। বিবাহের অনতিবিলম্বে ক্ষতবিক্ষতদেহা টুলুকে লইয়া তার শ্বশুর দিয়া গেল ও উঠানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, "এই তোমাদের মেয়ে রইল, আবার যদি ওমুখো হয় তা হলে এটুকুও আর রইবে না।"

শঙ্করী কিছু সুধাইল না। রক্তমাখা অচেতনপ্রায় বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া ক্ষতস্থানের রক্ত ধুইয়া জলপটি বাঁধিয়া দিল, মায়ের ঘর হইতে ওডিকলন আনিয়া মাথায় দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। একবার কেবল মাসীর দিকে চাহিয়া টুলি বলিল, "উঃ, মাসি, বড় ব্যথা!" বলিয়াই আবার চোখ বন্ধ করিল। রাত্রে জ্বরের ঘোরে সে ভুল বকিতে লাগিল। টুলুর সৎ-শাশুড়ীকে পাড়ার সকলে ভয় করিত ও বধূ আসিলে তার পরিণাম কল্পনা করিয়া অনেক সহৃদয়ার গায়ে কাঁটা দিত। কর্ত্তাকে গিন্নী নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইত, লোকে বলিত পাড়াগেঁয়ে মাগী কি ঔষধ করিয়া অত বড় ষণ্ডামার্ক পুরুষটাকে বশ করিয়াছে। বিবাহের পর টুলু বুঝিল কি খাইয়া শ্বশুর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে—গালি হইতে ঝাঁটা পর্য্যন্ত অভাগার কিছুই বাদ যাইত না। টুলু তার অংশ হইতে কিছু পাইলে তার ভাগ হালকা হইবে বলিয়া বৃদ্ধের কিছু আশা হইয়াছিল—কিন্তু দানে ন ক্ষয়ং যাতি, ভাগ করিয়াও বেগ কমিল না। বধূ আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠিকে ঝি ও বামনীর অনাবশ্যকতা বুঝিয়া গিন্নী তাদের বিদায় দিল। রান্না, বাসন-মাজা, ঘর-লেপা, জল-তোলা এইসকল সামান্য

কাজ যদি বধূর দ্বারা না হইবে ত লোকে ছেলের বিবাহ দেয় কেন? —টুলুকে দম দিবার সময় শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিত না।

সেদিন উপরের কলে জল নাই, প্রকাণ্ড এক মাটির কলসী করিয়া জল ভরিয়া আনিতে শাশুড়ী টুলিকে হুকুম করিল এবং বিলম্ব হইতেছে বলিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তার পিতার নানাপ্রকার সদগতি কামনা করিয়া যেই তাকেও যমালয়ে যাইবার পথনির্দ্দেশ করিবে অমনি হোঁচোট খাইয়া কলসীসমেত টুলু পড়িয়া গেল। কলসী ভাঙ্গিল দেখিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিয়া বারকতক চুলের মুঠি ধরিয়া টুলুর মাথা সিঁড়িতে ঠুকিয়া দিল এবং লাথির উপর লাথি মারিয়া তাকে একতলা অবধি গড়াইয়া দিল। টুলুর চীৎকারে শ্বশুর আসিলে তাকে মামার বাড়ী রাখিয়া আসিতে হুকুম করিল। হুকুম তামিল করিতে সে বিলম্ব করিল না।

আজ সকলে ভুলিয়া গেল যে টুলি তাদের কত অপ্রিয় ছিল। ছোটবাবু স্বয়ং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডাক্তার লইয়া আসিল ও নিজের হাতে ঔষধ পান করাইতে লাগিল। ছোট বউ খুকীকে ঘুম পাড়াইয়া শঙ্করীর হাতের পাখা কাড়িয়া লইয়া বাতাস দিতে লাগিল, টুলুর শয্যাপার্শ্বে মাদুর বিছাইয়া শঙ্করীকে শুইতে কত অনুরোধ করিল কিন্তু শঙ্করী টুলুর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির মত তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

তবু এবারও বিধাতার দয়া হইল না—টুলু বাঁচিয়া উঠিল। সংসারে যার স্থান এত সঙ্কীর্ণ যে পাশ ফিরিবারও জায়গা হয় না, তারই সেই অতি দুঃখের জায়গাটুকু খালি হইতে চায় না।

শ্রীমাধুরীলতা দেবী।

নব্য-দর্শন

(মুখপত্র)

সবুজপত্র-সম্পাদক-সমীপেষু,—

মহাশয়, আপনি আমাকে দর্শন সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আপনার অনুরোধ আজ্ঞাবিশেষ—সুতরাং শিরোধার্য্য। কিন্তু অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি আপনাদের পাঠকদের মনোরঞ্জনার্থ কি লিখিব? দর্শন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিবার আছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক পাঠকগণ অনেক কথা চান না—তাঁহারা চান নিখুঁৎ খাঁটি সত্য। পূর্ব্বেই প্রকাশ থাকে বৈজ্ঞানিক কলে কাটা কিম্বা ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মে বাঁধা নিখুঁৎ সত্য যোগাইতে আমি সম্পূর্ণ অপারগ। অবশ্য একথা শুনিয়া আপনারা অনেকেই ভ্রূকুঞ্চিত করিবেন। আপনাদের ভ্রূকুঞ্চন আমি বিলক্ষণ বুঝি। আপনারা অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর ধরিয়া "আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও" এই প্রার্থনা বা আব্দার দেবদেবী-গণের নিকট করিয়া আসিতেছেন। আপনারা অন্ধকারের মাধুর্য্য আর উপভোগ করিতে পারেন না—এমন কি গোধূলীর আলোছায়া আপনাদের নিকট বিসদৃশ ঠেকে। আপনারা চান কঠোর প্রচণ্ড সূর্য্যালোক—যে সূর্য্যালোকে আপনাদের আজন্ম-অন্ধ চক্ষু বিকশিত হইবে, আর সেই দিব্যচক্ষে মহাদেবের ন্যায় আপনারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নিরীক্ষণ করিবেন।

আমার মনের গড়ন কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমার আলোক

ভাল লাগে না—আমার ভাল লাগে অন্ধকার। আলোকে সমস্ত প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্ধকার সমস্ত লুকাইয়া রাখে, কাজেই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে ইচ্ছা হয় ও চেষ্টা জন্মে। আপনারা অনেকেই কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার উপাখ্যান পড়িয়াছেন। নচিকেতা অনেক চেষ্টা করিলেন "মৃত্যুর পর কি হয়?"—যমপ্রমুখাৎ এই প্রশ্নের একটি ছাঁকা উত্তর পাইতে। কিন্তু যম যদিও নচিকেতাকে সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। যদি যম নচিকেতার মনোরথ পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে আজ আমরা হিন্দুর দর্শন দেখিতে পাইতাম না। হয় ত বলিবেন, দর্শন পাইতাম না বটে—কিন্তু শান্তি পাইতাম। পাইতেন কি না, সে সম্বন্ধেও বিশেষ সন্দেহ আছে। কারণ এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে ignorance is bliss.

সত্যের অন্বেষণ দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু সত্য কি? অনেকের মতে আমাদের দেশের মুনিঋষিগণ বহুপূর্ব্বে সত্য আবিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের কর্ত্তব্য পুরাতনলিপি সমুদায় উদ্ধার করিয়া সেই পুরাতন সত্যের পুনরাবিষ্কার করা। নূতন সত্য আর কিছুই নাই। কাজেই নূতন করিয়া সত্য আবিষ্কারের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। আর যদি আপনি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন নূতন সত্য বাহির করেন, তাহাও পুরাতনের সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে। চলিত সাধুভাষায়, পুরাতন ও নূতনের সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে আপনার নূতন-আবিষ্কৃত সত্য জলাঞ্জলি দিতে হইবে। ফলকথা, ইহাঁদের বিশেষ চিন্তা একটি ধারাবাহী নদীবিশেষ।

নদীর স্রোত যেমন একটি নির্দ্দিষ্ট খাত ধরিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবমান্, চিন্তার স্রোতও সেইরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট খাত ধরিয়া সত্যের দিকে ধাবমান্। যতক্ষণ আপনি সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছেন, ততক্ষণ ভাল। কিন্তু যখনি আপনি সেই স্রোত ছাড়িয়া দক্ষিণে কি বামে পড়িলেন, অমনি বুঝিতে হইবে আপনি সত্য ছাড়িয়া মিথ্যায় হাবুডুবু খাইতেছেন।

যাঁহারা উপরোক্ত মত পোষণ করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, আমাদের দেশে পুরাকালে কোনো বিষয়েই সকলে একমত ছিল না। ধর্ম্ম, দর্শন, আইনকানুন—সর্ব্বত্রই নানা মুনির নানা মত। আজ আমরা ব্যক্তিগত পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ঐ প্রকার কৃত্রিম ঐক্যের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের ঐক্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু ঐক্যের নামে তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করেন নাই। তাহার প্রমাণ, চার্ব্বাকের নাস্তিক্যবাদ ও জড়বাদ, বৌদ্ধের নির্ব্বাণবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষবাদ, আর বেদান্তের অদ্বৈতবাদ। কালক্রমে বেদান্ত ছাড়া আর সমুদয় মত লুপ্তপ্রায়। আর আমাদের নিজেদের বিশ্বাস যে, বেদান্তই ভারতীয় চিন্তার শেষ কথা। ইহার ফলে আমরা স্বাধীন চিন্তার ইচ্ছা ও শক্তি হারাইতে বসিয়াছি। কারণ এখন বেদান্তই দেশের একমাত্র চিন্তাস্রোত, আর ব্যক্তিগত চিন্তা সেই স্রোতের সহিত মিলাইয়া একীভূত করিতে না পারিলেই আমাদের ভয় হয় মহা ভ্রম উপস্থিত। আমাদের বর্ত্তমান চিন্তাক্ষেত্রের অবস্থা আর মধ্য-

যুগে য়ুরোপের অবস্থা অনেকটা এক। সেকালের পণ্ডিতগণ Bible এবং Aristotle ছাড়া অন্য কিছু বুঝিতেন না বা জানিতেন না। এই দুয়ের সহিত যাহার মিল নাই তাহা চিন্তার বহির্ভূত। প্রায় পাঁচশত বৎসর ব্যাপিয়া পাশ্চাত্যজগতের চিন্তাস্রোত Bible এবং Aristotleএর চিন্তাস্রোতের সহিত মিলিয়া চলিল। শেষে একদিন Descartes, Bacon প্রভৃতি মনীষীগণ বুঝিলেন পুরাতনে আর মানবাত্মা তৃপ্ত হইবার নয়—নূতন আবিষ্কার, নূতন বিজ্ঞান, নূতন দর্শন, নূতন ধর্ম্মের প্রয়োজন। সেই দিনে য়ুরোপে চিন্তার এক নূতন ফোয়ারা ছুটিল, আর আজ সেই ফোয়ারা হইতে কত নূতন নদনদী উৎপন্ন হইয়া সেখানে প্রবাহিত হইতেছে।

আমাদের দেশেও কিছু কিছু পুরাতন বর্জ্জন করিয়া কিছু কিছু নূতন সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নূতন সৃষ্টি,—সমন্বয় নয়। আজকাল সমন্বয় কথাটি আমাদের বড় মনে ধরিয়াছে। আমরা নূতন পুরাতন, পূর্ব্ব পশ্চিম, সাকার নিরাকার, হিন্দু ব্রাহ্ম ইত্যাদি সকল বিষয়ের ও সকল পদার্থেরই যেন-তেন-প্রকারেণ সমন্বয়সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আমার বিশ্বাস ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সমন্বয়ের ন্যায় গুপ্ত শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। যেখানে উভয় পক্ষেই সমবল, সেখানেই সমন্বয় হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে ক্ষেত্রে একজন অপর অপেক্ষা হীনবল, সে ক্ষেত্রে সমন্বয় হয় না—সেখানে একজন অপরকে গ্রাস করে। আগে নূতন সৃষ্টি করুন, নূতনকে নিজের চিন্তার ও জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া সবল করিয়া তুলুন, তারপর পুরাতনের সহিত নূতনের বিবাদভঞ্জন করিয়া সমন্বয়সাধন করিবেন। তাহাতে নূতনের সংস্পর্শে পুরাতন

সজীবতর হইয়া উঠিবে, আর নূতন, পুরাতনের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া মহৎ হইতে মহত্তর হইতে চেষ্টা করিবে।

আমরা প্রায়ই নদীর সহিত চিন্তার তুলনা দিয়া থাকি। উপমাটি একেবারে সঠিক্ না হইলেও বড় উপযোগী। নদীর সহিত চিন্তার তুলনা দিয়া আমরা চিন্তার একত্ব নির্দ্দেশ করি। নদী বিভিন্ন জলকণার সমষ্টি হইলেও তাহার একটি একত্ব আছে। সেইরূপে চিন্তা বহু চিন্তাকণার সমষ্টি হইলেও তাহার একটি একত্ব আছে। এই একত্বের গুণে আমরা ত্রিকালের মধ্য দিয়া নানা রূপরস সত্ত্বেও বিশ্বের একত্ব অল্পাধিক পরিমাণে সৃষ্টি করি ও উপলব্ধি করি। অনেকের বিশ্বাস একত্ব একটি নিত্য পদার্থ বা পদার্থের গুণ, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ওটি আমাদের মনগড়া চিন্তার সৃষ্টি। আজ যে আমি এক, ইহার কারণ আমার নিজের চিন্তার ও চেষ্টার সাহায্যে আমার মানসিক ও ভৌতিক জীবনের একত্ব অল্পাধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে আমি সমর্থ হইয়াছি। আজ যে হিন্দুসমাজ এক, তাহার কারণ যুগযুগান্তর হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নানা উপায় ও কৌশলে বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও অল্পাধিক পরিমাণে হিন্দুসমাজের সেই একত্ব সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আর আমার বিশ্বাস বৈদান্তিক বা mystic বিশ্বের যে একত্ব নির্দ্দেশ করেন, সে একত্বও অল্পাধিক পরিমাণে চিন্তার সৃষ্টি। যিনি যোগী তিনি নিজের চেষ্টায় ও সাধনায় সেই একত্ব সৃষ্টি করেন—আবার সেই একত্বই ধ্যান করেন।

চিন্তায় যে সৃজনী বা আত্মাশক্তি আছে, তাহা আমাদের বড় একটা মনে থাকে না। জনসাধারণের বিশ্বাস মানুষের মন ছাপার কলমাত্র

—Printing-press—যাহা আছে তাহাই প্রকাশ বা পরিষ্কার করে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা ভাবি বহির্জ্জগৎ এক দিকে, মানুষের মন অপর দিকে; আর এই দুয়ের মিলন বা সামঞ্জস্যই সত্য। কাজেই যখনই আমরা এই সামঞ্জস্য দেখিতে না পাই, তখনই বলি—মিথ্যা, ভ্রম ইত্যাদি। ইহারই নাম বস্তুতন্ত্রতা (Realism)। আজ বিজ্ঞানচর্চ্চার গুণে আমাদের দেশে বস্তুতন্ত্রতার প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম, দর্শন, Art, সর্ব্বত্রই আমরা "বাস্তবের" অন্বেষণে ব্যস্ত। যদি কোন লেখক কি ভাবুক বাস্তবের পরিবর্ত্তে নিজের মনের কথা কিছু বলেন কি লেখেন, অমনি আমরা তাহা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, যাহাকে আমরা "বাস্তব" বলি, তাহাও অল্পাধিক পরিমাণে চিন্তার সৃষ্টি,—আর আজ যাহাকে আমরা "অবাস্তব" বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি, তাহাও হয় ত কালক্রমে আমাদের চিন্তার ও জীবনের সঙ্গে একীভূত হইয়া "বাস্তব" হইয়া উঠিবে।

মানব-চিন্তার ইতিহাস পাঠে বুঝা যায় যে, চিন্তার দুইটি শত্রু—একটী বস্তুতন্ত্রতা (Realism), আর একটী ন্যায়শাস্ত্র (Logic); এ দুয়ের সহিত মনের কি সম্বন্ধ ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। পত্রান্তে এই মাত্র বলিয়া রাখিলাম যে, যতদিন ইহারা ভৃত্যের ন্যায় চিন্তার হুকুম সরবরাহ করে, ততদিন ইহারা বিশেষ উপযোগী,—কিন্তু যখন ভৃত্যের পদ ছাড়িয়া ইহারা চিন্তার মনিব হইবার উপক্রম করে, তখনই আমার ভয় হয়, মানবাত্মার শেষদশা সন্নিকট। ইতি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্যে খেলা

জগৎ-বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোড্যাঁ—যিনি নিতান্ত জড় প্রস্তরের দেহ থেকে অসংখ্য জীবিত-প্রায় দেব দানব কেটে বার করেছেন, তিনিও শুনতে পাই, যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে, আঙ্গুলের টিপে মাটির পুতুল তয়ের করে থাকেন। এই পুঁতুল গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা। শুধু রোড্যাঁ কেন, পৃথিবীর শিল্পীমাত্রেই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। যিনি গড়্‌তে জানেন, তিনি শিবও গড়্‌তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড় বড় শিল্পীদের তফাৎ এইটুকু যে তাঁদের হাতে এক করতে আর হয় না। সম্ভবতঃ এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুসি-তাই কর্‌বার যে অধিকার আছে, ইতর-শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হতে দেবতারা মধ্যে মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে কেউ আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্ত্তবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়। অথচ এ কথা অস্বীকার কর্‌বার যো নেই যে, যখন এ জগতে দশটা দিক আছে তখন সেই সব-দিকেই গতায়াত কর্‌বার প্রবৃত্তিটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মন উঁচুতেও উঠতে চায় নীচুতেও নাম্‌তে চায়, বরং সত্য কথা বল্‌তে গেলে, সাধারণ লোকের মন, স্বভাবতই যেখানে আছে তারি চার পাশে ঘুরে বেড়াতে চায়—উড়্‌তেও চায় না, ডুবতেও চায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে, সাধারণ লোক্‌কে, কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি কাব্য,—সকল রাজ্যেই

অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাক্‌তেই পরামর্শ দেয়। একটু উঁচুতে না চড়্‌লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন-মন আকর্ষণ কর্‌তে পারিনে। বেদীতে না বসলে, আমাদের উপদেশ কেউ মানে না; রঙ্গমঞ্চে না চড়লে আমাদের অভিনয় কেউ দেখে না; আর কাষ্ঠমঞ্চে না দাঁড়ালে আমাদের বক্তৃতা কেউ শোনে না। সুতরাং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে থাকবার লোভে আমরাও অগত্যা চব্বিশ ঘণ্টা টংয়ে চড়ে থাক্‌তে চাই, কিন্তু পারিনে। অনেকের পক্ষে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত উচ্চস্থানে ওঠবার চেষ্টাটাই মহাপতনের কারণ হয়। এ সব কথা বলবার অর্থ এই যে, কষ্টকর হলেও, আমাদের পক্ষে অবশ্য মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে ছোটখাট গলিঘুঁচিতে খেলাচ্ছলে প্রবেশ কর্‌বার যে অধিকার তাঁদের আছে সে অধিকারে আমরা কেন বঞ্চিত হব? গান কর্‌তে গেলেই যে সুর তারায় চড়িয়ে রাখ্‌তে হবে, কবিতা লিখ্‌তে হলেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রখর ভাব প্রকাশ কর্‌তে হবে, এমন কোন নিয়ম থাকা উচিত নয়। শিল্পরাজ্যে খেলা করবার প্রবৃত্তির ন্যায় অধিকারও বড়-ছোট সকলেরি সমান আছে। এমন কি, একথা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না যে, এ পৃথিবীতে একমাত্র খেলার ময়দানে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ নাই। রাজার ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের ছেলেরও খেলায় যোগ দেবার অধিকার আছে। আমরা যদি একবার সাহস করে কেবলমাত্র খেলা কর্‌বার জন্য সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করি, তাহ'লে নির্ব্বিবাদে সে জগতের রাজা-রাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সেক্ষেত্রে উপস্থিত হলেই নিম্ন-শ্রেণীতে পড়ে যেতে হবে।

২

লেখকেরাও অবশ্য দশের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন, বাহবা না পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন—কেননা, তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ সামাজিক জীব, বাদবাকী সকলে কেবলমাত্র পারিবারিক। বিশ্ব মানবের মনের সঙ্গে নিত্য নূতন সম্বন্ধ পাতানোই হচ্ছে কবি-মনের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম। এমন কি, কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতি-কবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তি স্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই মর্ম্মকথা, হাজার লোকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ কর্‌তে পারে। কিন্তু উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চবাচ্য না কর্‌লে যে জনসাধারণের নয়নমন আকর্ষণ করা যায় না এমন কোন কথা নেই। সাহিত্য-জগতে যাঁদের খেলা করবার প্রবৃত্তি আছে, সাহস আছে ও ক্ষমতা আছে—মানুষের নয়নমন আকর্ষণ করবার সুযোগ বিশেষ করে তাঁদের কপালেই ঘটে। মানুষে যে খেলা দেখ্‌তে ভালবাসে তার পরিচয় ত আমরা এই জড় সমাজেও নিত্যই পাই। টাউনহলে বক্তৃতা শুন্‌তেই বা ক জন যায়—আর গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখ্‌তেই বা ক জন যায়? অথচ এ কথাও সত্য যে, টাউনহলের বক্তৃতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ—ভারত-উদ্ধার—আর গড়ের মাঠের খেলোয়াড়দের ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশূন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীন। আসল কথা এই যে, মানুষের দেহমনের সকলপ্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ—কেননা তা উদ্দেশ্যহীন। মানুষে যখন খেলা করে তখন সে এক আনন্দ ব্যতীত অপর কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই, কিন্তু উপরি-পাওনার আশা

আছে তার নাম খেলা নয়, জুয়াখেলা ;—ও ব্যাপার সাহিত্যে চলে না, কেননা ধর্ম্মতঃ জুয়াখেলা লক্ষ্মীপূজার অঙ্গ, সরস্বতীপূজার নয়। এবং যেহেতু খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয়, সে কারণ তা কারও নিজস্ব হতে পারে না। এ আনন্দে সকলেরি অধিকার সমান।

সুতরাং সাহিত্যে খেলা-কর্‌বার অধিকার যে আমাদের আছে, শুধু তাই নয়—স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের যুগপৎ সাধনের জন্য মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে ফলের চাষ কর্‌তে ব্রতী হন, যিনি কোনরূপ কার্য্য-উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন, তিনি গীতের মর্ম্মও বোঝেন না, গীতার ধর্ম্মও বোঝেন না ; কেননা খেলা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। স্বয়ং ভগবান বলেছেন যদিচ তাঁর কোনই অভাব নেই তবুও তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ—সে সৃজনের মূলে কোনও অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই—সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্ত্তি এবং তার ফুল আনন্দ। এককথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত—কেননা জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ।

৩

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া,—কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে, পরের জন্যে খেলনা তৈরি কর্‌তে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন কর্‌তে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ

নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্ম্মের জয়ঢাক, এই সব জিনিষে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্য-রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। কারণ পাঠকসমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙ্গে ফেলে;—সে প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক কি জর্ম্মাণীরই হোক, দুদিন ধরে তা কারও মনোরঞ্জন করতে পারে না। আমি জানি যে পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শঃই বেদনা বোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছু নেই—কেননা কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ তারি নাম বেদনা। সে যাই হোক, পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন—তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যা-সুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব্ব মিলন সঙ্ঘটিত হ'ত; কেননা Knowledge এবং Art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। "বিদ্যাসুন্দর" খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা—সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত; তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্ততঃ জহুরির কাছে। অপর পক্ষে এ যুগে পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ—সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে, আমাদের অতি সস্তা খেলনা গড়তে হবে—নইলে তা বাজারে কাট্‌বে না। এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সঙ্গত। অতএব সাহিত্যে আর যাই করনা কেন, পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা কোরোনা।

৪

তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া? অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হলে যে খেলার সময় আসে না। এ ত সকলেরি জানা কথা। কিন্তু সাহিত্য রচনা যে আত্মার লীলা এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত নন। সুতরাং, শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্ম্মকর্ম্ম যে এক নয়—এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপর পক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে;—কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো; সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো। কাব্য যে সংবাদপত্র নয়—এ কথা সকলেই জানেন। তৃতীয়তঃ অপরের মনের অভাব পূর্ণ করবার উদ্দেশেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে—কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দ দান করা—শিক্ষা দান করা নয়—একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি আদিতে মুনি ঋষিদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন,—জনগণের জন্য নয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বড় বড় মুনিঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন তার প্রমাণ—তাঁরা কুশী-লবকে তাদের যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি কৌপিন পর্য্যন্ত,

পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্য হিসাবে যে অমর, এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে পঠনে আনন্দ উপভোগ করে তার একমাত্র কারণ আনন্দের ধর্ম্মই এই যে তা সংক্রামক। অপর পক্ষে লাখে একজনও যে যোগ-বাশিষ্ট রামায়ণের ছায়া মাড়ান না তার কারণ এ বস্তু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জন্যে নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুলমাষ্টারির ভার নেয়নি। এতে দুঃখ করবার কোনও কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাষ্টারেরা এ কালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।

কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে তার জন্য দায়ী—এ যুগের স্কুল এবং তার মাষ্টার। কাব্য—পড়বার ও বোঝবার জিনিষ কিন্তু স্কুল-মাষ্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুল-মাষ্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে যাক্ চার চক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমরা কাব্যের রূপ দেখতে পাইনে—শুধু তার গুণ শুনি। টীকা ভাষ্যের প্রসাদে আমরা কাব্যসম্বন্ধে সকল নিগূঢ়তত্ত্ব জানি কিন্তু সে যে কি বস্তু তা চিনি নে। আমাদের শিক্ষকদের প্রসাদে আমাদের এ জ্ঞান লাভ হয়েছে যে পাথুরেকয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র—অপর পক্ষে হীরক ও কাচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, অপরটির মানুষের হাতে; এবং এ উভয়ের ভিতর এক দা-কুমড়ার সম্বন্ধ ব্যতীত অপর কোনও সম্বন্ধ নেই। অথচ এত জ্ঞান সত্ত্বেও আমরা

সাহিত্যে কাচকে হীরা এবং হীরাকে কাচ বলে নিত্য ভুল করি এবং হীরা ও কয়লাকে এক-শ্রেণীভুক্ত কর্‌তে তিলমাত্রও দ্বিধা করি নে;—কেননা ওরূপ করা যে সঙ্গত তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের মুখস্থ আছে। সাহিত্য—শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উল্টো। কারণ কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা এবং তারপরে তার শবচ্ছেদ করা এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা এবং প্রচার করা। এই সব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়,—কাউকেও শিক্ষা দেওয়ায় নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়। বিচারের সাহায্যে এইমাত্রই প্রমাণ করা যায়। তবে বস্তু যে কি, তার জ্ঞান অনুভূতি-সাপেক্ষ, তর্ক সাপেক্ষ নয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে— এ কথার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয় তাহলে কোন সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পষ্টতর করা আমার অসাধ্য।

এই সব কথা শুনে আমার জনৈক শিক্ষাভক্ত বন্ধু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়। এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, সরস্বতীকে কিণ্ডার-গার্টেনের শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত কর্‌বার জন্য, যতদূর শিক্ষা-বাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার আমি আজও ততদূর হতে পারিনি।

বীরবল।

টীকা টিপ্পনী

বীরবল যে বলেচেন আনন্দ দেওয়া এবং মনোরঞ্জন করা এক জিনিষ নয় একথা আমাদের ভেবে দেখবার সময় হয়েচে।

এ কথাটির মূলসূত্র যদি আমরা চাই ত সে হচ্চে "নায়মাত্মা-বলহীনেন লভ্যঃ।" দুর্ব্বল যে সে আপনাকে পায় না। আপনাকে সত্য করে পাওয়াই আনন্দ। আপনার সেই সত্যে পৌছন জোরের কথা। চিন্তায় বল, ভাবে বল, কর্ম্মে বল যে মানুষ সেই সত্যকে আশ্রয় করে চলে সে কখনো লোকের মুখ তাকায় না। সে আপনার আনন্দে নিন্দা ও মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করে না।

কিন্তু "আপনার আনন্দ" "আপনার সত্য" একথা বল্লেই কোনো কোনো বিজ্ঞ লোক বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা বলেন তুমি কি আপনার খেয়ালটাকেই ভাব-সাগরের কর্ণধার করেচ? যদি তা করে থাক তা হলে পারে যাবে না, তলিয়ে যাবে।

এই সব বিজ্ঞ লোকেরা কানে কিছু কম শোনেন। খুব চীৎকার করে যদি বলা যায় খেয়ালের কথা মোটেই হয় নি, তবু তাঁরা সেটা কানে নেন না। তাঁরা কথা-কাটাকাটি করতে এত মত্ত হয়ে ওঠেন যে, কথাটা যে কি সে দিকে তাঁদের হুঁসই থাকে না।

আনন্দ খেয়াল নয়, সত্য খেয়াল নয়।

তবে যে তুমি বলচ "আপনার আনন্দ" "আপনার সত্য"?

তার অর্থ হচ্চে এই যে, যে জিনিষটা বিশ্বের তাকে অপরোক্ষ ভাবে আপনার করে পেলে তবেই তাকে পাওয়া হয়। বাইরে তাকে জড় করতে থাকলে পাওয়াই হয় না। এইজন্যে আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রে বলে আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখলে তবেই তাঁকে সত্য করে দেখা হয়।

বিশ্বের সত্য বিশ্বের আনন্দকে তাঁরাই আপনার করে পান যাঁরা শক্তিশালী প্রতিভাশালী। এইজন্য তাঁদের কাজের উৎস, ভাবের উৎস আপনার মধ্যেই। সে উৎস তাঁদের সৃষ্ট নয়, কারণ, তা জগতের; সে উৎস তাঁদের আপনার, কারণ, সে তাঁদের অন্তরের।

উৎস যদি নিজের মধ্যে না থাকে, আমার বেহারা যদি ভাঁড়ে করে তৃষ্ণার জল তুলে আনে, তবে সে এক বিষম ভাবনা। কি জানি সে হয় ত সরকারী নর্দ্দমা থেকে আনে, কিম্বা হয় ত যে কুণ্ডর উপর তার ভরসা, দিন না যেতেই সেটা শুকিয়ে যাবে।

বিশ্বের আনন্দ যার নিজের মধ্যে, সেই ত প্রতিভাশালী লোক; আনন্দকে সেই নির্ভয়ে প্রচার করে থাকে। এই কাজটিতে অনেক সময়ে দশের সঙ্গে তার লাঠালাঠি বেধে যায়। কারণ দস্তুরের বাঁধা বরাদ্দের উপর যাদের ভরসা, খাঁটি আনন্দকে তারা চিনতে পারে না। দস্তুরের ছাপ দেখে তবেই তারা জিনিষের দাম যাচাই করে। তারা তক্‌মা-পরা দরোয়ান-জি, দেউড়িতে বসে আছে; যদি সত্যের দোহাই দিয়ে তাদের বলা যায়, "পাঁড়ে-জি, মাল তুমি নিজের মধ্যে পরখ করেই দেখনা",--সে চোখ পাকিয়ে বলে, "নিজে! সেটা আবার কে! সে আছে কোথায়? আমি নিজেকে চিনিনে, আমি চিনি ছাপ-মারা মার্কা।"

আমরা বলি, "নিজে" বলে একটা পদার্থ আছে সেটা কেবল নিজেকে দেখবার জন্য নয়, সেইখানেই আমরা সমস্তকে দেখি। সেটা যদি ঢাকা পড়ে তা হলে সেই ঢাকাটাকেই সমস্ত বলে মনে হয়। তখন ঠুলিটাকেই মনে হয় সনাতন জগৎ।

এই জায়গাতেই ফ্যারিসিদের সঙ্গে যিশুর গোল বেধেছিল এ গোল আজও মেটেনি।

আনন্দের কারবার তাদেরই, অন্তরের মধ্যে যাদের উৎস; মনোরঞ্জনের কারবার তাদেরই, বাইরের পরেই যাদের একমাত্র ভরসা। লোকে যা শুন্‌তে চায় তারা তাই শুনিয়ে গুজরান চালায়। লোকের মত, লোকের পছন্দই তাদের নিক্তি, তাদের কষ্টিপাথর।

রামায়ণ পড়ে দেখলে যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত খাঁটি কবিকে দেখা যায়—উত্তরকাণ্ডে মেকি ধরা পড়ে। কেননা উত্তরকাণ্ড লোকরঞ্জনের কাণ্ড। যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামচন্দ্র দশমুখকে ভয় করেন নি বলে সীতা উদ্ধার করতে পেরেচেন, আর উত্তরকাণ্ডে দুর্ম্মুখকে ভয় করেচেন বলে সীতা হারিয়েচেন। যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামচন্দ্র গুহক, বানর, বিভীষণের মিতা; উত্তরকাণ্ডে তিনি শূদ্রক তপস্বীকে বধ করলেন; কেননা সেখানে তাঁর আদর্শ লোকধর্ম্মের বন্ধনে, নিত্য-ধর্ম্মের আনন্দে নয়। যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামচন্দ্র বীর, উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্র ভীরু।

উত্তরকাণ্ডের কবি লোকশিক্ষা দিতে বসেছিলেন—অর্থাৎ লোকে যেটাকে ভালো বলে, সেইটেই লোকের কানে ভালো বলা তাঁর কাজ হয়েছিল। ঋষিরা বাল্মীকির ছয়কাণ্ড রামায়ণে আনন্দ পেয়েছিলেন, আর লোকে বড় খুসী হয়েছিল অবাল্মীকির উত্তরকাণ্ড রামায়ণে। রামায়ণের আনন্দই হচ্চেন সীতা, তিনি সত্য, তাঁর সতীত্ব আমরা তাঁর জীবনে দেখেছি,—সেই আনন্দকে বধ করেচেন উত্তরকাণ্ডের লেখক, কারণ সতীত্বকে তিনি লোকশ্রুতির মধ্যে দেখতে চেয়েচেন। তিনি মনে করেচেন, এই আনন্দকে বধ করাটাই

াহাদুরী—আমরাও আজ পর্য্যন্ত তাই নিয়ে বাহবা দিয়ে আসচি। ারণ ভীরুতাকেই পৌরুষ বলে না চালাতে পারলে আমাদের সান্ত্বনা নেই, আমরা, যা সত্য তাকে মানতে পারচিনে বহুর শাসনে, তাই যা মানচি তাকেই সত্য বলচি জগঝম্প বাজিয়ে। তার কারণ আমরা আজ কাব্যের ভিতরে নেই, আমরা কাব্যের বাইরে; আমরা উত্তরকাণ্ডে। আমাদের সীতা, যিনি আমাদের সত্য, আমাদের সুন্দর, তিনি কেঁদে বলচেন, "মা বসুন্ধরা, আমাকে গ্রহণ কর! ঐ লোকরঞ্জনকারী তাঁর ঘরের স্যাকরা দিয়ে গড়া বানানো-সীতাকে নিয়ে বাজার দরে তার দাম কসে খুসী থাকুন!"

শিক্ষা নিয়ে আমাদের সরকারি শিক্ষাবিধান সভায় একটা গোলমাল চলচে।

ডাক্তার ওয়াট্‌সন্ বলেন, কিছুকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এত ছেলে পাস্ করচে যে, সেটা ক্রমে একটা বিভীষিকা হয়ে উঠল।

ইংরেজপক্ষ আমাদের এই বলে দোষ দিচ্চেন যে, এই নিয়ে তোমরা যে খুসী হচ্চ সেটা বিদ্যার দিকে তাকিয়ে নয়, ব্যবসার দিকে তাকিয়ে। ছেলে যে সত্যই কিছু শিখ্‌বে সেটা তোমাদের কাছে গৌণ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানা-ঘরের ছাপ নিয়ে চাকরির বাজারে সে কোনোমতে বিকিয়ে যাবে এইটেই তোমাদের কাছে মুখ্য। চাকরির লোভে-পড়ে তোমরা দেশের শিক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ খাটো করে দিলে।

এখানে মুস্কিল হচ্চে এই যে, ইংরেজপক্ষ তাঁদের য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে আমাদের য়ুনিভার্সিটির তুলনা করে থাকেন।

সেটা অন্যায়। তার কারণ, তাঁদের দেশে শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের

মধ্যে ব্যাপ্ত। শিক্ষার যে অংশটা সব চেয়ে কম, মানুষের যেটুকু না হলে নয় সেটুকুর ব্যবস্থা দেশের মেয়েপুরুষ সকলের জন্যেই আছে। অতএব নীচের দিকে যখন মোটা প্রয়োজনটা মেটানো হয়েচে উপরের দিকে তখন আদর্শের সূক্ষ্মতার দিকে মন দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের দেশে আশু দরকার হয়েচে শিক্ষাটাকে যতটা পারা যায় ছড়িয়ে দেওয়া,—ইংরেজের সে দরকার মোটেই নেই। এমন স্থলে ভরা-পেটের বিচার খালি-পেটের বিচারের সঙ্গে মোটেই মেলেনা।

মোটা প্রয়োজনটাই যখন প্রবল, আদর্শটা তখন খাটো না হয়ে উপায় নেই। এ কথা মানতে রাজি আছি য়ুরোপীয় য়ুনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটদের সঙ্গে এখানকার য়ুনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটের সমান ওজন নয়। তার কারণ আমাদের দেশের য়ুনিভার্সিটিকে একটা মাঝারি চালে চলতে হয়। খুব উঁচু চালও নয়, নেহাৎ নীচু চালও নয়। একই সঙ্গে শিক্ষাকে যথাসম্ভব উপরে টেনে রেখে যথাসম্ভব চারদিকে ছড়িয়ে দেবার ভার তাকে নিতে হয়েচে।

দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন থেকে স্বতন্ত্র য়ুনিভার্সিটি বলে কোনো একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ নেই। আমাদের য়ুনিভার্সিটি আমাদের বিশেষ দায় অনুসারে স্বভাবতই একটা বিশেষ চাল অবলম্বন করেচে। যাদের সে দায় নেই তারা সে চালকে নিন্দে করতে পারে। কি করা যায়! নিন্দে মাথায় করে নিতে হবে কিন্তু চাল বদ্‌লানো শক্ত।

যদি কেবলমাত্র ইংরেজের হাতে য়ুনিভার্সিটির ভার থাকত তা হলে তাঁরা উচ্চশিক্ষাকে খুবই উচ্চ করে তোলবার জন্যে মজুর

লাগিয়ে দিতেন—ভুলে যেতেন, উপর এবং নীচের মাঝখানে মইটা নেই। অতি সূক্ষ্ম এবং সঙ্কীর্ণ একটা উচ্চ শিক্ষা উচ্চে বসে চোখবুজে হাওয়া খেত, নীচের সঙ্গে তার কোনো কারবার থাক্‌ত না।

কিন্তু আমরা, যারা আমাদের দেশের প্রয়োজন বুঝি—ইচ্ছা করচি বাংলা দেশের পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে মোটামুটি পাস-করা ছেলে অজস্র ছাড়িয়ে যাক্। কেরানিগিরি করবার জন্যে নয়—বিশ্বের সঙ্গে দেশের একটা সাধারণ যোগের রাস্তা খুলে দেবার জন্যে—যে রাস্তা দিয়ে ক্রমে ক্রমে আমাদের ঘরে ঘরে একদিন সর্ব্বজগতের পণ্য কিছু কিছু এসে পৌঁছতে পারবে; শিক্ষার প্রাণস্রোত আমাদের সমস্ত দেশের নাড়ির মধ্যে সঞ্চার করে দেবার জন্যে, যাতে-করে কেবল দু-দশ জন লোকের নয়, সমস্ত দেশের চিত্ত জাগরুক হয়ে ওঠে।

ইংরেজই আমাদের তীব্রস্বরে পরিহাস করে এসেচেন যে, তোমাদের শিক্ষিতমণ্ডলীর সঙ্গে জনমণ্ডলীর যোগ নেই। আমাদের শিক্ষা যদি অসম্ভব রকমের অত্যুচ্চ শিক্ষা হত তাহলে সে যোগ যে কতদিনে হত তা বল্‌তে পারিনে।

কারণ, অত্যুচ্চ পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারে অতি অল্প লোক। সেই অল্প লোকের দ্বারা দেশে শিক্ষার ব্যাপ্তি হতে পারত না। আজ আমরা অবজ্ঞা করে বলে থাকি দেশে বি-এ, এম্-এ, ছড়াছড়ি যাচ্চে। ধানের ক্ষেতে বীজ যে এমনি করে ছড়াছড়ি যায় নইলে হেমন্তে পেটভরার মত অন্ন হয় না। এ ত বিলিতি সীড্‌স্‌ম্যানের সৌখীন কেয়ারি নয়।

এর জবাবে অপরপক্ষ বল্‌তে পারেন, বেশ ত নিম্নশিক্ষাকে খুব করে ব্যাপ্ত করে দাও, তাই বলে উচ্চ শিক্ষার মাথা হেঁট কোরোনা। কিন্তু নিম্নশিক্ষাকে দেশব্যাপী করা আমাদের সাধ্যের মধ্যে নেই। সেটা কোন্ যুগে হবে সেই ভরসা করে এখন যে-রাস্তাটা আছে, সে ভাঙা হোক বাঁকা হোক, তাকে আগে-ভাগে বন্ধ করে বসে থাক্‌তে পারিনে।

যে পর্য্যন্ত দেশে নিম্নশিক্ষা ফলাও না হবে সে পর্য্যন্ত মোটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড আশ্রয় করে যত বেশি সংখ্যায় পাস-করা ছেলে দেশে ছড়িয়ে পড়ে ততই কল্যাণ। তার কারণ এ নয় যে, ভালোকে আমরা শ্রদ্ধা করিনে, তার কারণ, উপস্থিত ক্ষেত্রে মন্দের ভালো ছাড়া আমাদের আর গতি নেই। এই মন্দের ভালোর রাস্তাটা কাটিয়ে গিয়ে আশা করি একদিন নিছক ভালোর দেশে গিয়ে পৌঁছব।

তাই বলে এ কথা যেন কেউ না মনে করেন যে, যে-পদ্ধতিটা চল্‌চে এর মধ্যে গলদ কিছু নেই বা এর উন্নতি করা চলে না এমন কথা আমরা কল্পনা করি। সেদিক থেকে অনেক কথা বল্‌বার আছে; এখন সে থাক্। আজকাল বিস্তর ছেলে পাস করচে বলে আতঙ্কে যাঁরা সেই পাসের পথটাকে আরো সরু করতে চান আপাতত দয়াধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তাঁদের বল্‌চি, তোমরা ত গোড়াটা রাখইনি, তারপরে যদি আবার আগাটাকেও সূক্ষ্ম করে ছাঁটো তাহলে এই মুড়ো জিনিষটাকে নিয়ে আমরা করব কি?

যাত্রা

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
তভক্ষণ জমাইয়া রাখি
যত কিছু বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন;
ততক্ষণ
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন;
এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে পক্ককেশে।

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।

পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস্ পিছে ?
আমি ত মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
র'বনা ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি ত বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্দ্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন!

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯ পৌষ।
সুরুল।

সবুজ পত্র

ঐতিহাসিক

আমাদের সাহিত্য, আমাদের ইতিহাস কোনটাই তেমন সারবান নহে, সমস্তই চুটকী শ্রেণীর অন্তর্গত—এই একটা অপবাদ আজকাল শুনা যাইতেছে। সাহিত্যে চুটকী চলিতে পারে কিন্তু ভাগ্যবিধাতার দপ্তরখানায় বসিয়া যাঁরা জীর্ণপত্র ঘাঁটিয়া বহুযত্নে অতীতের পাকা দলিল বাহির করিতেছেন ও তাহা হইতেই ভাবীযুগের নজির খাড়া করিয়া তুলিতেছেন তাঁরাও যদি মোটা মোটা ভলুমে সারবান ইতিহাস না লিখিয়া এমন কিছু লেখেন যার মধ্যে তত্ত্বের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া গল্পের চাপল্য প্রকাশ হইতে থাকে তবে সেটা প্রবীণোচিত হয় না। কারণ ইতিহাসটা বিজ্ঞানের জ্ঞাতি কুটুম্ব, তাকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের চালে চলিয়া আপন মর্য্যাদা রাখিতে হইবে। রস-সাহিত্যের সঙ্গে সে যদি কুটুম্বিতা করিতে যায় তবে ত তার কুলনাশ অনিবার্য্য।

ইংলণ্ডে দেখিতে পাই যে এক একটা ধূয়া এক এক সময়ে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে পাইয়া বসে। ধর্ম্মতত্ত্বের শাসন হইতে ইংলণ্ড যখন খালাস পাইল তখন বিজ্ঞানের ধূয়া তাকে চাপিয়া ধরিল। স্থির হইল, বিশ্বে যা-কিছুর মধ্যে দৃষ্টি চলে বা চলে না সকলই বিজ্ঞানের সাহায্যে মানববুদ্ধির দখলে আসিবে। বিজ্ঞানের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ। তার সমারোহ দেখিয়া বিলাতের লোকেরা নিশ্চিত আশা করিয়াছিল যে বিশ্বে আর কিছু গুপ্ত থাকিবে না, যেখানে যা-কিছু অস্পষ্ট আছে সব স্পষ্ট হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম তার স্বর্গ নরক লইয়া, জীব তার জন্ম-মৃত্যু লইয়া, জাতি তার উত্থান-পতন লইয়া যে সব জটিল হেঁয়ালী-জালে আপনাকে ঢাকিয়া ছিল এতকাল পরে বিজ্ঞান সে সব পরিষ্কার করিয়া দিবে।

সেই সময়ে "বৈজ্ঞানিক প্রণালী"র খুব খাতির হইল। অন্যান্য বিষয়ে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগ হইতে বড় বেশী দেরী হইল না, কেবল ইতিহাস তখনকার মত রক্ষা পাইল। ইংরেজিতে ইতিহাস তখনো সাহিত্যেরই সরিক হইয়া ছিল; শুধু পণ্ডিত নয়, জনসাধারণও সেই ইতিহাস পড়িত। গিবন, কার্লাইল, মেকলে হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীন, লেকি পর্য্যন্ত সকলেই যে সকল ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তাহা কেবল ইতিহাস নহে সাহিত্যও বটে। বিজ্ঞানের হাত এড়াইয়া ইতিহাস যে এমন ভাবে চলিয়াছিল তার কারণ ইতিহাস সাহিত্যের অঙ্গ হওয়াতে তার উপর পণ্ডিতদের অবজ্ঞা ছিল; তাঁরা ভাবিতেন যে ইতিহাস নাটক নভেল পদ্যের মত অসার, উহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করিতে গেলে মজুরি পোষাইবে না।

এমন সময়ে এক দিন সীলি-প্রমুখ নূতন ঐতিহাসিকেরা সগর্ব্বে ঘোষণা করিলেন—ইতিহাস একটা বিজ্ঞান; যাঁরা আগে ইতিহাস লিখিতেন তাঁরা ইতিহাসের নামে উপন্যাস চালাইয়াছেন। তাঁরা জনসাধারণকে চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, ইতিহাস পড়া তোমাদের কর্ম্ম নয়; তোমরা নাটক নভেল পড়। আজ হইতে ইতিহাস কেবল বিশেষজ্ঞেরা লিখিবেন এবং বিদ্বানেরা পড়িবেন। নব্য ঐতিহাসিকেরা ঠিক করিয়াছিলেন যে ইতিহাসের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে সেটা হচ্ছে কার্য্য-কারণ নির্ণয়ের দ্বারা কতগুলি Laws of History —ঐতিহাসিক মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করা। প্রাকৃত বিজ্ঞানের তত্ত্বের মত কতকগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে এ তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁরা ভাবিয়াছিলেন যে এ কাজ শক্ত হইবে না যদি এমন ঐতিহাসিক জোটে যাঁর বুদ্ধি রীতিমত শান-দেওয়া, নথিপত্রের পেটের কথা বাহির করিতে যাঁর অধ্যবসায় প্রশস্ত, যিনি নিপুণভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করিতে পারেন এবং সর্ব্বোপরি যাঁর মন ভাবাতিশয্যের (Sentimentalism) কুয়াশা হইতে একেবারে মুক্ত।

সত্যের অনুসন্ধানে যাঁরা এমন করিয়া দল বাঁধিয়া বাহির হইলেন তাঁরা যে গোড়াতেই এমন একটা মায়ামৃগের পিছনে ছুটিবেন এমনটা আশঙ্কা করা যায় নাই। অঙ্কশাস্ত্র যেমন নিরেট সত্য বা প্রাকৃত বিজ্ঞান, যেমন খাঁটি বিজ্ঞান ইতিহাস কখনই সেরূপ নহে। বিজ্ঞান যেমন ভাবে প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ নির্ণয় করে, ইতিহাসে তেমন হইবার উপায় নাই। ঘটনাপর্য্যায়ের জোড়গুলি ভাঙিয়া তার কারণ বাহির করিবার শক্তি কোনো ঐতিহাসিকেরই নাই।

এবং গবেষণা দ্বারা কোনো বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকই এ পর্য্যন্ত এমন কোনো চিরন্তন ঐতিহাসিক নিয়ম বাহির করিতে পারিলেন না যার সাহায্যে যে-কোনো ঘটনার নির্দ্দিষ্ট পরিণাম আগে হইতে নির্ণয় করা যাইবে। এমন কি, পেটের জ্বালা ধরিলে লোকে ক্ষেপিয়া ওঠে এই সনাতন ঐতিহাসিক বুলিরও অসত্যতা অনেকবার অনেক স্থানে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরা মনে করিয়াছিলেন যে ইতিহাস পাঠকদিগকে কেবল আনন্দ দিবে না, ব্যবহারিক শিক্ষাও দিবে। কিন্তু পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে চারিত্রনীতি বা রাষ্ট্রনীতি ইতিহাসের শিক্ষার দ্বারা পাকা হইয়াছে এমন ত কোথাও দেখা গেল না। ঐতিহাসিক নিয়মের পরে মানুষের এত বেশী শ্রদ্ধা নাই যে সেই অনুসারে সে চলিবে এবং এ কথা মানিতেই হইবে যে শ্রদ্ধা করিবার তেমন হেতুও এ পর্য্যন্ত কোনো ঐতিহাসিকই দেখাইতে পারেন নাই। আসল কথা, অন্যের বেলায় যে নিয়ম খাটিয়াছে নিজের বেলাতেও তাহা খাটিবে একথা স্বভাবতই মানুষের বিশ্বাস করা শক্ত। রোমের বিশাল সাম্রাজ্য তখনকার য়ুরোপে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, তার মধ্যেও যে বিনাশ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা রোমক ঐতিহাসিকগণ বুঝিতে পারেন নাই; তাঁরা ভাবিয়াছিলেন রোম চিরকাল সমান থাকিবে। শত শতাব্দী পরে য়ুরোপের বিচক্ষণ ঐতিহাসিকেরা বিস্তর গবেষণা করিয়া রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ স্থির করিয়াছেন কিন্তু নিজেদের সাম্রাজ্যের বেলায় কারো কোনো হুঁস নাই। যে পথ দিয়া রোম গিয়াছে, স্পেন গিয়াছে সেই পথ দিয়া তাঁদের সাম্রাজ্যও যাইতে পারে এ দুশ্চিন্তা

তাঁদের বড় একটা বিচলিত করে না, বরঞ্চ দেখা যায় তাঁরা অতি দূর ভবিষ্যতের হিসাব করিতেছেন। সাম্রাজ্যের অতিবৃদ্ধিতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্ব্বল করিয়া তোলে, তাই বলিয়া পৃথিবীর কোন্ পরাক্রমশালী জাতি সাম্রাজ্য-বিস্তারে কুণ্ঠিত?

আসল কথা, ঐতিহাসিক কার্য্যকারণ স্থির করা বা রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া ঐতিহাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, আমাদের অতীতকে আমাদের সাম্‌নে ধরাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। মুখ্যত ইতিহাসের কাছে আমরা জানিতে চাই আমরা কেমন ছিলাম। কেমন ছিল ভারতের সেই গৌরবের যুগ যখন মৌর্য্যেরা সমস্ত ভারতবর্ষে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পাটলীপুত্রের কত না ঐশ্বর্য্য কত না দীপ্তি, আবার তারই পাশে ছায়ানিবিড় আম্রকাননতলে গ্রামগুলিতে কত না শান্তি ছিল। ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে ভারতবর্ষ যখন উজ্জ্বল, তার ভাণ্ডার যখন ভরা, ঠিক তখনই ভগবান বুদ্ধ তার অন্তরের দৈন্য বুঝিয়াছিলেন এবং যে অমৃত মন্ত্রে মানুষ মুক্ত হইবে সেই মন্ত্র ভারতবর্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কেমন ছিলেন সেই রাজতপস্বী যিনি রাজার আসন হইতে দম্ভ প্রচার করেন নাই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কেমনই বা ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠীসকল যাঁরা সেই মহাভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্র নিজের সর্ব্বস্বে ভরিয়া দিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। আবার চৈতন্যদেব তাঁর দেবমূর্ত্তি, তাঁর উজ্জ্বল করুণাপূর্ণ বিশাল দুই চক্ষু লইয়া যে বাংলা দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই আমাদের ছায়ায় ঢাকা, পাখীর গানে ভরা বাংলা দেশই বা কেমন ছিল। সেই শান্ত, সেই বলিষ্ঠ সেই নানা ভাব নানা চিন্তাপূর্ণ ভারতবর্ষের যে একটি

স্বরূপ আমরা দেখিতে চাই সে কি কেবল কার্য্যকারণ খুঁজিবার জন্য ?

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে ঐতিহাসিকের জটার মধ্য হইতে মন্দাকিনীর মত স্বচ্ছ ভাষার ধারা বাহির হওয়া চাই। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে যে সকল ইতিহাস লেখা হইয়াছে তাহা পাদটীকা ও পরিশিষ্টে পূর্ণ এবং তাহা সুপাঠ্য নহে। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরা ভাবিয়াছিলেন যে, সত্য লইয়া যে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের কারবার তাহার আর সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন কি? ঘটনার পরম্পরাকে এবং ঘটনার ভিতর দিয়া জাতীয় জীবনস্রোতের গতিভঙ্গীকে ছবির মতন পাঠকের সম্মুখে ধরিবার নিমিত্ত যে শক্তির প্রয়োজন তাহা তাঁরা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁরা মনে করিতেন—ভাষার লালিত্য চিন্তাশীলতার অভাব প্রমাণ করে। অধ্যাপক সিলি কহিয়াছিলেন—Break the drowsy spell of narrative। ফলে পাঠকের Drowsiness আরো বাড়িয়া গিয়াছিল এবং কাহিনীর Spell যে আজও ভাঙে নাই সে ত সকলেরই জানা। আজকাল আবার বিলাতের ঐতিহাসিক-দিগের মত বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

আসল কথা, ঐতিহাসিক সাহিত্যকার এবং ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিকে যে কথা লইয়া বিবাদ হইতেছিল সেটা এই যে, ইতিহাসে হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনাবৃত্তির কোনো স্থান আছে, কি নাই। পূর্ব্বে যে সব ইতিহাস লেখা হইয়াছিল তার মধ্যে ঐতিহাসিকের মনের ঝোঁকটা কোন্ দিকে বেশ বোঝা যাইত। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকদিগের ন্যায় তাঁরা নিজের লেখা হইতে সাবধানে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতেন

না। তাঁরা ঘটনাকে কেবল বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিতেন না হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরা হৃদয়কে অবিশ্বাস করেন; তাঁরা কেবল বুদ্ধি দ্বারা সত্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন—ভুলিয়া যান যে দৃশ্য ঘটনার পশ্চাতে যে জীবনের বেগ ইতিহাসকে চালনা করে তাহা মানুষ কেবল বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারিবে না। সত্য ত চাইই, তাই বলিয়া যার লিখিত দলিল আছে তাই কেবল সত্য এ ভুল যেন না করি। এ কথা যেন ভুলিয়া না যাই যে দলিলের অতীত দেশে যে সত্য বিরাজ করে, যাহা কেবল সমগ্রচিত্তের বোধের দ্বারাই বোঝা যায়—তাহা সুগভীর। যাঁরা কেবল ঘটনার ভিতর দিয়া ফরাসী-বিপ্লবের নিগূঢ় প্রাণের গতি লক্ষ্য করিতে চেষ্টা পাইবেন তাঁদের শ্রম ব্যর্থ হইবে। ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে কেবল কার্লাইল স্বীয় কল্পনাশক্তি দ্বারা ফরাসী-বিপ্লবের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। Ranke তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও ইংলণ্ডের ইতিহাসে ধর্ম্মসংস্কার অথবা কৃষক-বিদ্রোহের সময়কার উত্তেজনা আমাদের মনের ভিতর সঞ্চার করিতে সক্ষম হন নাই এবং Puritanism-এর মধ্যে নিহিত অর্থও বুঝিতে পারেন নাই। Thierry, Michelet, Mommsen-কে এই হিসাবে আমাদের আদর্শ করা যাইতে পারে। অর্থনীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে Marshal বলিয়াছেন—

"The Economist needs imagination above all to put him on the track of those causes of events which are remote or lie below the surface."

যদি অর্থনীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে একথা সত্য হয় তবে ইতিহাস সম্বন্ধে যে উহা কতদূর সত্য তাহা বলা বাহুল্য।

এ কথা ভুলিলে চলিবে কেন যে কলের ইতিহাস লিখিতেছ না, মানুষের ইতিহাস লিখিতেছ। মানুষের প্রাণ আছে, নানা রকম বৃত্তি প্রবৃত্তি আছে যাহা কোনো বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই বিশ্লেষণ করা যাইবে না, যাহা কেবল নিজের কল্পনা দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। মনকে মন দিয়াই বুঝিতে হইবে নচেৎ যাহা বোঝা যাইবে তাহা সত্য নহে। যে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস লিখিবেন তিনি যদি কেবল নথিপত্রের দিকে চাহিয়াই ইতিহাস লেখেন তবে সে ইতিহাসে কতকগুলি ফেল-করা স্বদেশী কোম্পানীর নাম, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা, আমাদের নিজেদের মধ্যে দলাদলি এবং সংবাদপত্রের মিথ্যা বাক্যজাল ছাড়া আর কি পাওয়া যাইবে?—অথবা তিনি হয় ত প্রমাণ এইকুটু করিবেন যে স্বদেশী-আন্দোলনের ফলে দেশের লোক দেশী কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।—ইহাই কি সত্য যে স্বদেশী-আন্দোলনের চরম দেশের লোকের দেশী কাপড় পরা? এ কথা মানিতেই হইবে যে ঘটনায় যাহা ঘটিয়াছে তাহা অপেক্ষা বড় সত্য আমরা মনের মধ্যে লাভ করিয়াছিলাম। কোন্ অন্ত-দৃষ্টির দ্বারা বাঙালী বুঝিতে পারিয়াছিল যে আমরা মরিব না বাঁচিব—আমরা অতি বুদ্ধিমানেরা ত দেখিতেছি যে মরণ ছাড়া আর আমাদের গতি নাই, তবে কোথা হইতে উচ্চারিত হইল এই আশার বাণী? কে জাগাইয়া তুলিল আমাদের মনের মধ্যে এই অকারণ বাঁধনহারা সুখ? আমাদের কাছে যাহা ধ্রুব, যাহা

মহান, যাহা কোম্পানী-ফেলের চেয়ে ঢের বেশী সত্য,—আমাদের আশার কথা, আমাদের উৎসাহের কথা, আমাদের সেদিনকার উদ্দীপনা, সুদূর ভবিষ্যতে যে ঐতিহাসিক তখনকার পাঠকদের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন তাঁর কেবল বুদ্ধি ও অধ্যবসায় থাকিলে চলিবে না; সকল মহৎ আন্দোলনের পশ্চাতে থাকিয়া যে শক্তি অঘটন ঘটায়—যে শক্তির কথায় কবি গাহিয়াছেন—

তোমার বিধান
কেমনে কি ইন্দ্রজাল করে যে নির্ম্মাণ
সঙ্গোপনে সবার নয়ন-অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার নির্দ্দিষ্ট কালে
মুহূর্ত্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে
চির-প্রতীক্ষিত চির-সম্ভবের বেশে।

সেই শক্তিকে মনপ্রাণ দিয়া অনুভব করিতে হইবে, নচেৎ তাঁর সকল শ্রম ব্যর্থ হইবে।

এ কথা সত্য যে, সমসাময়িক সাহিত্য, ঘটনা ও লোকচরিতের মধ্য দিয়াই অতীতের মনকে অনুভব করিতে হইবে এবং সেই সমস্ত দলিল-নির্ব্বাচনে একটা বিচার-শক্তির প্রয়োজন যাহাকে বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে কিন্তু সকলের চেয়ে প্রয়োজন অতীতের মনকে গ্রহণ করিবার শক্তি, অতীতের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও উৎসাহ। কারণ শ্রদ্ধা ভিন্ন অতীতের রহস্য বোঝা যাইবে না—ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিকের বিশেষত্ব।

আমরা আমাদের দেশে এমন ঐতিহাসিককে চাই যিনি তাঁহার

কল্পনার দ্বারা আমাদের অতীতকে জীবন্ত করিয়া তুলিবেন, যিনি তাঁহার শ্রদ্ধার দ্বারা আমাদের মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিবেন, যিনি বিচার করিয়া আমাদের অন্যায় অহঙ্কারকে তিরস্কৃত করিবেন এবং আমাদের অমূলক লজ্জাকে লজ্জিত করিবেন, যিনি নিজের অটল বিশ্বাসদ্বারা আমাদিগকে প্রতিষ্ঠা দিবেন, নিজের আশা দ্বারা আমাদিগকে আশা যোগাইবেন এবং অতীতের মহৎ আদর্শ দেখাইয়া আমাদের ভবিষ্যতের আদর্শ এই দেশের কালো আকাশে আলোর রেখায় আঁকিয়া দিবেন।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

ঘরে-বাইরে

বিমলার আত্মকথা

বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দেখি, সন্দীপ দরজার দিকে পিঠ করে ব্রিটিশ একাডেমিতে প্রদর্শিত ছবির তালিকার একখানা বই নিয়ে মন দিয়ে দেখছেন। আর্ট সম্বন্ধে সন্দীপ নিজেকে বিচক্ষণ বলেই জানেন। একদিন আমার স্বামী তাঁকে বল্লেন যে, আর্টিষ্টদের যদি গুরুমশায়ের দরকার হয় তবে তুমি বেঁচে থাক্‌তে যোগ্য লোকের অভাব হবে না।

এমন করে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার স্বামীর স্বভাব নয়, কিন্তু আজকাল তাঁর মেজাজ একটু বদ্‌লে এসেচে—সন্দীপের অহঙ্কারে তিনি ঘা দিতে পারলে ছাড়েন না।

সন্দীপ বল্লেন, তুমি কি ভাব, আর্টিষ্টদের আর গুরুকরণ দরকার নেই?

স্বামী বল্লেন, আর্ট সম্বন্ধে আর্টিষ্টদের কাছ থেকেই আমাদের মত মানুষকে চিরকাল নতুন নতুন পাঠ নিয়ে চল্‌তে হবে, কেননা এর কোনো একটিমাত্র বাঁধা পাঠ নেই।

সন্দীপ আমার স্বামীর বিনয়কে বিদ্রূপ করে খুব হাস্‌লেন, বল্লেন, নিখিল, তুমি ভাব দৈন্যটাই হচ্চে মূলধন, ওটাকে যত খাটাবে ঐশ্বর্য্য ততই বাড়বে। আমি বল্‌চি, অহঙ্কার যার নেই, সে স্রোতের শ্যাওলা, চারিদিকে কেবল ভেসে ভেসে বেড়ায়।

আমার মনের ভাব অদ্ভুত রকম ছিল। একদিকে ইচ্ছেটা

তর্কে আমার স্বামীর জিত হয়, সন্দীপের অহঙ্কারটা একটু কমে, অথচ সন্দীপের অসঙ্কোচ অহঙ্কারটাই আমাকে টানে—সে যেন দামী হীরের ঝক্‌ঝকানি, কিছুতেই তাকে লজ্জা দেবার জো নেই; এমন কি, সূর্য্যের কাছেও সে হার মান্‌তে চায় না, বরঞ্চ তার স্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যায়।

আমি ঘরে ঢুকলুম। জানি আমার পায়ের শব্দ সন্দীপ শুন্‌তে পেলেন কিন্তু যেন শোনেন নি এমনি ভান করে বইটা দেখতেই লাগলেন। আমার ভয়, পাছে আর্টের কথা পেড়ে বসেন। কেননা আর্টের ছুতো করে সন্দীপ আমার সামনে যে-সব ছবির যে-সব কথার আলোচনা করতে ভালোবাসেন আজো আমার তাতে লজ্জা বোধ করার অভ্যাস ঘোচেনি। লজ্জা লুকোবার জন্যেই আমাকে দেখাতে হত যেন এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

তাই একবার মুহূর্ত্তকালের জন্যে ভাবছিলুম ফিরে চলে যাই,—এমন সময়ে খুব একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে সন্দীপ আমাকে দেখে যেন চম্‌কে উঠ্‌লেন। বল্লেন, এই যে আপনি এসেচেন!

কথাটার মধ্যে, কথার সুরে, তাঁর দুই চোখে, একটা চাপা ভর্ৎসনা। আমার এমন দশা যে, এই ভর্ৎসনাকেও মেনে নিলুম। আমার উপর সন্দীপের যে দাবী জন্মেচে তাতে আমার দু'-তিন দিনের অনুপস্থিতিও যেন অপরাধ। সন্দীপের এই অভিমান যে আমার প্রতি অপমান সে আমি জানি, কিন্তু রাগ করবার শক্তি কই।

কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলুম। যদিও আমি অন্ত-দিকে চেয়ে ছিলুম তবু বেশ বুঝতে পারছিলুম সন্দীপের দুই চক্ষের

নালিশ আমার মুখের সামনে যেন ধন্না দিয়ে পড়েই ছিল, সে আর নড়তে চাচ্ছিল না। এ কি কাণ্ড! সন্দীপ কোনো-একটা কথা তুল্‌লে সেই কথার আড়ালে একটু লুকিয়ে বাঁচি যে! বোধ হয় পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট যখন এমনি করে লজ্জা অসহ্য হয়ে এল তখন আমি বল্লুম, আপনি কি দরকারে আমাকে ডেকেছিলেন?

সন্দীপ ঈষৎ চম্‌কে উঠে বল্লেন, কেন, দরকার কি থাকতেই হবে? বন্ধুত্ব কি অপরাধ? পৃথিবীতে যা সব-চেয়ে বড় তার এতই অনাদর? হৃদয়ের পূজাকে কি পথের কুকুরের মত দরজার বাইরের থেকে খেদিয়ে দিতে হবে, মক্ষিরাণী?

আমার বুকের মধ্যে দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল। বিপদ ক্রমশই কাছে ঘনিয়ে আস্‌চে, আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমার মনের মধ্যে পুলক আর ভয় দুইই সমান হয়ে উঠল। এই সর্ব্বনাশের বোঝা আমি আমার পিঠ দিয়ে সামলাব কি করে? আমাকে যে পথের ধুলোর উপর মুখ-থুব্‌ড়ে পড়তে হবে!

আমার হাত পা কাঁপছিল। আমি খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বল্লুম, সন্দীপবাবু, আপনি দেশের কি কাজ আছে বলে আমাকে ডেকেচেন, তাই আমার ঘরের কাজ ফেলে এসেচি।

তিনি একটু হেসে বল্লেন, আমি ত সেই কথাই আপনাকে বলছিলুম। আমি যে পূজার জন্যেই এসেচি, তা জানেন? আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাই সে-কথা কি আপনাকে বলিনি? ভূগোলবিবরণ ত একটা সত্য বস্তু নয়—শুধু সেই ম্যাপটার কথা স্মরণ করে কি কেউ জীবন দিতে পারে?

যখন আপনাকে সামনে দেখতে পাই তখনি ত বুঝতে পারি, দেশ কত সুন্দর কত প্রিয়, প্রাণে তেজে কত পরিপূর্ণ! আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টীকা পরিয়ে দেবেন তবেই ত জানব আমি আমার দেশের আদেশ পেয়েচি, তবেই ত সেই কথা স্মরণ করে লড়তে লড়তে মৃত্যুবাণ খেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি তবে বুঝব সে কেবলমাত্র ভূগোলবিবরণের মাটি নয়, সে একখানা আঁচল—কেমন আঁচল জানেন? আপনি সেদিন সেই যে একখানি সাড়ি পরেছিলেন, লাল মাটির মত তার রং, আর তার চওড়া পাড় একটি রক্তের ধারার মত রাঙা, সেই সাড়ির আঁচল,—সে কি আমি কোনো দিন ভুলতে পারব? এই সব জিনিষই ত জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় করে তোলে।

বল্‌তে বল্‌তে সন্দীপের দুই চোখ জ্বলে উঠ্‌ল। চোখে সে ক্ষুধার আগুন কি পূজার সে আমি বুঝতে পারলুম না। আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ল যেদিন আমি প্রথম ওঁর বক্তৃতা শুনেছিলুম। সেদিন, তিনি অগ্নিশিখা না মানুষ সে আমি ভুলে গিয়েছিলুম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা চলে—তার অনেক কায়দাকানুন আছে; কিন্তু আগুন যে আরেক জাতের, সে এক-নিমেষে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, প্রলয়কে সুন্দর করে তোলে। মনে হতে থাকে, যে-সত্য প্রতিদিনের শুক্‌নো কাঠে হেলাফেলার মধ্যে লুকিয়ে ছিল, সে আজ আপনার দীপ্যমান মূর্ত্তি ধরে চারিদিকের সমস্ত কৃপণের সঞ্চয়গুলোকে অট্টহাস্যে দগ্ধ করতে ছুটে চলেচে।

এর পরে আমার কিছু বলবার শক্তি ছিল না। আমার ভয়

হ'তে লাগল এখনি সন্দীপ ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরবেন। কেননা তাঁর হাত চঞ্চল আগুনের শিখার মতই কাঁপছিল, আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত এসে পড়ছিল।

সন্দীপ বলে উঠলেন, আপনারা সব ছোটো ছোটো ঘোরো নিয়মকেই কি বড় করে তুল্‌বেন? আপনাদের এমন প্রাণ আছে যার একটু আভাসেই আমরা জীবন-মরণকে তুচ্ছ করতে পারি সে কি কেবল অন্দরের ঘোম্‌টা-মোড়া জিনিস? আজ আর লজ্জা করবেন না, লোকের কানা-ঘুষায় কান দেবেন না, আজ বিধি-নিষেধে তুড়ি মেরে মুক্তির মাঝখানে ছুটে বেরিয়ে আসুন।

এমনি করে সন্দীপবাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন আমার স্তব মিশিয়ে যায়—তখন সঙ্কোচের বাঁধন আর টেঁকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে। যত দিন আর্ট আর বৈষ্ণব কবিতা, আর স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ নির্ণয়, আর বাস্তব অবাস্তবের বিচার চল্‌ছিল ততদিন আমার মনং গ্লানিতে কালো হয়ে উঠছিল। আজ সেই অঙ্গারের কালিমায় আবার আগুন ধরে উঠল—সেই দীপ্তিই আমার লজ্জা নিবারণ করলে। মনে হতে লাগল আমি যে রমণী সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।

হায়রে, আমার সেই মহিমা আমার চুলের ভিতর দিয়ে এখনি কেন একটা প্রত্যক্ষ দীপ্তির মত বেরয় না? আমার মুখ দিয়ে এমন কোনো একটা কথা উঠচে না কেন যা মন্ত্রের মত এখনি সমস্ত দেশকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করে দেয়?

এমন সময়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘরে

ক্ষেমা দাসী এসে উপস্থিত। সে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, আমি চলে যাই, আমি সাতজন্মে এমন—হাউ হাউ হাউ হাউ!

কি? ব্যাপারটা কি?

মেজোরাণীমার দাসী থাকো অকারণে গায়ে পড়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করেচে—তাকে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দিয়েচে।

আমি যত বলি, আচ্ছা সে আমি বিচার করব—কিছুতেই ক্ষেমার কান্না আর থামে না।

সকাল বেলায় দীপক রাগিণীর যে সুর এমন জমে উঠেছিল তার উপরে যেন বাসন-মাজার জল ঢেলে দিলে। মেয়েমানুষ যে পদ্মবনের পঙ্কজ তার তলাকার পঙ্ক ঘুলিয়ে উঠল। সেটাকে সন্দীপের কাছে তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে আমাকে তখনি অন্তঃপুরে ছুট্‌তে হল। দেখি আমার মেজো জা সেই বারান্দায় বসে এক-মনে মাথা নীচু করে সুপুরি কাটচেন,—মুখে একটু হাসি লেগে আছে, গুন্ গুন্ করে গান করচেন, "রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে,"—ইতিমধ্যে কোথাও যে কিছু অনর্থপাত হয়েছে তার কোনো লক্ষণ তাঁর কোনোখানেই নেই।

আমি বল্লুম, মেজোরাণী তোমার থাকো ক্ষেমাকে এমন মিছি-মিছি গাল দেয় কেন?

তিনি ভুরু তুলে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, ওমা, সত্যি নাকি? মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে দূর করে দেব। দেখ দেখি এই সকাল বেলায় তোমার বৈঠকখানার আসর মাটি করে দিলে! ক্ষেমারও আচ্ছা আক্কেল দেখচি, জানে তার মনিব বাইরের বাবুর সঙ্গে

একটু গল্প করচে—একেবারে সেখানে গিয়ে উপস্থিত—লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বসেচে। তা ছোটরাণী, এ সব ঘরকন্নার কথায় তুমি থেকো না, তুমি বাইরে যাও, আমি যেমন করে পারি সব মিটিয়ে দিচ্চি।

আশ্চর্য্য মানুষের মন! এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তার পালে এমন উল্টো হাওয়া লাগে! এই সকাল বেলায় ঘরকন্না ফেলে বাইরে সন্দীপের সঙ্গে বৈঠকখানায় আলাপ আলোচনা করতে যাওয়া, আমার চিরকালের অন্তঃপুরের অভ্যস্ত আদর্শে এমনি সৃষ্টি-ছাড়া বলে মনে হল যে, আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে চলে গেলুম।

নিশ্চয় জানি ঠিক সময় বুঝে মেজোরাণী নিজে থাকোকে টিপে দিয়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়েচেন। কিন্তু আমি এমনি টল্‌মলে জায়গায় আছি যে এসব নিয়ে কোনো কথাই কইতে পারিনে। এই ত সেদিন নন্‌কু দরোয়ানকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রথম ঝাঁজে আমার স্বামীব সঙ্গে যে রকম উদ্ধতভাবে ঝগড়া করেছিলুম শেষ পর্য্যন্ত তা টিঁকল না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিজের উত্তেজনাতেই নিজের মধ্যে একটা লজ্জা এল। এর মধ্যে আবার মেজোরাণী এসে আমার স্বামীকে বল্লেন, ঠাকুরপো, আমারি অপরাধ। দেখ ভাই আমরা সেকেলে লোক, তোমার ঐ সন্দীপবাবুর চালচলন কিছুতেই ভালো ঠেকে না—সেই জন্যে ভালো মনে করেই আমি দরোয়ানকে—তা এতে যে ছোটোরাণীর অপমান হবে এ কথা মনেও করিনি, বরঞ্চ ভেবেছিলুম উল্টো! হায়রে পোড়া কপাল, আমার যেমন বুদ্ধি!

এমনি করে দেশের দিক থেকে পূজার দিক থেকে যে কথাটাকে

এত উজ্জ্বল করে দেখি সেইটেই যখন নীচের দিক থেকে এমন করে ঘুলিয়ে উঠ্‌তে থাকে তখন প্রথমটা হয় রাগ, তার পরেই মনে গ্লানি আসে।

আজ শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে জানলার কাছে বসে বসে ভাবতে লাগ্‌লুম, চারদিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জীবনটা আসলে কতই সরল হতে পারে! ঐ যে মেজোরাণী নিশ্চিন্ত মনে বারান্দায় বসে সুপুরি কাট্‌চেন ঐ সহজ আসনে বসে সহজ কাজের ধারা আমার কাছে আজ অমন দুর্গম হয়ে উঠল! রোজ রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এর শেষ কোন্‌খানে? আমি কি মরে যাব, সন্দীপ কি চলে যাবে, এ সমস্তই কি রোগীর প্রলাপের মত সুস্থ হয়ে উঠে একেবারে ভুলে যাব—না ঘাড়মোড় ভেঙে এমন সর্ব্বনাশের তলায় তলিয়ে যাব যেখান থেকে ইহজীবনে আমার আর উদ্ধার নেই? জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারলুম না—এমন করে ছারখার করে দিলুম কি করে?

আমার এই শোবার ঘর, যে ঘরে আজ ন বৎসর আগে নতুন বৌ হয়ে পা দিয়েছিলুম, সেই ঘরের সমস্ত দেয়াল ছাদ মেজে আজ আমার মুখের দিকে চেয়ে আজ অবাক্ হয়ে আছে। এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমার স্বামী কলকাতা থেকে ভারতসাগরের কোন্ এক দ্বীপের অনেক দামী এই পত্র-গাছাটি কিনে এনেছিলেন। এই ক'টি মাত্র পাতা, কিন্তু তাতে লম্বা যে একটি ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিল সে যেন সৌন্দর্য্যের কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া, ইন্দ্রধনু যেন ঐ ক'টি পাতার কোলে ফুল হয়ে জন্ম নিয়ে দোল খাচ্চে। সেই ফুটন্ত পত্রগাছাটিকে আমরা

দুজনে মিলে আমাদের শোবার ঘরের এই জানলার কাছে টাঙিয়ে রেখেচি। সেই একবার ফুল হয়েছিল, আর হয়নি, আশা আছে আবার আর একদিন ফুল ফুটবে। আশ্চর্য্য এই যে, অভ্যাসমত আজো এই গাছে আমি রোজ জল দিচ্চি, আশ্চর্য্য এই যে, সেই নারকেল দড়ি দিয়ে পাকে পাকে আঁট করে বাঁধা এই পাতা-কয়টির বাঁধন আল্‌গা হ'ল না—তার পাতাগুলি আজো সবুজ আছে।

আজ চার বছর হল আমার স্বামীর একটি ছবি হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঐ কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিয়েছিলুম। ওর দিকে দৈবাৎ যখন আমার চোখ পড়ে আর চোখ তুল্‌তে পারিনে। আজ ছ'দিন আগেও রোজ সকালে স্নানের পর ফুল তুলে ঐ ছবির সামনে রেখে প্রণাম করেচি। কতদিন এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গেছে।

একদিন তিনি বল্‌লেন, তুমি যে আমাকে আমার চেয়ে বড় করে তুলে পূজো কর এতে আমার বড় লজ্জা বোধ হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন তোমার লজ্জা?

স্বামী বল্লেন, শুধু লজ্জা নয় ঈর্ষা।

আমি বল্লুম, শোনো একবার কথা? তোমার আবার ঈর্ষা কাকে?

স্বামী বল্লেন, ঐ মিথ্যে আমিটাকে। এর থেকে বুঝতে পারি এই সামান্য আমাকে নিয়ে তোমার সন্তোষ নেই, তুমি এমন অসামান্য কাউকে চাও যে তোমার বুদ্ধিকে অভিভূত করে দেবে আরেকটা আমাকে তুমি মন দিয়ে গড়ে তোমার মন ভোলাচ্চ।

আমি বল্লুম, তোমার এই কথাগুলো শুন্‌লে আমার রাগ হয়।

তিনি বল্লেন, রাগ আমার উপরে করে কি হবে, তোমার অদৃষ্টের উপরে কর। তুমি ত আমাকে স্বয়ম্বরসভায় বেছে নাওনি, যেমনটি পেয়েচ তেমনি তোমাকে চোখ বুজে নিতে হয়েচে—কাজেই দেবত্ব দিয়ে আমাকে যতটা পার সংশোধন করে নিচ্চ। দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা স্বয়ম্বরা হতে পারনি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্চ।

সেদিন এই কথাটা নিয়ে এত রাগ করেছিলুম যে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে গিয়েছিল। তাই মনে করে আজ ঐ কুলুঙ্গিটার দিকে চোখ তুল্‌তে পারিনে।

ঐ যে আমার গয়নার বাক্সের মধ্যে আর-এক ছবি আছে। সেদিন বাইরের বৈঠকখানা ঘর ঝাড়পোঁচ করবার উপলক্ষ্যে সেই ফোটোষ্ট্যাণ্ডখানা তুলে এনেচি, সেই যার মধ্যে আমার স্বামীর ছবির পাশে সন্দীপের ছবি আছে। সে ছবি ত পূজো করিনে, তাকে প্রণাম করা চলে না—সে রইল আমার হীরে মাণিক মুক্তোর মধ্যে ঢাকা। সে লুকোনো রইল বলেই তার মধ্যে এত পুলক! ঘরে সব দরজা বন্ধ করে তবে তাকে খুলে দেখি। রাত্রে আস্তে আস্তে কেরোসিনের বাতিটা উস্কে তুলে তার সাম্‌নে ঐ ছবিটা ধরে চুপ করে চেয়ে বসে থাকি। তার পরে রোজই মনে করি এই কেরোসিনের শিখায় ওকে পুড়িয়ে ছাই করে চিরদিনের মত চুকিয়ে ফেলে দিই—আবার রোজই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আমার হীরে মাণিক মুক্তোর নীচে তাকে চাপা দিয়ে চাবি বন্ধ করে রাখি। কিন্তু, পোড়ারমুখী, এই

হীরে মাণিক মুক্তো তোকে দিয়েছিল কে? এর মধ্যে কত দিনের কত আদর জড়িয়ে আছে! তারা আজ কোথায় মুখ লুকোবে? মরণ হলে যে বাঁচি!

সন্দীপ একদিন আমাকে বলেছিলেন, দ্বিধা করাটা মেয়েদের প্রকৃতি নয়। তার ডাইনে বাঁয়ে নেই, তার একমাত্র আছে সাম্‌নে তিনি বারবার বলেন, দেশের মেয়েরা যখন জাগবে তখন তারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট করে বল্‌বে, "আমরা চাই", —সেই চাওয়ার কাছে কোনো ভালো মন্দ কোনো সম্ভব অসম্ভবের তর্ক বিতর্ক টিঁক্‌তে পারবে না।—তাদের কেবল এক কথা, "আমরা চাই!" আমি চাই, এই বাণীই হচ্চে সৃষ্টির মূল বাণী—সেই বাণীই কোনো শাস্ত্র বিচার না করে আগুন হয়ে সূর্য্যে তারায় জ্বলে উঠেচে।—ভয়ঙ্কর তার প্রণয়ের পক্ষপাত—মানুষকে সে কামনা করেচে বলেই যুগ যুগান্তরের লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে তার সেই কামনার কাছে বলি দিতে দিতে এসেচে। সৃজন প্রলয়ের সেই ভয়ংকরী "আমি চাই" বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই মূর্ত্তিমতী। সেই জন্যেই ভীরু পুরুষ সৃজনের সেই আদিম বন্যাকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করচে পাছে সে তাদের কুমড়ো ক্ষেতের মাচাগুলোকে অট্টকলহাস্যে ভাসিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে চলে যায়। পুরুষ মনে করে আছে এই বাঁধকে সে চিরকালের মত পাকা করে বেঁধে রেখেচে। জম্‌চে, জল জম্‌চে, —হ্রদের জলরাশি আজ শান্ত গম্ভীর, আজ সে চলেও না, আজ সে বলেও না, পুরুষের রান্নাঘরের জলের জালা নিঃশব্দে ভর্ত্তি করে। কিন্তু চাপ আর সইবে না, বাঁধ ভাঙবে,—তখন এতদিনের

বোবা শক্তি "আমি চাই" "আমি চাই" বলে গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে ছুট্‌বে।

সন্দীপের এই কথা আমার মনের মধ্যে যেন ডমরু বাজাতে থাকে। তাই আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিরোধ বাধে, যখন লজ্জা আমাকে ধিক্কার দিতে থাকে তখন সন্দীপের কথা আমার মনে আসে। তখন বুঝতে পারি আমার এ লজ্জা কেবল লোকলজ্জা —সে আমার মেজো জায়ের মূর্ত্তি ধরে বাইরে বসে বসে সুপুরি কাট্‌তে কাট্‌তে কটাক্ষপাত করচে। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য করি! "আমি চাই" এই কথাটাকেই নিঃসঙ্কোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বল্‌তে পারাই হচ্চে আপনার পূর্ণ প্রকাশ—না বল্‌তে পারাই হচ্চে ব্যর্থতা। কিসের ঐ পরগাছা, কিসের ঐ কুলুঙ্গি—আমার এই উদ্দীপ্ত আমিকে ব্যঙ্গ করে অপমান করে এমন সাধ্য ওদের কী আছে!

এই বলে তখনি ইচ্ছে হল, ঐ পরগাছাটাকে জানলার বাইরে ফেলে দিই—ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি—প্রলয় শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক্। হাত উঠেছিল কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল—মেজের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কি হবে, আমার কি হবে! আমার কপালে কি আছে!

সন্দীপের কথা

আমি নিজের লেখা আত্মকাহিনী যখন পড়ে দেখি তখন ভাবি, এই কি সন্দীপ? আমি কি কথা দিয়ে তৈরি? আমি কি রক্তমাংসের মলাটে মোড়া একখানা বই?

পৃথিবী চাঁদের মত মরা জিনিষ নয়, সে নিশ্বাস ফেল্‌চে, তার সমস্ত নদী সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠচে,—সেই বাষ্পে সে ঘেরা, তার চতুর্দ্দিকে ধূলো উড়চে, সেই ধূলোর ওড়নায় সে ঢাকা। বাইরে থেকে যে দর্শক এই পৃথিবীকে দেখবে, এই বাষ্প আর ধূলোর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোই কেবল সে দেখতে পাবে। সে কি এর দেশ মহাদেশের স্পষ্ট সন্ধান পাবে?

এই পৃথিবীর মত যে মানুষ সজীব তার অন্তর থেকে কেবলি আইডিয়ার নিশ্বাস উঠচে, এই জন্যে বাষ্পে সে অস্পষ্ট; যেখানে তার ভিতরের জলস্থল, যেখানে সে বিচিত্র, সেখানে তাকে দেখা যায় না,—মনে হয় সে যেন আলো-ছায়ার একটা মণ্ডল।

আমার বোধ হচ্চে যেন সজীব গ্রহের মত আমি আমার সেই আইডিয়ার মণ্ডলটাকেই আঁক্‌চি। কিন্তু আমি যা চাই, যা ভাবি, যা সিদ্ধান্ত করচি আমি যে আগাগোড়া কেবল তাইই, তা ত নয়,—আমি যা ভালোবাসিনে যা ইচ্ছে করিনে আমি যে তাও। আমার জন্মাবার আগেই যে আমার সৃষ্টি হয়ে গেছে—আমি ত নিজেকে বেছে নিতে পারিনি, হাতে যা পেয়েচি তাকে নিয়েই কাজ চালাতে হচ্চে।

এ কথা আমি বেশ জানি, যে বড় সে নিষ্ঠুর। সর্ব্বসাধারণের জন্যে ন্যায় আর অসাধারণের জন্যে অন্যায়। মাটির তলাটা আগাগোড়া সমান, আগ্নেয় পর্ব্বত তাকে আগুনের শিঙের ভয়ঙ্কর গুঁতো মেরে তবে উঁচু হয়ে ওঠে। সে চারদিকের প্রতি ন্যায় বিচার করে না, তার বিচার নিজের প্রতিই। সফল অন্যায়পরতা এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতার জোরেই মানুষ বল জাত বল এ পর্য্যন্ত

লক্ষপতি মহীপতি হয়ে উঠেচে। ১-কে দিব্যি চোখ বুজে গিলে খেয়ে তবেই ২ দুই হয়ে উঠতে পারে—নইলে ১-এর সমতল লাইন একটানা হয়ে চল্‌ত।

আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ,—অন্যায়ই বহ্নিশিখা; সে যখনি দগ্ধ না করে তখনি ছাই হয়ে যায়। যখনি কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয় তখনি পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি।

কিন্তু তবু এ আমার আইডিয়া, এ পূরোপূরি আমি নয়। যতই অন্যায়ের বড়াই করি না কেন, আইডিয়ার উড়্‌নির মধ্যে ফুটো আছে, ফাঁক আছে, তার ভিতর থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ে সে নেহাৎ কাঁচা অতি নরম। তার কারণ, আমার অধিকাংশ আমার পূর্ব্বেই তৈরি হয়ে গেছে।

আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরের পরীক্ষা করি। একদিন বাগানে চড়িভাতি কর্‌তে গিয়েছিলুম। একটা ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল, আমি সবাইকে বল্লুম, কে ওর পিছনের একখানা পা এই দা দিয়ে কেটে আন্‌তে পারে? সকলেই যখন ইতস্ততঃ করছিল আমি নিজে গিয়ে কেটে নিয়ে এলুম। আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে যে লোক নিষ্ঠুর সে এই দৃশ্য দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আমার শান্ত অবিচলিত মুখ দেখে সকলেই নির্ব্বিকার মহাপুরুষ বলে আমার পায়ের ধুলো নিলে। অর্থাৎ সেদিন সকলেই আমার আইডিয়ার বাষ্পময় গুলটাই দেখলে; কিন্তু যেখানে আমি, নিজের দোষে না ভাগ্যদোষে,

দুর্ব্বল সকরুণ, যেখানে ভিতরে ভিতরে বুক ফাট্‌ছিল সেখানে আমাকে ঢাকা দেওয়াই ভালো।

বিমল-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই যে একটা অধ্যায় জমে উঠচে এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা পড়চে। ঢাকা পড়ত না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোনো বালাই না থাক্‌ত। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মৎলবে গড়চে কিন্তু সেই মৎলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাক্‌চে—সেইটের সঙ্গে আমার মৎলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না—এই জন্যে তাকে চেপে চুপে ঢেকে ঢুকে রাখতে চাই—নইলে সমস্তটাকে সে মাটি করে দেয়।

প্রাণ জিনিষটা অস্পষ্ট, সে যে কত বিরুদ্ধতার সমষ্টি তার ঠিক নেই। আমরা আইডিয়াওয়ালা মানুষ তাকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে একটা কোনো বিশেষ আকারে সুস্পষ্ট করে জান্‌তে চাই—সেই জীবনের সুস্পষ্টতাই জীবনের সফলতা। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর থেকে সুরু করে আজকের দিনের আমেরিকার ক্রোড়পতি রকেফেলার পর্য্যন্ত সকলেই নিজেকে তলোয়ারের কিম্বা টাকার বিশেষ একটা ছাঁচে ঢেলে জমিয়ে দেখতে পেরেচে বলেই নিজেকে সফল করে জেনেচে।

এইখানেই আমাদের নিখিলের সঙ্গে আমার তর্ক বাধে। আমিও বলি আপনাকে জানো, সেও বলে আপনাকে জানো। কিন্তু সে যা বলে তাতে দাঁড়ায় এই আপনাকে না জানাটাই হচ্চে জানা। সে বলে, তুমি যাঁকে ফল পাওয়া বল, সে হচ্চে আপনাকে বাদ দিয়ে ফলটুকুকে পাওয়া। ফলের চেয়ে আত্মা বড়।

আমি বল্লুম, কথাটা নেহাৎ ঝাপ্‌সা হল।

নিখিল বল্লে, উপায় নেই। প্রাণটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই বলে' প্রাণটাকে কল বলে' সোজা করে' জান্‌লেই যে প্রাণটাকে জানা হয় তা নয়। তেমনি আত্মা ফলের চেয়ে অস্পষ্ট তাই আত্মাকে ফলের মধ্যে চরম করে দেখাই যে আত্মাকে সত্য দেখা তা বল্‌ব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তবে তুমি কোথায় আত্মাকে দেখচ? কোন্ নাকের ডগায়, কোন্ ভ্রূর মাঝখানে?

সে বল্লে, আত্মা যেখানে আপনাকে অসীম জান্‌চে, যেখানে ফলকে ছেড়ে এবং ছাড়িয়ে চলে যাচ্চে।

তাহলে নিজের দেশ সম্বন্ধে কি বল্‌বে?

ঐ একই কথা। দেশ যেখানে বলে, আমি আমাকেই লক্ষ্য করব, সেখানে সে ফল পেতে পারে কিন্তু আত্মাকে হারায়—যেখানে সকলের চেয়ে বড়কে সকলের বড় করে' দেখে সেখানে সকল ফলকেই সে খোয়াতে পারে কিন্তু আপনাকে সে পায়।

ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত কোথায় দেখেচ?

মানুষ এত বড় যে, সে যেমন ফলকে অবজ্ঞা করতে পারে তেমনি দৃষ্টান্তকেও। দৃষ্টান্ত হয় ত নেই—বীজের ভিতরে ফুলের দৃষ্টান্ত যেমন নেই; কিন্তু বীজের ভিতরে ফুলের বেদনা আছে। তবু, দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই? বুদ্ধ বহু শতাব্দী ধরে যে সাধনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রেখেছিলেন, সে কি ফলের সাধনা?

নিখিলের কথা আমি যে একেবারেই বুঝতে পারিনে তা

নয়। কিন্তু সেইটিই হল আমার মুস্কিল। ভারতবর্ষে আমার জন্ম —সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি এ কথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। এই-জন্যেই আমাদের দেশে আজকাল অদ্ভুত ব্যাপার চল্‌চে। ধর্ম্মের ধূয়ো দেশের ধূয়ো দুটিকেই পুরো দমে এক সঙ্গে চালাচ্চি—ভগবদ্গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুইই চাই—তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারচে না, তাতে এক সঙ্গেই গড়ের বাদ্য এবং সানাই বাজানো চলচে, এ আমরা বুঝচিনে। আমার জীবনের কাজ হচ্চে এই বেসুরো গোলমালটাকে থামানো, আমি গড়ের বাদ্যটাকেই বাহাল রাখবো—সানাই আমাদের সর্ব্বনাশ করেচে। প্রবৃত্তির যে জয়পতাকা আমাদের হাতে দিয়ে মা প্রকৃতি, মা শক্তি, মা মহামায়া রণক্ষেত্রে আমাদের পাঠিয়েচেন তাকে আমরা লজ্জা দেব না। প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্ম্মল, যেমন নির্ম্মল ভুঁইচাঁপা ফুল, যে কথায় কথায় স্নানের ঘরে ভিনোলিয়া সাবান মাখতে ছোটে না।

একটা প্রশ্ন ক'দিন ধরে মাথায় ঘুরচে, কেন বিমলের সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে ফেল্‌তে দিচ্চি? আমার জীবনটা ত ভেসে-যাওয়া কলার ভেলা নয় যে যেখানে-সেখানে ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে চল্‌বে।

সেই কথাই ত বল্‌ছিলুম, যে-একটিমাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মানুষ ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ে। এবারে আমি যেন বেশী দূরে ছিট্‌কে পড়েছি।

বিমল যে আমার কামনার বিষয় হয়ে উঠেচে সেজন্যে আমার কোনো মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখচি ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে—সেই বোঁটার দাবীকেই চিরকালের বলে মান্‌তে হবে না কি? ওর যত রস যত মাধুর্য্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যেই—সেইখানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা,—সেই ওর ধর্ম্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।

কিন্তু আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে পড়চি, মনে হচ্চে আমার জীবনে বিমল বিষম একটা দায় হয়ে উঠবে। আমি পৃথিবীতে এসেচি কর্ত্তৃত্ব করতে—আমি লোককে চালনা করব কথায় এবং কাজে,—সেই লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া, আমার আসন তার পিঠের উপরে, তার রাশ আমার হাতে, তার লক্ষ্য সে জানেনা শুধু আমিই জানি, কাঁটায় তার পায়ে রক্ত পড়বে কাদায় তার গা ভরে যাবে, তাঁকে বিচার করতে দেব না তাকে ছোটাব।

সেই আমার ঘোড়া আজ দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়চে, তার হ্রেষাধ্বনিতে সমস্ত আকাশ আজ কেঁপে উঠল, কিন্তু আমি করচি কি? দিনের পর দিন আমার কি নিয়ে কাটচে? ওদিকে আমার এমন শুভদিন যে বয়ে গেল?

আমার ধারণা ছিল আমি ঝড়ের মত ছুটে চলতে পারি—ফুল ছিঁড়ে আমি মাটিতে ফেলে দিই কিন্তু তাতে আমার চলার ব্যাঘাত

করে না। কিন্তু এবার যে আমি ফুলের চারদিকে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি ভ্রমরেরই মত; ঝড়ের মত নয়।

তাইত বলি, নিজের আইডিয়া দিয়ে নিজেকে যে রঙে আঁকি সব জায়গায় সে রং ত পাকা হয়ে ধরে না, হঠাৎ দেখতে পাই সেই সামান্য মানুষটাকে। কোন-এক অন্তর্যামী যদি আমার জীবন-বৃত্তান্ত লিখতেন তাহলে নিশ্চয় দেখা যেত আমার সঙ্গে আর ঐ পাঁচুর সঙ্গে বেশি তফাৎ নেই—এমন কি, ঐ নিখিলেশের সঙ্গে। কাল রাত্রে আমার আত্মকাহিনীর খাতাটা নিয়ে খুলে পড়ছিলুম। তখন সবে বি, এ, পাশ করেচি, ফিলজফিতে মগজ ফেটে পড়চে বল্লেই হয়। তখন থেকেই পণ করেছিলুম নিজের হাতে বা পরের হাতে গড়া কোনো মায়াকেই জীবনের মধ্যে স্থান দেব না—জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব করে তুল্‌ব। কিন্তু তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনকাহিনীটাকে কি দেখচি? কোথায় সেই ঠাস্ বুনোনি? এ যে জালের মত—সূত্র বরাবর চলেচে—কিন্তু সূত্র যতখানি, ফাঁক তার চেয়ে বেশী বই কম নয়। এই ফাঁকাটার সঙ্গে লড়াই করে করে এ'কে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না। কিছুদিন বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জোরের সঙ্গেই চল্‌ছিলুম—আজ দেখি আবার একটা মস্ত ফাঁক।

আজ দেখি মনের মধ্যে ব্যথা লাগচে। "আমি চাই; হাতের কাছে এসেচে; ছিঁড়ে নেব"—এ হল খুব স্পষ্ট কথা, খুব সংক্ষেপ রাস্তা,—এই রাস্তায় যারা জোরের সঙ্গে চল্‌তে পারে তারাই সিদ্ধিলাভ করে এই কথা আমি চিরদিন বলে আসচি। কিন্তু ইন্দ্রদেব এই তপস্যাকে সহজ করতে দিলেন না, তিনি কোথা

থেকে বেদনার অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিয়ে সাধকের দৃষ্টিকে বাষ্পজালে অস্পষ্ট করে দেন।

দেখচি বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মত ছট্‌ফট্‌ করচে, তার বড় বড় দুই চোখে কত ভয় কত করুণা, জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত—ব্যাধ ত এই দেখে খুসী হয়। আমার খুসী আছে কিন্তু ব্যথাও আছে। সেইজন্যে কেবলি দেরি হয়ে যাচ্চে—তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারচিনে।

আমি জানি দু'বার-তিনবার এমন এক-একটা মুহূর্ত্ত এসেচে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথা বল্‌তে পারত না,—সেও বুঝতে পারছিল এখনি একটা কি ঘট্‌তে যাচ্চে যার পর থেকে জগৎসংসারের সমস্ত তাৎপর্য্য একেবারে বদ্‌লে যাবে;—সেই পরম অনিশ্চিতের গুহার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে তার দুই চক্ষে ভয় অথচ উদ্দীপনার দীপ্তি; এই সময়টুকুর মধ্যে একটা কিছু স্থির হয়ে যাবে তারি জন্যে সমস্ত আকাশ-পাতাল নিঃশ্বাস রোধ করে যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েচি—নিঃসঙ্কোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিই নি। এর থেকে বুঝতে পারচি এতদিন যে সব বাধা আমার প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা আজ আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েচে।

যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোক বনে রেখেছিল—অতবড় বীরের অন্তরের মধ্যে

ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সঙ্কোচ ছিল তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সঙ্কোচটুকু না থাক্‌লে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজো করত। এই রকমেরই একটু সঙ্কোচ ছিল বলেই, যে-বিভীষণকে তার মারা উচিত ছিল, তাকে রাবণ চিরদিন দয়া এবং অবজ্ঞা করলে, আর ম'ল নিজে।

জীবনের ট্রাজেডি এইখানেই। সে ছোট হয়ে হৃদয়ের এক তলায় লুকিয়ে থাকে তার পরে বড়কে এক মুহূর্ত্তে কাৎ করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা বলে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এত অঘটন ঘটে।

নিখিল যে এমন অদ্ভুত—তাকে দেখে' যে এত হাসি, তবু ভিতরে ভিতরে এও কিছুতে অস্বীকার করতে পারিনে যে, সে আমার বন্ধু। প্রথমটা তার কথা বেশি কিছু ভাবিনি কিন্তু যতই দিন যাচ্চে তার কাছে লজ্জা পাচ্চি কষ্টও বোধ হচ্চে। এক-একদিন আগেকার মত তার সঙ্গে খুব করে' গল্প করতে তর্ক করতে যাই, কিন্তু উৎসাহটা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে—এমন কি, যা কখনো করিনে তাও করি, তার মতের সঙ্গে মত মেলাবার ভান করে থাকি। কিন্তু এই কপটতা জিনিষটা আমার সয় না, এটা নিখিলেরও সয় না—এইখানে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে।

তাই জন্যে আজকাল নিখিলকে এড়িয়ে চল্‌তে চাই, কোনো মতে দেখাটা না হলেই বাঁচি। এই সব হচ্চে দুর্ব্বলতার লক্ষণ। অপরাধের ভূতটাকে মান্‌বামাত্রই সে একটা সত্যকার জিনিষ হয়ে

দাঁড়ায়—তখন তাকে যতই অবিশ্বাস করিনা কেন, সে চেপে ধরে। আমি নিখিলের কাছে এইটেই অসঙ্কোচে জানাতে চাই এ সব জিনিষকে বড় করে বাস্তব করে দেখতে হবে। যা সত্য তার মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের কোনো ব্যাঘাত থাকা উচিত নয়।

কিন্তু এ কথাটা আর অস্বীকার করতে পারচিনে এইবার আমাকে দুর্ব্বল করেচে। আমার এই দুর্ব্বলতায় বিমল মুগ্ধ হয় নি—আমার অসঙ্কোচ পৌরুষের আগুনেই সেই পতঙ্গিনী তার পাখা পুড়িয়েচে। আবেশের ধোঁয়ায় যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তখন বিমলার মনও আবিষ্ট হয় কিন্তু তখন ওর মনে ঘৃণা জন্মে; তখন আমার গলা থেকে ওর স্বয়ম্বরের মালা ফিরিয়ে নিতে পারে না বটে কিন্তু সেটা দেখে' ও চোখ বুজতে চায়।

কিন্তু ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের দুজনেরই। বিমলাকে যে ছাড়তে পারব এমন শক্তিও নিজের মধ্যে দেখচিনে। তাই বলে নিজের পথটাও আমি ছাড়তে পারব না। আমার পথ লোকের ভিড়ের পথ—এই অন্তঃপুরের খিড়কির দরজার পথ নয়। আমি আমার স্বদেশকে ছাড়তে পারব না, বিশেষত আজকের দিনে,—বিমলাকে আজ আমি আমার স্বদেশের সঙ্গে মিশিয়ে নেব। যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশলক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধূর ঘোম্‌টা খুল্‌বে—সেই অনাবরণে তার অগৌরব থাক্‌বে না। জন-সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুল্‌বে তরী, উড়বে তাতে বন্দেমাতরং জয়পতাকা, চারিদিকে গর্জ্জন আর ফেনা—সেই নৌকোই একসঙ্গে আমাদের শক্তির দোলা আর প্রেমের দোলা। বিমলা সেখানে

মুক্তির এমন একটা বিরাট রূপ দেখবে যে তার দিকে চেয়ে তার সকল বন্ধন বিনা লজ্জায় এক সময়ে নিজের অগোচরে খসে যাবে। এই প্রলয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে ওর এক মুহূর্ত্তের জন্যে বাধবে না। যে নিষ্ঠুরতাই প্রকৃতির সহজ শক্তি সেই পরমাসুন্দরী নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তি আমি বিমলার মধ্যে দেখেছি। মেয়েরা যদি পুরুষের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেত তা হলে পৃথিবীতে কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেতুম—সেই দেবী নির্লজ্জ, সে নির্দ্দয়। আমি সেই কালীর উপাসক—বিমলাকে সেই প্রলয়ের মাঝখানে টেনে নিয়ে আমি একদিন কালীর উপাসনা করব। এবার তারই আয়োজন করি।

নিখিলেশের আত্মকথা

ভাদ্রের বন্যায় চারিদিক টলমল করচে—কচি ধানের আভা যেন কচিছেলের কাঁচা দেহের লাবণ্য। আমাদের বাড়ীর বাগানের নীচে পর্য্যন্ত জল এসেচে। সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্য্যাপ্ত হয়ে পড়েচে, নীল আকাশের ভালোবাসার মত।

আমি কেন গান গাইতে পারিনে? খালের জল ঝিল্‌মিল্ করচে, গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্ করচে, ধানের ক্ষেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে চিক্‌চিকিয়ে উঠচে—এই শরতের প্রভাত সঙ্গীতে আমিই কেবল বোবা। আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ, আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আটকা পড়ে যায়, ফিরে যেতে পায় না। আমার এই প্রকাশহীন দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই তখন বুঝতে পারি পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গ দিনরাত্রি কেউ সইতে পার্ব্বে কেন?

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেই জন্যে এই ন-বছরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যে সে আমার কাছে পুরোনো হয়নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে ত কলধ্বনিত বেগ নয়। আমি কেবল গ্রহণ করতেই পারি কিন্তু নাড়া দিতে পারিনে। আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মত—বিমল এতদিন যে কি দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিল, তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারচি। দোষ দেব কাকে?

হায় রে, ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি—ওর যে দরজা বন্ধ। আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসেছিল, এতকাল তা বুঝতে পারিনি। মনে করেছিলুম, অর্ঘ্য সে নিয়েছে বরও সে দিয়েচে—কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর!

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে পৃথিবীর এই ভরা-যৌবনে আমরা দুজনে শুক্লপক্ষে আমাদের শামলদহর বিলে বোটে করে বেড়াতে যেতুম। কৃষ্ণা পঞ্চমীতে যখন সন্ধ্যা বেলাকার জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়ে একেবারে তলায় এসে ঠেকত তখন আমরা বাড়ী ফিরে আসতুম। আমি বিমলকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধূয়োয় ফিরে আস্‌তে হয়;—জীবের মিলন-সঙ্গীতের ধূয়োই হচ্চে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে; এই ছলছল্-করা জলের উপরে যেখানে "বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ," যেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোমটা টেনে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নার কূলে কূলে কান পেতে সারারাত আড়ি পাতচে, সেইখানেই স্ত্রীপুরুষের প্রথম চার চক্ষের

মিলন হয়েছিল, দেয়ালের মধ্যে নয়,—তাই এখানে আমরা একবার করে সেই আদি যুগের প্রথম মিলনের ধুয়োর মধ্যে ফিরে আসি, যে মিলন হচ্চে হরপার্ব্বতীর মিলন, কৈলাসে মানস-সরোবরের পদ্মবনে। আমার বিবাহের পর দুবছর কলকাতায় পরীক্ষার হাঙ্গামে কেটেচে—তার পরে আজ এই সাত বছর প্রতি ভাদ্রমাসের চাঁদ আমাদের সেই জলের বাসরঘরে বিকশিত কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেচে। জীবনের সেই এক সপ্তক এমনি করে কাটল। আজ দ্বিতীয় সপ্তক আরম্ভ হয়েচে।

ভাদ্রের সেই শুক্লপক্ষ এসেচে সে কথা আমি ত কিছুতেই ভুলতে পারচিনে। প্রথম তিন দিন ত কেটে গেল—বিমলের মনে পড়েচে কি না জানিনে কিন্তু মনে করিয়ে দিল না। সব একেবারে চুপ হয়ে গেল; গান থেমে গেচে।

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে—কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড় নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়!

আজ আমার কান্না বেসুরো লাগচে। এ কান্না আমার থামাতেই হবে। আমার এই কান্না দিয়ে বিমলকে আমি বন্দী করে রাখব এমন কাপুরুষ যেন আমি না হই। ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেচে সেখানে কান্না যেন সেই মিথ্যাকে বাঁধতে না চায়। যতক্ষণ আমার বেদনা প্রকাশ পাবে ততক্ষণ বিমল একেবারে মুক্তি পাবে না।

কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেব, নইলে মিথ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাব না। আজ তাকে আমার সঙ্গে বেঁধে রাখা নিজেকেই মায়ার জালে জড়িয়ে রাখা মাত্র। তাতে কারো কিছুই মঙ্গল নেই, সুখ ত নেইই। ছুটি দাও, ছুটি নাও—দুঃখ বুকের মাণিক হবে যদি মিথ্যা থেকে খালাস পেতে পার!

আমার মনে হচ্চে যেন এইবার আমি একটা জিনিষ বুঝতে পারার কিনারায় এসেচি। স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসাটাকে সকলে মিলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক অধিকার ছাড়িয়ে এতদূর পর্য্যন্ত তাকে বাড়িয়ে তুলেচি যে, আজ তাকে সমস্ত মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়েও বশে আন্‌তে পারচিনে। ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেচি। এখন তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাকে অবজ্ঞা করবার দিন এসেচে। প্রবৃত্তির হাতের পূজা পেয়ে পেয়ে সে দেবীর রূপ ধরে দাঁড়িয়েচে; কিন্তু তার সামনে পুরুষের পৌরুষ বলি দিয়ে তাকে রক্তপান করাতে হবে এমন পূজা আমরা মান্‌ব না। সাজে-সজ্জায় লজ্জা-সরমে গানে-গল্পে হাসি-কান্নায় যে ইন্দ্রজাল সে তৈরি করেচে তাকে ছিন্ন করতে হবে।

কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের উপর বরাবর আমার একটা ঘৃণা আছে। পৃথিবীর সমস্ত ফুলের সাজি, সমস্ত ফলের ডালি কেবলমাত্র প্রেয়সীর পায়ের কাছে পড়ে পঞ্চশরের পূজার উপচার যোগাচ্চে জগতের আনন্দলীলাকে এমন করে ক্ষুণ্ণ করতে মানুষ পারে কি করে? এ কোন্ মদের নেশায় কবির চোখ ঢুলে পড়েচে? আমি যে মদ এতদিন পান করছিলুম তার রং এত

লাল নয় কিন্তু তার নেশা ত এম্‌নিই তীব্র। এই নেশার ঝোঁকেই আজ সকাল থেকে গুন্‌গুন্‌ করে মরচি,—

ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর!

শূন্য মন্দির! বল্‌তে লজ্জা করে না? এত বড় মন্দির কিসে তোমার শূন্য হল? একটা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জেনেচি তাই বলে জীবনের সমস্ত সত্য আজ উজাড় হয়ে গেল?

শোবার ঘরের শেল্‌ফ থেকে একটা বই আন্‌তে আজ সকালে গিয়েছিলুম। কতদিন দিনের বেলায় আমার শোবার ঘরে আমি ঢুকিনি। আজ দিনের আলোতে ঘরের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল! সেই আন্‌লাটিতে বিমলের কোঁচানো সাড়ি পাকানো রয়েচে, এক কোণে তার ছাড়া শেমিজ আর জামা ধোবার জন্যে অপেক্ষা করচে। আয়নার টেবিলের উপর তার চুলের কাঁটা, মাথার তেল, চিরুনি, এসেন্সের সিসি, সেই সঙ্গে সিঁদুরের কৌটোটিও! টেবিলের নীচে তার ছোট্ট সেই একজোড়া জরি দেওয়া চটি জুতো,—একদিন যখন বিমল কোনোমতেই জুতো পরতে চাইত না সেই সময়ে আমি ওর জন্যে আমার এক লক্ষ্ণৌয়ের সহপাঠী মুসলমান বন্ধুর যোগে এই জুতো আনিয়ে দিয়েছিলুম। কেবলমাত্র শোবার ঘর থেকে আর ঐ বারান্দা পর্য্যন্ত এই জুতো পরে' যেতে সে লজ্জায় মরে গিয়েছিল। তার পরে বিমল অনেক জুতো ক্ষয় করেচে কিন্তু এই চটি জোড়াটি সে আদর করে রেখে দিয়েচে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, যখন ঘুমিয়ে থাকি লুকিয়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে তুমি আমার পূজো কর —আমি তোমার পায়ের ধুলো নিবারণ করে আজ আমার এই জাগ্রত

দেবতার পূজো করতে এসেচি। বিমল বল্লে, যাও তুমি অমন করে বোলো না তাহলে কখ্‌খনো ও জুতো পরব না।—এই আমার চির-পরিচিত শোবার ঘর—এর একটি গন্ধ আছে যা আমার সমস্ত হৃদয় জানে—আর বোধ হয় কেউ তা পায় না। এই সমস্ত অতি ছোট ছোট জিনিষের মধ্যে আমার রসপিপাসু হৃদয় তার কত যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় মেলে রয়েছে তা আজ যেমন করে অনুভব করলুম তেমন আর কোনোদিন করিনি। কেবল মূল শিকড়টি কাটা পড়লেই যে প্রাণ ছুটি পায় তা ত নয়, ঐ চটি জোড়াটা পর্য্যন্ত তাকে টেনে ধরতে চায়। সেই জন্যেই ত লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও তাঁর ছিন্ন পদ্মের পাপ্‌ড়িগুলোর চারিদিকে মন এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।—দেখতে দেখতে হঠাৎ কুলুঙ্গিটার উপর চোখ পড়ল। দেখি আমার সেই ছবি তেমনিই রয়েচে, তার সাম্‌নে অনেক দিনের শুক্‌নো কালো ফুল পড়ে আছে। এমনতর পূজার বিকারেও ছবির মুখে কোনো বিকার নেই। এ ঘর থেকে এই শুকিয়ে-যাওয়া কালো ফুলই আজ আমার সত্য উপহার! এরা যে এখনো এখানে আছে তার কারণ এদের ফেলে দেওয়ারও দরকার নেই। যাই হোক্, সত্যকে আমি তার এই নীরস কালো মূর্ত্তিতেই গ্রহণ করলুম—কবে সেই কুলুঙ্গির ভিতরকার ছবিটারই মত নির্ব্বিকার হতে পারব?

এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেল্‌ফের দিকে যেতে যেতে বল্লুম, Amiel's Journal বইখানা নিতে এসেচি। এই কৈফিয়ৎ-টুকু দেবার কি যে দরকার ছিল তা ত জানিনে। কিন্তু এখানে আমি যেন অপরাধী, যেন অনধিকারী, যেন এমন কিছুর মধ্যে চোখ দিতে

এসেছি যা লুকানো, যা লুকিয়ে থাকবারই যোগ্য। বিমলের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলুম।

বাইরে আমার ঘরে বসে যখন বই পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল, যখন জীবনের যা-কিছু সমস্তই যেন অসাধ্য হয়ে দাঁড়াল—কিছু দেখতে বা শুনতে, বল্‌তে বা করতে লেশমাত্র আর প্রবৃত্তি রইল না, যখন আমার সমস্ত ভবিষ্যতের দিন সেই একটা মুহূর্ত্তের মধ্যে জমাট হয়ে অচল হয়ে আমার বুকের উপর পাথরের উপর চেপে বসল ঠিক সেই সময়ে পঞ্চু একটা ঝুড়িতে গোটাকতক ঝুনো নারকেল নিয়ে আমার সাম্‌নে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ কি পঞ্চু? এ কেন?

পঞ্চু আমার প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা, মাষ্টার মশায়ের যোগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। একে আমি তার জমিদার নই, তার উপরে সে গরীবের একশেষ—ওর কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই। মনে ভাব-ছিলুম বেচারা বোধ হয় আজ নিরুপায় হয়ে বকশিশের ছলে অন্ন সংগ্রহের এই পন্থা করেচে।

পকেটের টাকার থলি থেকে দুটো টাকা বের করে যখন ওকে দিতে যাচ্চি তখন ও জোড়-হাত করে বল্লে, না হুজুর নিতে পারব না।

সে কি পঞ্চু?

না, তবে খুলে বলি। বড় টানাটানির সময় একবার হুজুরের সরকারী বাগান থেকে আমি নারকেল চুরি করেছিলুম। কোন্ দিন মরব তাই শোধ করে দিতে এসেচি।

Amiel's Journal পড়ে আজ আমার কোনো ফল হত না—কিন্তু পঞ্চুর এই এক-কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসি-কান্নার পরিমাপ করি।

পঞ্চু আমার মাষ্টার মশায়ের একজন ভক্ত। কেমন করে এর সংসার চলে তা আমি জানি। রোজ ভোরে উঠে একটা চাঙারিতে করে পান দোক্তা রঙীন সুতো ছোটো আয়না চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিষ নিয়ে হাঁটু-জল ভেঙে বিল পেরিয়ে সে নম-শূদ্রদের পাড়ায় যায়; সেখানে এই জিনিষ-গুলোর বদলে মেয়েদের কাছ থেকে ধান পায়। তাতে পয়সার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে। যেদিন সকাল সকাল ফিরতে পারে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাট্‌তে যায়। সেখান থেকে ফিরে বাড়ী এসে শাঁখা তৈরি করতে বসে—তাতে প্রায় রাত দুপুর হয়ে যায়। এমন বিষম পরিশ্রম করেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েক মাস ছেলে-পুলে নিয়ে দুবেলা দুমুঠো খাওয়া চলে। তার আহারের নিয়ম এই যে, খেতে বসেই সে একঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হচ্চে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চারমাস তার একবেলার বেশি খাওয়া জোটে না।

আমি এক সময়ে এঁকে কিছু দান করতে চেয়েছিলুম। মাষ্টারমশায় আমাকে বল্লেন, তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট করতে পার দুঃখ নষ্ট করতে পার না। আমাদের বাংলা

দেশে পঙ্গু ত একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেচে। সেই মাতার দুধ তুমি ত অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না!

এই সব কথা ভাববার কথা। স্থির করেছিলুম এই ভাবনাতেই প্রাণ দেব। সেদিন বিমলকে এসে বল্লুম—বিমল, আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূল ছেদনের কাজে লাগাব।

বিমল হেসে বল্লে, তুমি দেখচি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না।

আমি বল্লুম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।

এমনি করে কথাটা হাসির উপর দিয়েই গেল। আসলে বিমল স্বভাবত, যাকে বলে, মহিলা। ও যদিও গরিবের ঘর থেকে এসেচে কিন্তু ও রাণী। ও জানে, যারা নীচের শ্রেণীর, তাদের সুখদুঃখ ভালোমন্দর মাপকাঠি চিরকালের জন্যই নীচের দরের। তাদের ত অভাব থাকবেই কিন্তু সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়। তারা আপনার হীনতার বেড়ার দ্বারাই সুরক্ষিত। যেমন ছোটো পুকুরের জল আপনার পাড়ির বাঁধনেই টিঁকে থাকে। পাড়িকে কেটে বড় করতে গেলেই তার জল ফুরিয়ে পাঁক বেরিয়ে পড়ে। যে আভিজাত্যের অভিমানে খুব ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে ভারতবর্ষ খুব ছোটো ছোটো গৌরবের আসন ঘের দিয়ে রেখেচে, যাতে-করে ছোটো ভাগের হীনতার গণ্ডির মধ্যেও নিজের মাপ-অনুযায়ী একটা কৌলিন্য এবং স্বাতন্ত্র্যের গর্ব স্থান পায়, বিমলের রক্তে সেই অভিমান প্রবল। সে ভগবান মনুর দৌহিত্রী

বটে। আমার মধ্যে বোধ হয় গুহক এবং একলব্যের রক্তের ধারাটাই প্রবল; আজ যারা আমার নীচে রয়েচে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারিনে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবচে ভারতবর্ষই নাবচে, তারা যত মরচে ভারতবর্ষই মরচে।

বিমলকে আমার সাধনার মধ্যে পাইনি। আমার জীবনে আমি বিমলকে এতই প্রকাণ্ড করে তুলেচি যে, তাকে না পাওয়াতে আমার সাধনা ছোটো হয়ে গেছে। আমার জীবনের লক্ষ্যকে কোণে সরিয়ে দিয়েচি বিমলকে জায়গা দিতে হবে বলে। তাতে-করে' হয়েচে এই যে, তাকেই দিনরাত সাজিয়েচি পরিয়েচি শিখিয়েচি, তাকেই চিরদিন প্রদক্ষিণ করেচি,—মানুষ যে কত বড়, জীবন যে কত মহৎ সে কথা স্পষ্ট করে মনে রাখতে পারিনি।

তবু এর ভিতরেও আমাকে রক্ষা করেচেন আমার মাষ্টারমশায় —তিনিই আমাকে যতটা পেরেচেন বড়র দিকে বাঁচিয়ে রেখেচেন, নইলে আজকের দিনে আমি সর্ব্বনাশের মধ্যে তলিয়ে যেতুম। আশ্চর্য্য ঐ মানুষটি। আমি ওঁকে আশ্চর্য্য বলচি এই জন্যে যে আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে কালের সঙ্গে ওঁর এমন একটা প্রবল পার্থক্য আছে। উনি আপনার অন্তর্যামীকে দেখতে পেয়েচেন সেইজন্যে আর কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না। আজ যখন আমার জীবনের দেনাপাওনার হিসাব করি তখন একদিকে একটা মস্ত ঠিকে-ভুল, একটা বড় লোকসান ধরা পড়ে, কিন্তু

লোকসান ছাড়িয়ে উঠতে পারে এমন একটি লাভের অঙ্ক আমার জীবনে আছে সে কথা যেন জোর করে বল্‌তে পারি।

আমাকে যখন উনি পড়ানো শেষ করেচেন তার পূর্ব্বেই পিতৃবিয়োগ হয়ে আমি স্বাধীন হয়েচি। আমি মাষ্টারমশায়কে বল্লুম, আপনি আমার কাছেই থাকুন, অন্য জায়গায় কাজ করবেন না।

তিনি বল্লেন, দেখ, তোমাকে আমি যা দিয়েচি তার দাম পেয়েচি, তার চেয়ে বেশি যা দিয়েচি তার দাম যদি নিই তাহলে আমার ভগবানকে হাটে বিক্রি করা হবে।

বরাবর তাঁর বাসা থেকে রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করে চন্দ্রকান্ত বাবু আমাকে পড়াতে এসেচেন, কোনোমতেই আমাদের গাড়ি ঘোড়া তাঁকে ব্যবহার করাতে পারলুম না। তিনি বল্‌তেন, আমার বাবা চিরকাল বটতলা থেকে লালদিঘি পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়ে আফিস করে আমাদের মানুষ করেচেন, শেয়ারের গাড়িতেও কখনো চাপেন নি, আমরা হচ্চি পুরুষানুক্রমে পদাতিক।

আমি বল্লুম, না হয় আমাদের বিষয়কর্ম্মসংক্রান্ত একটা কাজ নিন।

তিনি বল্লেন, না বাবা, আমাকে তোমাদের বড়মানুষীর ফাঁদে ফেলো না, আমি মুক্ত থাক্‌তে চাই।

তাঁর ছেলে এখন এম্ এ পাস করে চাকরি খুঁজচে। আমি বল্লুম, আমার এখানে তার একটা কাজ হতে পারে।—ছেলেরও সেই ইচ্ছে খুব ছিল। প্রথমে সে তার বাপকে এই কথা জানিয়েছিল, সেখানে সুবিধে পায়নি। তখন লুকিয়ে আমাকে

চোর

(ডিকিন্সের Dr. Marigold গল্পের আভাসে রচিত)

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—কলুর ছেলে, বাপ-দাদার মত ঘানি ঠেলে খাব তা না, ইস্কুলের মাষ্টার মশাই পাঁচুদা বাবার মাথায় কি খেয়াল ঢুকিয়ে দিলেন, সে একেবারে পণ করে বস্‌ল ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্দর লোক করবে। তা বেশ! ভদ্দর লোকের ছেলেরা লাঙল ধর্‌তে শিখুক আর চাষাভুষোর ছেলেগুলো কানে কলম গুঁজুক—সব উল্টো না হলে আর কলিকাল বল্‌বে কেন! একেবারে একটানা গোরুর ল্যাজ মল্‌তে মল্‌তে বাবার মেজাজ হয়েচে একরোখা। ভদ্দর লোক হতে হবে যখন একবার তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তখন মেরে-পিটে ভদ্দর না করে আমাকে ছাড়বে না।

মাষ্টার মশাই বিপদটি ঘটালেন: কিন্তু লোকটি খাসা, একেবারে সদাশিব। তাঁর হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে বাবা ভাবলে ছেলের জন্যে আর ভাবতে হবে না, বিদ্যের সাগর লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে ছেলেটা সংসারে একটা বিপরীত লঙ্কাকাণ্ড করে বস্‌বে। যতক্ষণ বাড়ী থাকতুম বাবা একদিকে গোরুকে ঠেলা দিত, একদিকে আমাকে। বই হাতে করে চেঁচিয়ে পড়তে হত। ঘানির ক্যাঁচক্যাঁচানির সঙ্গে সুর মিলিয়ে দুই গালে হাত দিয়ে কনুই দুটো দুই হাঁটুর উপর রেখে পিঁড়িতে বসে কপালে চোখ তুলে দুলতে দুলতে সুর করে চেঁচাতুম "কয়ে আকার ক কাক," "দুই একে দুই, দু দুগুণে চার।" গোরুগুলো ভাবত ছোঁড়াটা আমাদের চেয়েও অধম, ঘানিও ঠেলে না,

তেলও বের করে না, শুধু শুধু চেঁচিয়ে মরে। তার উপরে চোখে-ঠুলির আরামটুকুও আমার ছিলনা—বইয়ের পাতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হত।

বহুতর কানমলার ভিতর দিয়ে যখন কথামালায় পৌছলুম, বাবা আর থাকতে পারল না, সহর থেকে একসঙ্গে একজোড়া জুতো আর একটা ছাতা কিনে আমাকে ভদ্দর-আনার পয়লা ধাপে চড়িয়ে দিল। সেই থেকে আমার বইয়ের বোঝা যত বাড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে বাবুয়ানার আসবাবও বাবা যোগাতে লাগল।

দশ বছর বয়সে একটি চার বছরের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হল। মা ছিল না, দেখবার কেউ নেই বলে বাবা অনেক দিন বউ ঘরে আনে নি। আমাকে মাঝে মাঝে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাত বটে কিন্তু সেখানে স্ত্রীর চেয়ে স্ত্রীর ঠাকুরমার সঙ্গেই আমার আসর জমত সুতরাং স্ত্রী যে কি রত্ন তখন পর্য্যন্ত মালুম করিনি।

যে বছর ছাত্রবৃত্তি দেব একদিন হাট-বারে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাট থেকে ফিরে এসেই বাবার খুব চেপে জ্বর এল। রাত্রে আমাকে বল্লে, "ওরে হ্যাপ্‌লা! বৌমাকে আনতে পাঠা, তাকে অনেকদিন আনা হয়নি।" বৌ এল, কিন্তু তার সেবা বাবা বেশিদিন ভোগ করল না, ভাদ্রমাসের দিনসাতেক থাকতেই সংসার থেকে বিদায় নিল। দিনকতক এমন হল, বাড়ীতে ঢুকতেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। দাওয়ার উপর সেই তার পীঁড়েখানি, দেওয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো ছেঁড়া ছাতা, দরজার পাশে হুঁকোটি; সব ঠিক আছে, কেবল নেই আমার বাবা। ছেলেবেলা থেকে মাকে পাইনি, বাবার কোলেই মায়ের কোল পাতা ছিল।

একটি দিনের তরেও মনে পড়ে না যে বাবা কখনো গায়ে হাত তুলেছে।

ঘানি ত ছেড়েইচি তার পরে আবার বই ছেড়ে এবার বৌ নিয়ে পড়লুম। পরিবারটি আমার নেহাৎ নিন্দের ছিলনা। কিন্তু কি বলব, দেহে তার রাগটা বড় বেশি। তের বছর তার সঙ্গে ঘর করেছি তবু বেঁচে আছি,—মানুষের প্রাণ এতই কঠিন! সে যখন রাগ্‌ত পোষা কুকুরটার ল্যাজটা তার পেটের সঙ্গে সমান হয়ে যেত; আমার ল্যাজ নেই কিন্তু সমস্ত দেহটাকেই ঐ ল্যাজের মত গুটিয়ে ফেলবার ইচ্ছে হত।

মেয়েটাকে যখন জন্ম দিলে ভাবলুম এইবারে রাগের ঝাঁজ কিছু মরবে। উল্টো হল, আগে একজনের উপর রাগ ফলাত এখন আরেকটাকে পেলে। ফুলি চার বছরেরটি হলে তাকে এমনি বেদম মার আরম্ভ কর্‌ল যে সে আমি দেখতে না পেরে বাইরে বেড়িয়ে পড়তুম। বল্লে বিশ্বাস কর্‌বে না, অসহ্য হয়ে দুই একবার তাকে মেরেওচি,—কিন্তু সে মার শেষকালে গিয়ে পড়্‌ত আমার ফুলুর পিঠেই, তাতে তার দুঃখের হিসেব বেড়েই চল্‌ত।

কিন্তু আমার ফুলরাণীর কি সহ্যগুণই ছিল! তার একটি-মাথা ভোম্‌রার মত কালো কুচ্‌কুচে কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল ছিল, সে চুল মুঠো করে ধরে তার মা যখন দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিত, ওগো, তখন যে আমি উন্মাদ হয়ে যাই নি, সেইটেই আমার জীবনের সব চেয়ে আশ্চর্য্য! বলিনি, তার কি সহ্যগুণই ছিল? চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ করে জল পড়ছে, আর আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌চে, "বাবা, তুই ভয় পাস্‌নে বাবা। আমার

কিছু লাগেনি। আমি ত লাগে বলে কাঁদিনে, মা আর মার্‌বে না, ছেড়ে দেবে, বলে কাঁদি।" সেই একরত্তি দুধের মেয়ে, তার সে সব কথা মনে হলে বুক ফেটে যায়।

আবার এদিকে ফুলুর মা তাকে যত্ন করতে কসুর কর্‌ত না। সাজিমাটি দিয়ে তার কাপড় কেচে কেচে একেবারে ধব্‌ধবে করে রাখ্‌ত; সে যা-যা খেতে ভালোবাস্‌ত নিজের হাতে তৈরি করে রেখে দিত। ফুলি কোনো জিনিষের জন্যে আবদার ধরলে সে যেমন-করে-হোক্‌ সাত কোশ তফাতে হেঁটে গিয়েও তাকে জুগিয়ে এনে দিত। কে জানে বাপু মেয়েমানুষের মন, যার জন্যে কোনো কষ্টকে কষ্ট বলে গায়ে মাখ্‌ত না, বুঝিনা তাকে আবার কোন্‌ প্রাণে ধরে ধরে ঠেঙাত!

এই সময় ফুলির রোজ ঘুস্‌ঘুসে জ্বর আসতে লাগল—বোধকরি কোনো রকমে ঠাণ্ডা লেগেছিল। সেই জ্বরে ফুলি একেবারে মাকে ত্যাগ কর্‌ল। মার কাছে শোবে না, মার হাতে ওষুধ খাবে না, আমি ঘরে না থাক্‌লে এক ফোঁটা জলও মার হাত থেকে নেবে না।

সেদিন ফুলির জ্বরটা বেড়েছিল। পিদীম জ্বেলে দিয়ে বৌ পথ্যি তৈরী কর্‌তে গেল। আমি ফুলুকে গল্প বলে ভোলাবার চেষ্টা করছিলুম। খানিকক্ষণ চুপ্‌টি করে থেকে আমাকে ডাক্‌ল, "বাবা!"

"কেন রে?"

"আমার নাম ফুলরাণী হল কেন সেই গল্প বল্‌।"

"বল্‌ছি। আমাদের উঠনে তোর ঠাকুর্দ্দা অনেক ফুলগাছ লাগিয়েছিল। তুই যখন হলি, সব গাছে তখন ফুল ধরেছিল।

একদিন তোর মা একখানা কাঁথা পেড়ে সেখানে তোকে শুইয়ে রেখে কি কর্‌তে ঘরে গেল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি যত ফুল ফুটেছে সব চেয়ে আমার ছোট্ট ফুট্‌ফুটে মেয়েটি সেরা, তাই তোর নাম দিলুম ফুলরাণী।"

"দেখ্‌ বাবা, আজো ঠিক তেম্‌নি ফুল ফুটেছে।" চিরদিনের মত ফুলুর কথা বন্ধ হল, আমার কাঁধে তার মাথাটি লুটিয়ে পড়ল। কতক্ষণ এম্‌নি করে তাকে নিয়ে বসে রইলুম জানি না। কোন্‌ সময় তাকে বিছানায় শুইয়ে রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম—

"ওরে সয়তানী, আর আমার ফুলরাণীর চুলের মুঠি তুই ধর্‌তে পারবিনে রে! সে তোর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে।"

কথাটা কিছু কড়া হল। তখন কি আমার জ্ঞান ছিল? কিন্তু সেই দিন থেকে তার মুখে আর রা ছিল না। যখন তার মাথায় রাগ চাপ্‌ত সে দুই হাতে নিজেকে ধরে ঝাঁকানি দিত, তাতেও ঠাণ্ডা না হলে কবাটে মাথা কুটে রক্তপাত করে ছাড়্‌ত।

এই রকম কোনোমতে দিন কাট্‌তে লাগল। একদিন আমরা দুজনে পথের ধারের ভাঙা বেড়াটা সার্‌ছি দেখি একটি ছোট মেয়ের চুল ধরে টান্‌তে টান্‌তে এক মাগী রাস্তা দিয়ে হন্‌ হন্‌ করে গালাগাল দিতে দিতে চলেছে, আর মেয়েটা, "ওমা, আর মারিস্‌ না রে মা, আর মারিস্‌ না রে!" বলে ফুক্‌রে ফুক্‌রে কাঁদছে, আর থেকে থেকে তার মার হাঁটু জড়িয়ে জড়িয়ে ধর্‌ছে। আমার স্ত্রী সেই শুনে পাগলের মত ছুটে চলে গেল, পরের দিন রায়েদের পুকুরে তার দেহ ভেসে উঠল।

আমিই শুধু বাকী রইলুম। আমি ঘরের জীব, ঘরটি আমার

ভেঙে গিয়ে আমাকে ভাসিয়ে দিল। সারাদিন বাইরে বাইরে কাজ করি কিন্তু কার জন্যে এত খাট্‌ছি যখন চেতন হয় সমস্ত শরীর মন ভেঙে পড়ে।

একদিন পাঁচুদাদা বল্লেন, "ত্যাখ্ ন্যাপ্‌লা! তোকে এত বলি তবুও তুই দ্বিতীয় সংসার করবি নে। এক কাজ কর্। তোর ফুলির মত একটি ছোট মেয়ে নিয়ে মানুষ কর্, মনে করিস্ তোর ফুলিই ফিরে এসেছে।"

এ ত মন্দ কথা নয়।

মেয়ের খোঁজে ফিরতে লাগ্‌লুম। নিজের জাতের মধ্যে কাউকে পেলুম না যে মেয়ে বিলিয়ে দিতে চায়। শেষ অনেক খোঁজ করে একটি মেয়ে পেলুম।

সে বোবা আর কালা। নইলে মেয়ে দেবে কেন?

তার মাথাভরা কালো কোঁকড়া চুল দেখেই আমি তাকে কোলে তুলে একেবারে বাড়ী নিয়ে এলুম। এরও নাম দিলুম ফুলরাণী। সে ত কেবল মানুষের মত নয়, অবোলা জন্তুর মত আমার পোষ মান্‌লে—যেখানে যাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরত, এক মুহূর্ত্ত আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে চাইত না। সে কখন্ আপনা-আপনি আমার ঘরের কাজ বাগানের কাজ শিখে নিল, দিনের মধ্যে কখনো তার হাত কামাই যেত না।

এ মেয়েকে ত কেউ বিয়ে করবে না, মনে করলুম ভালোই হল, কোনোদিন কেঁদে আমার ঘর থেকে ওকে বিদায় করতে হবে না। কিন্তু পাঁচুদাদা আমার মনের মধ্যে বড় একটা ধোঁকা লাগিয়ে দিলে। সে বল্লে মানুষের প্রাণ না পাখী, কখন্ আছে

কখন নেই। তুই যদি খাম্‌খা মারা যাস্‌ তা হলে ও মেয়ের গতি হবে কি?

সে ত ঠিক কথা, এই যে গদাই এত বড় জোয়ান, আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, তিন দিনের জ্বরে মারা পড়ল। কখন কি হয় বলা যায় কি! আমার অভাবে ঐ বোবা কালা মেয়ের দিকে ত কেউ ফিরে তাকাবে না। তাকে বল্লেম, পাঁচু দাদা, একটা পরামর্শ দাও!

পাঁচু দাদা বল্লে, কল্‌কাতায় বোবা-কালাদের শেখাবার জন্যে ভালো ইস্কুল আছে। তুই ফুলিকে সেই ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দে; সেখানে ওকে লিখ্‌তে পড়তে শেখাবে, আর এমন হাতের কাজ শিখিয়ে দেবে যে, ও নিজের গুজরান নিজেই চালাতে পারবে!

মন ঠিক করতে অনেকদিন লাগল। কাছের ধনকে কিছুতেই কাছে রাখ্‌তে পারিনে এমনি আমার কপালের লিখন! দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বল্লেম, আচ্ছা, ওকে কলকাতাতেই পাঠিয়ে দেব। ও যদি আমার সেই ফুলিই হত তাহলে এতদিনে ত ওকে শ্বশুরবাড়ী ঘর করতে যেতে হত!

আমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে মেয়েটা ত ক'দিন ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগ্‌ল। বোবার কান্না বড় দুঃখের কান্না, সে কিছুতেই সহ্য করতে পারা যায় না—কিন্তু সেও আমি সইলুম। একদিন পাঁচুদাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমার ফুলুকে কলকাতার ইস্কুলে দিয়ে এলুম। চলে আসবার সময় সে আমার চাদর চেপে ধরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তখন আমার চোখের জল আর কিছুতেই থাম্‌তে চায়

না। পাঁচুদাদা যদি না থাক্‌ত তাহলে তখনি মেয়েটাকে ফিরিয়ে আন্‌তুম।

আবার আমার ঘর খালি! কিন্তু এবারকার এ ফাঁকাটা সে ফাঁকের মত নয়। এ ফাঁক আবার একদিন ভরে উঠ্‌বে। কিন্তু দিন ত কাটাতে হবে। ফুলুকে মনে করে তার জন্যে একটি শান-বাঁধানো ঘর বানালুম। সেই ঘর সাজিয়ে তোলা আমার এক কাজ হল। আমার স্ত্রী থাক্‌তে আমার যে সব হাঁড়িকুঁড়ি বাসনকোসন ছিল, এতদিন তার কোনো আদর ছিল না। সেগুলি আমি মেজেঘষে মেরামত করে তক্‌তকে ক'রে গুছিয়ে রেখে দিতে লাগ্‌লুম। আমার স্ত্রীর গয়না একটা হাঁড়ির মধ্যে ঘরে মেজের নীচে পোঁতা ছিল। সে আর-একবার আমি খুঁড়ে তুলে নেড়েচেড়ে গুণেগেঁথে ঝেড়েপুঁচে মনে মনে ফুলিকে দান করলুম। ভালোদেখে রবিবর্ম্মার ছবি কিনে দেয়ালে টাঙিয়ে দিলুম,—একটা মেদিনীপুরের মাদুর এনে তার তক্তপোষের উপর পাতলুম। মনে মনে ভয় ছিল কি জানি কলকাতা থেকে ফিরে এলে মেয়ের যদি আমাদের ঘরদুয়োর পছন্দ না হয়।

আমাদের পাড়ার জটাধর রায় এসে উঁকি মেরে বলে, কি নেপালখুড়ো, ঘরে তোমার লাট্‌সাহেবের নেমন্তন্ন আছে না কি? আমি হেসে বলি, আটক কি ভাই, কলিকালে সবই উল্টোপাল্টা। —আমাদের বামুনপাড়ার চাটুয্যেদের ছেলেরা এসে আমার ঘর দেখে ত রেগে জ্বলতে থাকে। তাদের ভাবখানা এই, দেখেছ একবার, কলুর বেটা দুটো অক্ষর লিখ্‌তে পড়তে শিখে একেবারে নবাব হয়ে উঠেচে! কোন্‌দিন আমাদের সপের উপর

এসেই বা বসে!—আমি কথাটি কইনে। এবার যে আমি কার জন্যে সাজাচ্চি সে ত গাঁয়ের কোনো লোক জানেনা—তারা বলে, পিপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে!

ছুটো বছর গেল, আমার ফুলুর শিক্ষার মেয়াদ শেষ হল। আমার আকাশ জুড়ে আজ আগমনীর গান বাজচে। তখন পূজোর ছুটির সময়। আমাকে ত প্রতিমা গড়তে হয়নি, আমার ঘরে আমার এই বোবাকালা মেয়েটির মধ্যে পার্ব্বতী এসেচেন। বামুনপাড়ার চাটুয্যেদের ঘরে যে প্রতিমা দাঁড়িয়েচে সে কি আমার এই উমার চেয়ে বেশী কথা কইতে পারে?

আমার সব সাধ মিট্‌ল। আমার মত হতভাগা যা আশা করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী সুখে আমাদের দিন যেতে লাগ্‌ল।

কিন্তু কাছের ধনকে দূরে নিয়ে যাবার জন্যেই জগৎজুড়ে দিনরাত ষড়যন্ত্র চল্‌চে। বিধাতার একটা কোন পেয়াদা আছে সে হার গাঁথ্‌তে দেবেনা, সে সুতো ছিঁড়বে। এবার আমার বুকের মাণিককে বাইরে ছিনিয়ে নেবার জন্যে কোথা থেকে একটা দূত এসে উপস্থিত হল! একে কোনোদিন চিনিনে কিন্তু তবু ঘরের মধ্যে এর পথ আটক করতে পারিনে।

বয়স তার অল্প—পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে। চোখ ছুটো কেমন তার ভাবে-ভোলা রকমের। নধর দেহ, গৌর বর্ণ। তখন পড়ন্ত বেলা, আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় তাকে দেখ্‌লুম। কিন্তু কোথাও যে সে যাবে, কিছু যে তার দরকার আছে এমন বোধ হল না, অথচ আমার ঘরের মধ্যেও আসে না কেন? একবার মনে হল, পথ হারিয়েচে, পথ জিজ্ঞাসা করবার জন্যে

কোনো মানুষ খুঁজ্‌চে বুঝি? কিন্তু পাশ দিয়ে গোরুর গাড়ি নিয়ে গাড়োয়ান গেল তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলে না।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতেই সে চল্‌তে আরম্ভ করলে, যেন সে পথিকমাত্র, এতক্ষণ যেন সে চলছিল। তাই দেখেই আমার সন্দেহ হল লোকটার একটা-কিছু মৎলব আছে। তাকে ডাক্ দিলুম, "ও মশায়!" কথাটা সে কানেই নিল না। আরো গলা চড়িয়ে বল্লুম, "শুন্‌চেন মশায়?" শোনার ত কোনো লক্ষণ নেই।

যাক্ গে, যে যেতে চায় তাকে যেতে দেওয়াই ভালো—ডাকাডাকি করে লাভ কি? কিন্তু তার পরে দেখা গেল যেতে মোটেই চায় না, আর ডাকাডাকি যে আমি করচি তা নয়—যে জায়গা থেকে ডাক আস্‌চে ঠিক সে জায়গায় সাড়াও মিল্‌ছে। সব কথা ক্রমে বলচি।

আমার ফুলুর মুখে কথা নেই কিন্তু কোনদিন হাসির অভাব ছিল না। তার চোখের কালো তারার মধ্যে পর্য্যন্ত হাসি। কদিন দেখ্‌চি সে হাসিও আজ বোবা হয়ে এসেচে। বিধাতা ত তাকে চুপ করিয়েই রেখেচেন কিন্তু সকল দেহ যে তার কথা কইত সেও যেন আজ-কাল বন্ধ, তার শরীরে আর ঢেউ খেল্‌চে না। যদি জিজ্ঞাসা করি, "ফুলি, তোর কি হয়েছে মা?" অমনি এক-মুখ হাসি দিয়ে সে তার জবাব দেয়। কিন্তু সে হাসি যেন কেমন ফ্যাকাশে। আজ পর্য্যন্ত কখনো তাকে এক মুহূর্ত্ত কাজ কামাই করতে দেখিনি—কিন্তু সেদিন সকালবেলা দেখি বাঁশ-তলায় চুপটি করে করে বসে খিড়কীর পুকুরটার দিকে কেমন হয়ে চেয়ে

ছিল। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম, বোবার মন অন্ধকার, সেখানে সব জায়গায় আমাদের দৃষ্টি চলে না, বোধ হয় পূর্ব্বজন্মকার একটা কোন্ দুঃখু সেখানে জমা হয়ে আছে।

সেদিন মহাজনদের হিসেব চুকতে গিয়েছিলুম, ফিরে আসতে সন্ধে এল। বাড়ীর সাম্‌নে আস্‌তেই দেখি সেদিনকার সেই মানুষটা আমারই বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঠিক আমার সাম্‌নে এসে পড়ল। তাই বটে! চোর না হয়ে ত যায় না। হাত চেপে ধরলুম, দেখি আঙুলে তার আংটি—এই আংটিই ত আমি ফুলুকে দিয়েছিলুম। আংটি তুমি কোথায় পেলে? কোনো জবাবই করে না। ভারি রাগ হল। তাকে হিড়হিড় করে ঘরের মধ্যে টেনে এনে আমার চাদর দিয়ে কসে তাকে খোঁটার সঙ্গে বাঁধলুম। লোকটা তবু একটা কথা বল্লে না। তার ভাবখানা এই, আমাকে বাঁধাটা অনাবশ্যক, না বাঁধলেও নড়ব না। ভাবলুম থানা থেকে চৌকিদার নিয়ে আসি, কথা বলাবার ফন্দী তারা জানে।

এমন সময় ঘরে ফুলু এসে পড়ল। লোকটাকে দেখে তার মুখ শাদা হয়ে গেল। হবেই ত, ওরই হাত থেকে ত আংটি ছিনিয়ে নিয়েচে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ফুলু, এ ত তোমারি আংটি?—সে ঘাড় নেড়ে জানালে হাঁ।—আমি বল্লুম, ভয় কোরো না, এ'কে আমি এখনি পুলিসে দিচ্চি, আর উৎপাত করবে না।

দেখি ফুলুর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল। যত বলি, কাঁদিস্ কেন মা, ততই তার কান্না বেড়ে যায়।

আমার এ কাহিনী আর কি বলব? এইটুকু বল্লেই সবাই বুঝতে পারবে যেখানে এ গল্প শেষ হল সেখানে ফুলির কান্না ফুরিয়ে

হাসি দেখা দিল—কিন্তু সে হাসির রং বেল-ফুলের মত ফুট্‌ফুটে নয়, রক্ত-করবীর মত লজ্জায় টুক্‌টুকে।

আংটি চুরিটার প্রমাণ হল না বটে কিন্তু চুরি করে নিয়ে গেল যার আংটি তাকে,—আমার ফুলরাণীকে।

কেমন করে জান্‌ব, ওদের বোবা-কালাদের ইস্কুলে পুরুষদের বিভাগে এই ছেলেটা পড়ত ;—সেইখানে দুরের থেকে বোবায় বোবায় চোখে চোখে দেখা এবং শোনা দুইই। নিঃশব্দে সব কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে, অন্তর্যামী ছাড়া কেউ শোনে নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, জাত কি ?—জাতে মেলে না। পণ্ডিতের কাছে গেলেম সে বলে বিয়ে ত চল্‌বে না।

ফুলুকে এসে বল্লুম, ও ফুলু জাতে বাধে যে!—তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সে দিনটা আর কিছু বল্লুম না। রাতও গেল কেটে। পরের দিন তার চোখ দুটো দেখি ফুলে লাল হয়ে উঠেচে।

তখন তার চোখ দুটি থেকে বিধান পেলেম। যারা বোবা কালা তারা সবাই এক জাতের, যারা কথা কয় তাদের জাতের আর সীমা সংখ্যা নেই।

ছোঁড়াটা সাহেবের বাগানের মালী। আমার ফুলরাণী সেই ফুলের দেশে রাজত্ব করতে চল্‌ল।

তার পরে দিনকতক আমি কাঁদলেম। তার পরে ভাবচি আর যাই হোক্‌ মরতে পারব নিশ্চিন্ত হয়ে।

শ্রীমাধুরীলতা দেবী।

আদর্শ

সেকালের মেয়ের সহিত একালের মেয়েদের তুলনায়-সমালোচনা অনেকবার হইয়া গিয়াছে, সে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যতই ইচ্ছা এবং চেষ্টা করি না কেন, ঠিক সেই ছাঁচে নিজেদের ফের ঢালাই করা, সেই সংস্করণ অক্ষরে অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত করা এখন অসম্ভব, ইহা নিশ্চিত। কারণ অধিকাংশ লোকই চারিপাশের চাপে গড়িয়া উঠে, এবং সমাজ সেই চাপ দিবার যন্ত্রবিশেষ। এক এক সময় এই সামাজিক চাপে মেয়েদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কিন্তু স্বভাব কিম্বা শিক্ষার গুণে কিম্বা দোষে অধিকাংশস্থলে তাহারা চীন-রমণীর পায়ের ন্যায় সেই চাপ অনুসারে নিজেদের গড়িয়া লয়,—এমন কি একটু ঢিলা পড়িলে অস্বস্তি বোধ করে,—অভ্যাসের এমনি মহিমা! কোন শঙ্কর মহারাজের এক কলমের টানে, এক পরোয়ানার জোরে যদি একদিনে বাঙ্গলাদেশে অবরোধপ্রথা রহিত হইয়া যায় (হায় রে দুরাশা!) তাহলে বাঙ্গালীর মেয়ে কি প্রথমে সত্য সত্যই সন্তুষ্ট হয়? যেমন "স্বভাব ম'লেও যায় না", তেমনি স্বাধীনতাও পাইলেই লওয়া যায় না,—তাহার মূল্য বুঝিতে পারা, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারার জন্য আগে শিক্ষা দরকার; এবং সে শিক্ষার জন্য সময় দরকার। তবে সামাজিক মন বলিয়া যদি কোন পদার্থ থাকে, তাহা অজ্ঞাতসারেও শ্রেয়ঃপথে চলিবে, ইহাই আমাদের আশা ও প্রার্থনা। আমরা চাই,—যতই অন্ধ ও দুর্ব্বলভাবে

হউক না কেন,—তবুও আমরা চাই যে, যাহা সত্য তাহাই ধরি, যাহা ভাল তাহাই করি, যাহা সুন্দর তাহাই গড়ি। "সেকাল গেছে বইয়া",—আর ফিরিবে না। এখন একালে কঃ পন্থা, —তাহাই জিজ্ঞাস্য।

আমাদের দেশে এত বিভিন্নপ্রকার লোকাচার প্রচলিত যে, মনে হয়—যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে। এখানকার প্রকৃতিও যেমন বহুরূপী, সম্প্রদায়ও তেমনি অসংখ্য, রীতিনীতিও তেমনি জটিল। আমাদের অগাধ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া, না পাওয়া যায় হেন মত নাই,—আমাদের বিপুল দেশে অনুসন্ধান করিলে, না মেলে হেন প্রথা নাই। কোন একটি ইংরাজ রাজপুরুষ বলিয়াছেন না কি যে ভারতবর্ষে পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সভ্যতার সকল স্তরই বিদ্যমান। কথাটি লাখ কথার এক কথা। কৌলিন্য ও ব্রহ্মচর্য্য, নাস্তিকতা ও পৌত্তলিকতা, হিঁদুয়ানি ও ম্লেচ্ছপনা, অহিংসা ও নরবলি, সাহেবিয়ানা ও স্বদেশীয়ানা, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী ভাব, মত ও আচার কিরূপে এমন নির্ব্বিবাদে এক দেশে, এক কালে, এক সম্প্রদায়ে, এমন কি এক গৃহতলে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বাস করিতে পারে, তাহা বিদেশী বুঝিবে কি,—আমাদেরই বুঝিয়া ওঠা ভার।

তবে কি আমাদের দেশ এক নহে, আমরা এক জাতি নহি? —অতীতে কি ছিল ঠিক বলিতে পারি না,—সম্পূর্ণ "স্বরাজ" না থাকুক, অন্ততঃ "স্ব স্ব রাজ" ছিল বোধ হয়। কিন্তু আচারে আজকাল আমরা যেমন সঙ্কীর্ণ, মত ও বিশ্বাসে তেমনি চিরকালই আমরা কিছু অতিরিক্ত উদার। আমাদের দোষও তাই, আমাদের

গুণও তাই। ভারতমাতা নির্ব্বিচারে সকল দেশের সকল কালের ধর্ম্মকর্ম্মকে নিজের অঙ্কে স্থান দিয়াছেন,—গ্রহণ, পালন ও রক্ষা করিয়াছেন, কোন অতিথিকে ফিরান নাই।

কিন্তু জাতিগঠন করিতে হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট কিছু হওয়া চাই। মানুষ স্বভাবতঃ সর্ব্বজনীন জীব নহে;—আগে বিশেষ দেশের বিশেষ কালের মানুষ হইয়া সে জন্মায়, তাহার পর সাধনার ফলে বিশ্বমানবের অংশীদার হইয়া উঠিলে তবে তাহাকে মানায়। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য হইতে ক্রমে পরমাত্মার সাযুজ্যে পৌঁছিতে পারিলে তবে ত সুখ,—নহিলে সাকার নিরাকারের কোন অর্থই থাকে না, সবই একাকার। সেই বিশিষ্ট আকারটি আমাদের নিজের জাতকে দিবার সময় আসিয়াছে, এখন যেন সৃজনের পূর্ব্বে নীহারিকার ন্যায় আমাদের অবস্থা।

নিরাকার উপদেশ অপেক্ষা সাকার দৃষ্টান্ত ভাল। ছেলেবয়স হইতে বুড়াবয়স পর্য্যন্ত অনেকপ্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ত প্রত্যেক মানুষের ভিতরকার ঐক্য বজায় থাকে, নষ্ট হয় না। সেইরূপ আমাদের আপাতদৃষ্ট বৈচিত্র্য এবং বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও যে এক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাকে নব কলেবর ধারণ করিতে হইবে।

হিন্দু জাতির মুস্কিল এই যে, তাহার সেই সূক্ষ্মশরীর এতই সূক্ষ্ম যে, মনশ্চক্ষেও ধরা কঠিন। হিন্দুত্বের প্রাণ কিসে এবং কোথায়, সে সম্বন্ধে এলাহাবাদের এক কাগজ কিছুকাল পূর্ব্বে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, তাহার বিভিন্ন উত্তর হইতে এই বিষয়ের দুরূহতা প্রতিপন্ন হইবে।

কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে কিম্বা বুঝাইতে না পারিলেও আমরা মনে মনে জানি আমরা এক। কেবল ইংরাজরাজের সূত্রপাত হইতে আচম্‌কা নানা নূতন ভাবের ও কাজের প্রেরণায় এবং তাড়নায় আমাদের স্বাভাবিক পরিণতি এত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে সব-দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন। সময়ে যে ঐক্যবিধান করে তাহা মানানসহি হয়, কিন্তু সুবিধার খাতিরে রাতারাতি জোরজবরদস্তি করিয়া যে বাহ্য ঐক্যসাধন করিতে হয়, তাহা প্রায়ই সৌষ্ঠবহীন।

আমাদের চিরনিদ্রিত দেশ-কুম্ভকর্ণের ঘুম যে সম্প্রতি ভাঙ্গিয়াছে এবং তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী ভারত-ললনাও যে জাগিয়াছে, তাহার প্রমাণ সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পাওয়া যাইতেছে। এখনই সুসময়। "সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই" কালে,—এ কথা আমাদের সকলেরই মনে করা উচিত, অন্ততঃ যাহাদের "এই দেশে"র জন্য কিছু করিবার কিছুমাত্র অভিপ্রায় আছে। বর্ত্তমান কাল-পুরুষের নিঃশ্বাস বেগে পড়িতেছে, তাহার রক্ত জোরে বহিতেছে, তাহার নাড়ীর গতি চঞ্চল। এই সুযোগে যিনি যাহা করিবেন তাহার ফল হইবার যত সম্ভাবনা, প্রত্যেকের হাতে জাতিগঠনে সহায়তা করিবার যত ক্ষমতা দেখা যায়, এমন দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশকালে বিরল।

কিন্তু এ সময়ে অবিবেচনার ফলও সেই পরিমাণ মন্দ হইবার সম্ভাবনা, তাই সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন প্রথম ধাক্কা সামলাইয়াছি। ভালই হউক, মন্দই হউক, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সমাজসংস্কারের যে স্তরে আমাদের তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেখান হইতে আমরা চারিধার দেখিবার, বুঝিবার ও যাচাই করিয়া লইবার

সুবিধা পাইয়াছি। এই মৃৎপ্রদীপের দেশে এতদিনে বৈলোতিক ভাবের বৈদ্যুত আলো চোখে সহিয়া গিয়াছে,—এখন আর অন্ধভাবে কাজ করিবার ওজুহা নাই। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বলিবার কাল গিয়াছে। এখন "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

সেই সদ্‌গুরু আমাদের উপদেশ দিন, একালের বাঙ্গালীর মেয়ে কোন্ আদর্শ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক জীবনপথে অগ্রসর হইবে! সীতা সাবিত্রীর কথা তুলিবেন না। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। তাঁহারা চিরকালই আমাদের চিত্তাকাশে তারার ন্যায় জ্বল্‌জ্বল্ করিবেন, কিন্তু তারার আলোয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। ওদিকে পশ্চিম সমুদ্র পারে নানাপ্রকার নব-নারীদলের বিদ্রোহ রণযাত্রার রক্তবর্ণ মশালের আলো আমাদের নবজাগ্রত চক্ষু ও চিত্তে ধাঁধা লাগাইতেছে। সেই বিদেশিনীকে "তোমারে সঁপেছি প্রাণ" বলিয়া আমরা কেহ কেহ তাহার পায়ে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছি, কিন্তু সত্যই কি আমরা তাহাকে "চিনি গো চিনি তোমারে" বলিতে পারি? এই তারা ও মশালের আলোর মধ্যবর্ত্তী স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্থিরজ্যোতি সন্ধ্যাপ্রদীপ কে জ্বালিয়া দিবে?

আমরা দৈনিক জীবনের সহযাত্রী চাহি,—যিনি আমাদের সুখদুঃখ সুবিধা-অসুবিধা বুঝিবেন, আমাদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করিবেন, অথচ যিনি আমাদের কাজে কর্ম্মে, গৃহে সমাজে, আচারে অনুষ্ঠানে, ভাবে ভাষায়, চাল চলনে অধিনেত্রী হইবেন; কোন একজন বিশেষ দেবী বা মানবী নহেন, কিন্তু বহুকালের বহুলোকের সাময়িক আত্মপ্রকাশ—শুধু কথার সমষ্টি নহে, কিন্তু এখনকার আদর্শ বঙ্গরমণীর সুস্পষ্ট ধ্যানমূর্ত্তি।

আমরা আধুনিক বঙ্গনারী "কি করব, কি বেশ ধরব", কি প্রকার গৃহস্থালী, কিরূপ সামাজিক আচরণ অবলম্বন করিব, যাহাতে কালে একটি সুশোভন, সুসঙ্গত, সুশৃঙ্খল নব্য বঙ্গসমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে—যে সমাজ গতকালের সহিত যোগ ত্যাগ না করিয়াও অনাগতকালের প্রতি মনোযোগ করিবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের দোষ বর্জ্জনপূর্ব্বক গুণের মিলন সাধিতে হইবে, সে কথা "বলিতে সহজ বটে, করিতে তা' নয়।" কি প্রণালীতে, কোন্ পরিমাণে কোন্ মশলা বা দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়, তাহার উপরেই আহার্য্যের তার এবং ঔষধের গুণ নির্ভর করে। অযথা মাত্রায় অমৃতও বিষে পরিণত হয়। আপাততঃ আমরা অধিকাংশ লোক অন্তরে ও বাহিরে,—বিশেষতঃ বাহিরে,—যে-ভাবে পূর্ব্ব পশ্চিম মিলাইয়াছি, তাহাতে দুইয়ের একত্রীকরণ হইয়াছে মাত্র, একীকরণ হয় নাই। এই রাসায়নিক মিলনটি যদি আমরা ঘটাইতে পারি, তাহলে আমাদের মেয়েরা তাহার সুফল ভোগ করিবে। দুই নৌকায় পা দিয়া টলমল করিবার/বিপদ হইতে যেন তাঁহাদের উদ্ধার করিয়া যাইতে পারি।

এ সকল বিষয়ে এত মতভেদ ও গোলযোগের কারণ এই যে, চিন্তা ও কার্য্য পাশাপাশি চলিলেও, সমান পদবিক্ষেপে চলে না। এ যেন ধীরগামী বৃদ্ধের সহিত চঞ্চল বালকের বিচরণ। বৃদ্ধ শান্তদান্ত সমাহিতচিত্তে, নতনেত্রে, অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সমভাবে চলিয়াছেন, ভূত ভবিষ্যতের ছবি মনোমধ্যে বায়োস্কোপের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরিয়া যাইতেছে, বর্ত্তমানের সহিত যোগসূত্রস্বরূপ বালকটির লীলাখেলা দেখিয়া মাঝে মাঝে হাসিতেছেন, কখনো কখনো তাহার সরল চতুর প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, আবার

মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন; বালকটি হাস্যোজ্জ্বল মুখে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বৃদ্ধের হাত ধরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহার ন্যায় গুরুগম্ভীরভাবে চলা কি তাহার পোষায়? সে কখনো লাফায়, কখনো প্রজাপতির পিছনে ছোটে, কখনো পথপার্শ্বের ফুল কুড়ায়, কখনো অকারণ-আনন্দে দৌড়িয়া অগ্রসর হয়, আবার দৌড়িয়া পিছাইয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরে, তাঁহাকে অসংখ্য অসম্ভব প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তোলে, এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই আপনার কথা সাত-কাহন করিয়া বকিয়া যায়। অথচ দুইজনেরই পরস্পরকে নহিলে চলে না। এই জুড়িই জীবনশকটের বাহন, তাই আমাদের এমন অপূর্ব্ব তরঙ্গায়িত গতি!

চিন্তাশীল ভাবুক লোক যতক্ষণ কথায় বা লেখায় তাঁহার বিচারের ফল প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এদিকে ততক্ষণ তাঁহার নিজেরই সংসারের কাজ সেই মতামতের পরিণতির অপেক্ষায় বন্ধ থাকিতে পারে না,—যেন তেন প্রকারে তাঁহাকে চলিতে এবং চালাইতে হইবেই। সেই জন্য আমাদের কথায় ও কাজে এত গরমিল, আমাদের জীবনে ও মনে এত অসঙ্গতি পদে পদে দৃষ্ট হয়। কর্ম্ম প্রথমে ঝোঁকের মাথায় হয় ত বিপথে চলিতে থাকে, তারপর চিন্তা যখন তাহার নাগাল পায় তখন তাহাকে সৎপরামর্শ দিয়া গতিবেগ মন্দ করাইয়া কিছুদূর ফিরাইয়া আনে,—আবার সে এগাইয়া যায়, আবার চিন্তার আকর্ষণে পিছু হটে। সেই জন্য জীবনের গতিরেখা সরল নহে,—ঐ প্রকার কুটিল, অর্থাৎ অগ্রপশ্চাৎ করিতে করিতে তবে সে অগ্রসর হয়,—যেমন সেই বালক পিছাইয়া আসিয়া আবার বৃদ্ধের সঙ্গ ধরে।

ঋষিগণ ধর্ম্মের পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় কহিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মের পথ যে কতক পরিমাণ করাতের ন্যায়, সে তথ্য তাঁহারা জানিতেন কি না কে জানে! সকল কাজই যদি বিবেচনাপূর্ব্বক করিতে হইত, তাহলে বোধ হয় মানুষ এক পাও এদিক ওদিক নড়িতে পারিত না, স্থাণু হইয়া থাকিত। চিরাগত সংস্কার ও সামাজিক প্রথা এই সঙ্কট হইতে আমাদের পরিত্রাণ করে। সুতরাং সেগুলিকে হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া কিছু নয়। আর সেগুলির পিছনেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষের চিন্তা রহিয়াছে, সেগুলি কিছু আকাশ হইতে পড়ে নাই। কর্ম্ম যখন চিন্তাকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, তখন এই পূর্ব্ব-সংস্কারই তাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করে ও ধাত্রীর ন্যায় নূতন চিন্তা-সমাগমের অপেক্ষা করে। সেকালের হিন্দুগণ সকল বিষয়েরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া তবে ছাড়িতেন,—এস্থলেও তাঁহারা চিন্তার অতি স্বাধীনতা এবং কর্ম্মে অতি অধীনতা স্বীকার করিয়া এই বৈষম্যের মীমাংসা করিয়াছেন।

কিন্তু আজকাল জ্ঞাতসারে মতে ও কাজে অত তফাৎ করা আমাদের মনঃপূত নহে। সম্পূর্ণরূপে না পারিলেও, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করিবার চেষ্টাও ত করা উচিত?—তাই বলি সেকালের জীবনযাত্রার যতই সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য থাক্ না কেন, একালে আমরা তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিব না, কারণ আমরা আজকাল তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, সে সরল নির্ভরের ভাব হারাইয়াছি। তখন ছিল পূর্ব্বানুবৃত্তির কাল, বাধ্যতার কাল;—এখন হইয়াছে পরীক্ষার কাল, স্বাধীনতার কাল। যস্মিন কালে যদাচারঃ। এখন

পৃথিবীময় স্বাধীনতার হাওয়া বহিতেছে, কেহ কাহারো অধীনতা স্বীকার করিতে নারাজ। "পড়ে এই কলির ফেরে সব যেরে ভেঙে চূরে ভেসে যায়।" এই ভাঙ্গনের দিনে, উচ্ছৃঙ্খলতার মুখে, আমরা মেয়েরা যদি একটু মাথা ঠাণ্ডাভাবে হাল ধরিতে না পারি, তাহলে সংসারতরী যে কোন্ রসাতলে তলাইয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই।

পরিবর্ত্তনের কালে অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী। মনে করিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব্য বঙ্গসমাজ অহিরাবণের ন্যায় বর্ম্মচর্ম্মসমাবৃত যোদ্ধৃবেশে অবতীর্ণ হইবে না। যিনি এই সকল বিপরীত ভাব মত এবং আচারের কথঞ্চিৎ "সমন্বয়" সাধন করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই জানেন সে কাজ কত দুঃসাধ্য। কিন্তু অসাধ্য নহে,—যদি আমরা সকলে মিলিয়া চেষ্টা করি। স্রোতে গা ভাসাইয়া না দিয়া কেহ কোন বিষয়ে যুগোপযোগী অনুষ্ঠানের ইচ্ছা বা চেষ্টার কোন পরিচয় দিতেছেন দেখিলেও আনন্দ বোধ হয়। পরদেশী সঁইয়ার গলায় মাল্যদান যখন কপালে লেখা আছেই, তখন নিজে জাতিভ্রষ্ট না হইয়া তাঁহাকে কিরূপে জাতে তুলিয়া লওয়া যায়, ইহাই সমস্যা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাজ করে সকলেই, কিন্তু ভাবে দুই চারি-জন মাত্র। অথচ এই ভাবনাই কার্য্যসিদ্ধির উপায়। চিন্তা ও কর্ম্ম পরস্পর-আশ্রিত,—যেমন বুদ্ধি ও হৃদয়, দক্ষিণ-হস্ত ও বামহস্ত। কামার কুমোর ছুতার প্রভৃতি যেমন আমাদের ভবের হাটের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে, ভাবুক লোক ও চিন্তা-শীল লেখক তেমনি আমাদের ভবলীলার আধ্যাত্মিক প্রয়োজন

সাধন করেন। কিন্তু তাঁহাদের বাণীর জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখার ভার আমাদের হাতে। অনেকে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়াও স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে,—কিন্তু শেষ-রক্ষা হয় কি না সন্দেহ।

বাঁচিয়া থাকিতে গেলে যখন শিখিতেই হইবে, তখন "ঠেকে শেখা" অপেক্ষা "দেখে শেখা" ভাল। যাহারা হাটে কেনাবেচা করিয়াই দিন কাটায়, তাহাদের হয় ত ভাবের কথা কহিবার বা শুনিবার অবসর থাকে না, সব সময় দরকারও বোধ হয় না। কিন্তু মেয়েদের প্রধান কর্ম্মই গার্হস্থ্যধর্ম্ম,—সেই ধর্ম্মপালনের সহায়স্বরূপ ভাবের আদর্শ স্পষ্টরূপে মনে অঙ্কিত হওয়া চাই, জীবনের ভার বহিবে সংসারের ঝঞ্ঝা সহিবে, এরূপ দৃঢ় অটল আশ্রয় অন্তরে সঞ্চিত থাকা চাই। শক্ত কাম্বিসের ছবি আপনি দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু নরম কাগজের ছবি না বাঁধাইলে লুটাইয়া গুটাইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

"বাঙ্গালা দেশের হৃদয় হতে কখন্ আপনি" অপরূপ রূপে মাতৃমূর্ত্তি বাহির হইবেন জানিনা; কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা তাঁহার-একটা কাল্পনিক ছবি আঁকিবার চেষ্টা করি না কেন? ভারত-শিল্পীগণের দ্বারস্থ হইলাম, তাঁহারা তুলিকা ও লেখনী তুলিয়া লউন, এবং নিজের একটি পরমপ্রিয় কন্যা থাকিলে তাহাকে কিরূপে মানুষ করিতেন,—কেবলমাত্র বিবাহের পাত্রী নহে, কিন্তু জীবনের যাত্রী হিসাবে তাহাকে গড়িতে চাহিলে কি কি মালমশলা ব্যবহার ও কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা দানে আমাদের বাধিত করুন। আমাদের

মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা ও দেশের হিতাহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত জানিয়া নিশ্চয়ই আমরা তাঁহাদের সদুপদেশ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব না।

"পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ",—কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে কোন্ মহাপ্রলয় সৃজিত হইতেছে? যাহাই আসুক্ ও যাহাই হউক্, আমরা নিজেদের প্রস্তুত রাখিলে তরঙ্গের অভিঘাত অগ্রাহ্য করিতে পারিব। আধুনিক বঙ্গরমণীকে কোন্ ছাঁচে ঢালিলে ভাল হয় সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকিলে অনেক নিষ্ফলতা ও বাক্‌বিতণ্ডা হইতে অব্যাহতি পাইব। এখন "বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে যায়, ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।"

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

প্রিগ্

"প্রিগ্" কথাটি ইংরাজী। বাংলায় এর জুড়ি নেই।—এর থেকে মোটামুটি দুরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়ঃ—

(১) ঐ জাতীয় জীব বাংলাদেশে কোনও কালে ছিল না এবং

(২) বাংলাদেশে চিরকালই সবাইই প্রিগ্। এ ছাড়া এই সত্যটুকুর উপরে আরো অনেক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় যথা—

(১) প্রিগ্‌কে প্রিগ্ বলবার মত মনোভাব বাংলা দেশে ছিল না, কারণ—

(২) বাংলা দেশে নৃতত্ত্ব-বিদ্যার চর্চ্চা নূতন, ইত্যাদি।

কিন্তু "প্রিগ্ বস্তুটি কি সেই কথা আলোচনা করবার জন্যই এ প্রবন্ধ লেখা।

আমার গোড়াপত্তন দেখেই বুদ্ধিমান পাঠক বুঝতে পেরেচেন যে প্রিগ্ এক জাতীয় মনুষ্য। এ অনুমান সত্য।

কিন্তু, মানুষের জাতিভাগ করা বড় সহজ কর্ম্ম নয়। মনু যা করতে গিয়ে হার মেনেছেন আমি তা করতে সাহস পাইনে।—তাই আমি প্রিগ্‌কে মানুষের এক জাতি না বলে, প্রিগত্বকে মানব-মনের একটি বিশেষ অবস্থা বলে বর্ণনা করতে চাই। কারণ প্রিগ্ যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত আগাগোড়াই প্রিগ্ এবং চিরকালই প্রিগ্ তা আমি বলতে চাইনে।

প্রিগত্বের বর্ণনা করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই নানা রকম করে ব্যাপারখানা কি তা বোঝাতে চেষ্টা করচি।

জার্ম্মান ভাষায় প্রিগকে "উর্দ্ধনাসা" বলে অভিহিত করা হয়।

সকলেই জানেন যে উক্ত অঙ্গ স্বভাবত নীচের দিকেই ঝুলে থাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, কেননা শাস্ত্রমতে পৃথিবী গন্ধগুণ। প্রিগ্ হচ্ছেন তিনি, যিনি মাটিকে বাদ দিয়ে কেবল আকাশের দিকেই নাসিকাটিকে চালাতে চান।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অর্থাৎ ধূলো, ঘাম, ধোঁয়া ও কেরোসিনের আলো এই কটায় মিলে তো সংসার। এগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে "পরিষ্কার" হয়ে যাঁরা থাকতে চান, তাঁদের প্রিগ্ নামে অভিহিত করা যায়।

প্রকৃতির ঘরে যারা সত্যিসত্যি বাস করেছে তারা জানে যে আকাশের অবস্থা প্রায়ই বিশ্রী। হয় বিশ্রী গরম, না হয় বিশ্রী ঠাণ্ডা, না হয় বিশ্রী বাদুলে। তারা জানে যে বাতাস প্রায় সব সময়েই একটা আপদবিশেষ। প্রিগের কিন্তু এই আকাশ বাতাসের উপর "কবিত্ব" করার আর অবধি নেই।

মানুষকে যারা চিনতে চেষ্টা করেছে তারা জানে যে মানুষ মাত্রেই দোষে-গুণে-গড়া।—মানুষের বেশী ভালবাসবারও কিছু নেই—বেশী ঘৃণা করবারও কিছু নেই;—চেষ্টা করলে সবাইকেই অল্প-বিস্তর ভালবাসা যায়। কিন্তু ভালবাসলেই যে তার সঙ্গে চিরকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করা যায় তাও নয়। তোমার ভালবাসার লোকটির শরীর ও মনে কমবেশী ধূলো মাটি আছে। প্রিগ্ কিন্তু এ সত্য দেখতে চান না—তিনি ধরে বসে আছেন "পবিত্র প্রেম"। তিনি মানুষকে "ভাল" এবং "মন্দ" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে বসে আছেন এবং এর একভাগ থেকে আর-এক ভাগে যাবার কোনও পথই দেখতে পান না।

উপরের এ সব কথা থেকে এটা যেন কেউ না ভাবেন যে প্রিগ সংসারটাকে কেবল অসম্ভব রকম "ভাল" বলেই দেখেন। যিনি অসম্ভব রকম "মন্দ" বলে সংসারটাকে দেখেন তিনিও প্রিগ্। কারণ প্রিগত্বের ধর্ম্ম হচ্ছে একটা বুলির সাহায্যে সংসারকে বোঝবার চেষ্টা করা। জীবনের জাল হরেক রঙের হরেক রকম সূতো দিয়ে বোনা। কোন একটি সূত্র ধরে তার নিরাকরণ করবার যো নেই। এ কথা যাঁরা ভুলে যান তাঁরাই প্রিগ। ঘরে দরজা দিয়ে সংসার সম্বন্ধে যাঁরা দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে যান, তাঁদের প্রিগ না হয়ে উপায় নেই। তুলোর বাক্সে কাবুলী-আঙ্গুরের মত জীবন যাঁরা যাপন করেন তাঁরাই হচ্ছেন প্রিগ্।

এ রকম জীবনযাত্রা আমাদের দেশে গত দু তিন পুরুষ থেকেই সম্ভব হয়েছে। তার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রিগ্ হবার সম্ভাবনা আমাদের দেশে অল্পই ছিল। একদিকে উচ্চশিক্ষা এবং অপর দিকে ঘরে বসে পোলাও-কালিয়া খাবার সংস্থান এবং শক্তি এই দুয়ের সমাবেশেই প্রিগত্বটা বেশী জেঁকে ওঠে। কাজেই, প্রিগ-জীবটা আমাদের দেশে নূতন—কিন্তু এতদিন এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি—কারণ আমাদের দেশে নূতন কিছু হ'লে আমরা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য তাকে সিঁদুর চন্দন দিয়ে পূজো করি।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, গত দু পুরুষের লোকেরা অর্থাৎ আমাদের বাপদাদারা প্রায় আগাগোড়া প্রিগ। আমরা আপাততঃ এঁদের প্রিগ বলে বুঝতে শিখছি। কাজেই এ কথাটার চলন নিকট-ভবিষ্যতে বহুলরূপে হবে বলে আশা করা যায়। এখনও আমাদের দেশে প্রিগ যে বড় কম তা নয় কিন্তু তাকে সিঁদুর

চন্দন লেপে পূজো করবার ভাবটা আমাদের অনেকটা কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু এখনও বোধ হয় প্রিগকে ঠিক চেনাতে পারি নি। দু চারটে উদাহরণ দেব।

রয়াল রীডারের জর্জ ওয়াসিংটন একজন মস্ত বড়-দরের প্রিগ, তার প্রমাণ তাঁর সেই চেরীর গল্প। নয় বছরের যে বালক বাপকে গম্ভীরভাবে বলতে পারে "পিতা আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারি না," সে যদি প্রিগ না হয় তবে সংসারে প্রিগ কেউ নেই, কেউ ছিল না, এবং কেউ হবে না। কেন, বাপু, মিথ্যা কথা বলতে পারনা কেন? মনে কি করেছ যে সংসারে কেবল খাঁটি সত্য কথা বলে চালাবে? সংসারকে অত সহজ পাও নি!

আসল কথা হচ্ছে যে, দর্শনের কেতাবে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদির মধ্যে যে রকম স্পষ্ট বিভাগ করা যায়—সংসারে তা যায় না। বেশীর ভাগ ব্যাপারেই খাঁটি সত্য কথা বলা যায় না;—জানলে তো বলব? যিনি প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন "পিতা, আমি মিথ্যা বলিতে পারি না" তিনি গোড়াতে তো এক মস্ত মিথ্যা কথা বল্‌লেনই—তা ছাড়া এ কথাও জানিয়ে রাখলেন যে তিনি চিরজন্ম চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে আর গোবর নিকিয়ে একটা অসম্ভব রকম সহজ এবং ছোট্ট সংসারে বাস করবেন—যে সংসারটা মোটেই সত্যিকার সংসারের মতন নয়। এর ফলে হয় তো তিনি কেবল সত্যি কথাই বলবেন কিন্তু সে সব কথা বলবার কোনও দরকার আছে কিনা সন্দেহ।

যাই হোক, আমাদের দেশের গত পুরুষের প্রিগত্ব প্রায় সবই

এই জাতীয় প্রিগত্ব। তাঁরা সব অসম্ভব রকমের "ভাল লোক" ছিলেন। ভাল হবার বেশ একটা অত্যন্ত সহজ কলও তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন—সেটার নাম হচ্ছে "বিবেকবুদ্ধি"।

আমাদের দেশের কোন একটি খ্যাতনামা ব্যক্তির সম্বন্ধে একটি সত্য গল্প এইরূপ:—তাঁহার এক ভৃত্য একদা যথারীতি বাজারের পয়সা চুরি করিয়া ধরা পড়ে। তাহাকে মনিবের নিকট আনা হইলে তিনি অশ্রুগদ্গদ স্বরে তাহাকে এইরূপ অভিভাষণ করিলেন "বাপু হে, তোমার কি বিবেকবুদ্ধি নাই? তোমাকে আমি খাওয়াই পরাই এবং পুত্রসম স্নেহ করি, তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি কি এতই অপরিপক্ক!" ইত্যাদি। এ গল্পটা হ'তে প্রসঙ্গচ্ছলে আর এক তথ্য আবিষ্কার করা যায়!—প্রিগ হচ্ছেন অসম্ভব রকম গম্ভীরপ্রকৃতির লোক—মন-খুলে হাসতে তাঁকে প্রায়ই দেখা যায় না।

যাই হোক, গতযুগের প্রিগত্বটা আগাগোড়াই এই জাতীয় বিবেকবুদ্ধি-সংক্রান্ত।

সংসারটাকে তাঁরা এক হিসাবে বেশ সহজ করে নিয়েছিলেন। মানুষের মনের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য্য কল তাঁরা দেখেছিলেন যার থেকে প্রত্যেক জিনিষের এবং প্রত্যেক অবস্থার ভাল-মন্দ এক মুহূর্ত্তে বেছে নেওয়া যায়। এবং যে ভালটা বেছে নেয়, সর্ব্বদা সে-ই "ভাল লোক"।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ রকম মতে ভাল লোক হওয়া অত্যন্ত সহজ। তা ছাড়া এ মতের আর-এক অদ্ভুত ফল হচ্ছে এই যে, বিবেক দিয়ে মানুষকেও চিনে নেওয়া যায় এক

মুহূর্ত্তে। মানুষসম্বন্ধেও আমাদের ঠাকুর্দ্দার আমলের লোকেরা অতি সত্বর বিচার করতে পারতেন—একটা লোক ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে তাঁদের বেশী কষ্ট হো'ত না। পারলে তো ভালই; কিন্তু বিবেক-নামক অমন নির্ভুল কষ্টিপাথর মনুষ্য-নামক জীবের অন্তরে ত নেই—আর মানুষও যে এক নয় বহু। যে লোকটা আজকে খুন করেছে—কালকে যে সে একটা লোককে জলে-ডোবা থেকে বাঁচাতে গিয়ে মর-মর হয়েছিল, তার কি?

এ বিবেকসম্বন্ধীয় প্রিগ্রহ যদিও আপাতত অনেকটা কমেছে তবু আজো একেবারে যায় নি। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এর একটা দৃষ্টান্ত সহজেই চোখে পড়ে। কিছুদিন আগে অবশ্য আমাদের সাহিত্য-সমালোচনা অত্যন্ত সহজ ছিল। কেতাবটা "ভাল" কি "মন্দ" সেই বিচারই আমরা করতাম—কিন্তু সেটা প্রায় লেখক "ভাল লোক" কি "মন্দ লোক" এই বিচারেই পর্য্যবসিত হোত। কাজেই হয় "আহা আহা, বাহা বাহা! এমন কি আর পড়ব? এমন কি আর শুনব?" না হয়—

"চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে
"ভস্মরাশি করে ফেল কর্ম্মনাশা জলে।"

আজকাল আমরা তা আর করি নে;—কিন্তু বইটা থেকে সমাজের উপকার কি অপকার হবে তা খুব চট্ করে বলে ফেলতে পারি। আসলে কিন্তু সমাজের জন্ম নিয়মধার্য্য করা, মানুষকে বিচার করার চেয়ে সহজ হ'লেও, একটা কেতাবের মর্ম্ম

উদ্ধার করা ঢের কঠিন। কিন্তু প্রিগ তো আর কিছু বুঝতে চেষ্টা করা আবশ্যক মনে করেন না। তিনি যে সূত্র ধরে বসে আছেন সেই সূত্রের উপর নখের আঁচড় দিয়ে নানারকম সুর ও তান বার করতেই তিনি ব্যস্ত। অনেক ভেবেচিন্তে অনেক কষ্ট স্বীকার করে যা বুঝতে হয় তিনি তাকে বিচার করতে ব্যস্ত।

প্রিগ শেষ পর্য্যন্ত এটা বোঝেন না যে বুঝতে চেষ্টা করাটাই হচ্ছে মানুষের আসল কর্ম্ম,—বিচার করা নয়।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু।

দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত। চাপ এত বেশি যে, নিজের ঘাড়ের কথাটা ছাড়া আর কোনো কথায় পূরা মন দিতে পারা যায় না। উঞ্ছবৃত্তি করি, লাথিঝাঁটা খাই, কন্যার পিতার গলায় ছুরি দিই, নিজেকে সকল রকমে হীন করিয়া সংসারের দাবি মেটাই।

রেলে ইষ্টিমারে যখন দেশের সামগ্রীকে দূরে ছড়াইয়া দিত না, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমদানি রফতানি একপ্রকার বন্ধ ছিল আমাদের সমাজের ব্যবস্থা তখনকার দিনের। তখন ছিল বাঁধের ভিতরকার বিধি। এখন বাঁধ ভাঙিয়াছে, বিধি ভাঙে নাই।

সমাজের দাবি তখন ফলাও ছিল। সে দাবি যে কেবল পরিবারের বৃহৎ পরিধির দ্বারা প্রকাশ পাইত তাহা নহে—পরিবারের ক্রিয়াকর্ম্মেও তার দাবি কম ছিল না। সেই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম পালপার্ব্বন আত্মীয় প্রতিবেশী অনাহূত রবাহূত সকলকে লইয়া। তখন জিনিষপত্র সস্তা, চালচলন সাদা, এই জন্য ওজন যেখানে কম আয়তন সেখানে বেশি হইলে অসহ্য হইত না।

এদিকে সময় বদ্‌লাইয়াছে কিন্তু সমাজের দাবি আজো খাটো হয় নাই। তাই জন্মমৃত্যুবিবাহ প্রভৃতি সকল রকম পারিবারিক ঘটনাই সমাজের লোকের পক্ষে বিষম দুর্ভাবনার কারণ হইল। এর উপর নিত্যনৈমিত্তিকের নানাপ্রকার বোঝা চাপানোই রহিয়াছে।

এমন উপদেশ দিয়া থাকি পূর্ব্বের মত সাদাচালে চলিতেই বা দোষ কি? কিন্তু মানবচরিত্র শুধু উপদেশে চলে না,—এ ত ব্যোমযান নয় যে উপদেশের গ্যাসে তার পেট ভরিয়া দিলেই সে উধাও হইয়া চলিবে। দেশকালের টান বিষম টান।

যখন দেশে কালে অসন্তোষের উপাদান অল্প ছিল, তখন সন্তোষ মানুষের সহজ ছিল। আজকাল আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে ঐশ্বর্য্যের দৃষ্টান্ত অনেক বেশি বড় হইয়াছে। ঠিক যেন এমন একটা জমিতে আসিয়া পড়িয়াছি যেখানে আমাদের পায়ের জোরের চেয়ে জমির ঢাল অনেক বেশি,—সেখানে স্থির দাঁড়াইয়া থাকা শক্ত, অথচ চলিতে গেলে সুস্থভাবে চলার চেয়ে পড়িয়া মরার সম্ভাবনাই বেশি।

বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য্য ছাতা জুতা থেকে আরম্ভ করিয়া গাড়ি বাড়ি পর্য্যন্ত নানা জিনিষে নানা মূর্ত্তিতে আমাদের চোখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে,—দেশের ছেলেবুড়ো সকলের মনে আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিমুহূর্ত্তে বাড়াইয়া তুলিতেছে। সকলেই আপন সাধ্যমত সেই আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী আয়োজন করিতেছে। ক্রিয়াকর্ম্ম যা কিছু করি না কেন সেই সর্ব্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রাখিয়া করিতে হইবে। লোক ডাকিয়া খাওয়াইব কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেকার রসনাটা এখন নাই একথা ভুলিবার জো কি!

বিলাতে প্রত্যেক মানুষের উপর এই চাপ নাই। যতক্ষণ বিবাহ না করে ততক্ষণ সে স্বাধীন, বিবাহ করিলেও তার ভার আমাদের চেয়ে অনেক কম। কাজেই তার শক্তির উদ্বৃত্ত অংশ অনেকখানি নিজের হাতে থাকে। সেটা অনেকে নিজের ভোগে লাগায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ যে-হেতুক মানুষ এই জন্য সে নিজেকে নিজের মধ্যেই নিঃশেষ করিতে পারে না। পরের জন্য খরচ করা তার ধর্ম্ম। নিজের বাড়তি শক্তি যে অন্যকে না দেয়, সেই শক্তি দিয়া সে নিজেকে নষ্ট করে, সে পেটুকের

মত আহারের দ্বারাই আপনাকে সংহার করে। এমনতর আত্ম-ঘাতকগুলো পয়মাল হইয়া বাকি যারা থাকে তাদের লইয়াই সমাজ। বিলাতে সেই সমাজে সাধারণের দায় বহন করে, আমাদের দেশে পরিবারের দায়।

এদিকে নূতন শিক্ষায় আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠিতেছে যেটা একালের জিনিষ। লোক-হিতের ক্ষেত্র আমাদের মনের কাছে আজ দূরব্যাপী—দেশবোধ বলিয়া একটা বড় রকমের বোধ আমাদের মনে জাগিয়াছে। কাজেই বন্যা কিম্বা দুর্ভিক্ষে লোকসাধারণ যখন আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তখন খালি-হাতে তাকে বিদায় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু কুল রাখাই আমাদের বরাবরের অভ্যাস, শ্যাম রাখিতে গেলে বাধে। নিজের সংসারের জন্য টাকা আনা, টাকা জমানো, টাকা খরচ করা আমাদের মজ্জাগত; সেটাকে বজায় রাখিয়া বাহিরের বড় দাবিকে মানা দুঃসাধ্য। মোমবাতির দুই মুখেই শিখা জ্বালানো চলে না। বাছুর যে গাভীর দুধ পেট ভরিয়া খাইয়া বসে সে গাভী গোয়ালার ভাঁড় ভর্ত্তি করিতে পারে না;—বিশেষত তার চরিয়া খাবার মাঠ যদি প্রায় লোপ পাইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে আমাদের ঐশ্বর্য্যের দৃষ্টান্ত বড় হইয়াছে। তার ফল হইয়াছে জীবনযাত্রাটা আমাদের পক্ষে প্রায় মরণযাত্রা হইয়া উঠিয়াছে। নিজের সম্বলে ভদ্রতারক্ষা করিবার শক্তি অল্পলোকের আছে, অনেকে ভিক্ষা করে, অনেকে ধার করে, হাতে কিছু জমাইতে পারে এমন হাত

ত প্রায় দেখি না। এই জন্য এখনকার কালের ভোগের আদর্শ আমাদের পক্ষে দুঃখভোগের আদর্শ।

ঠিক এই কারণেই নূতনকালের ত্যাগের আদর্শটা আমাদের শক্তিকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেছে। কেননা, আমাদের ব্যবস্থাটা পারিবারিক, আমাদের আদর্শটা সর্ব্বজনীন। ক্রমাগতই ধার করিয়া ভিক্ষা করিয়া এই আদর্শটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যেটাকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করিয়াছি সেটাকে ভালো করিয়া পালন করিতে অক্ষম হওয়াই চারিত্রনৈতিক হিসাবে দেউলে হওয়া। তাই, ভোগের দিক দিয়া যেমন আমাদের দেউলে অবস্থা, ত্যাগের দিক দিয়াও তাই। এই জন্যই চাঁদা তুলিতে, বড়লোকের স্মৃতি রক্ষা করিতে, বড় ব্যবসা খুলিতে, লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে গিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতেছি ও বাহিরের লোকের কাছে নিন্দা সহিতেছি।

আমাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা, চাষ করিয়া ফসল পাইতে কষ্ট নাই। এই জন্যই এমন এক সময় ছিল, যখন কৃষিমূলক সমাজে পরিবার বৃদ্ধিকে লোকবল বৃদ্ধি বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু এমনতর বৃহৎ পরিবারকে একত্র রাখিতে হইলে তাহার বিধিবিধানের বাঁধন পাকা হওয়া চাই, এবং কর্ত্তাকে নির্ব্বিচারে না মানিয়া চলিলে চলে না। এই কারণে এমন সমাজে জন্মিবামাত্র বাঁধা নিয়মে জড়িত হইতে হয়। দান ধ্যান পুণ্যকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই নিয়মে বদ্ধ; যারা ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকিবে তাদের মধ্যে যাতে কর্ত্তব্যের আদর্শের বিরোধ না ঘটে, অর্থাৎ নিজে চিন্তা না করিয়া যাতে একজন ঠিক

অন্ধজনের মতই চোখ বুজিয়া চলিতে পারে সেই ভাবের যত বিধিবিধান।

প্রকৃতির প্রশ্রয় যেখানে কম, যেখানে মানুষের প্রয়োজন বেশি অথচ ধরণীর দাক্ষিণ্য বেশি নয় সেখানে বৃহৎ পরিবার মানুষের বলবৃদ্ধি করে না, ভারবৃদ্ধিই করে। চাষের উপলক্ষ্যে মানুষকে যেখানে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিতে হয় সেইখানেই মানুষের ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ চারিদিকে অনেক ডালপালা ছড়াইবার জায়গা এবং সময় পায়। যারা লুটপাট করে, পশু চরাইয়া বেড়ায়, দূর-দেশ হইতে অন্ন সংগ্রহ করে তারা যতটা পারে ভারমুক্ত হইয়া থাকে। তারা বাঁধা-নিয়মের মধ্যে আটকা পড়ে না; তারা নূতন নূতন দুঃসাহসিকতার মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নূতন নূতন কাজের নিয়ম আপন বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত করে। এই চিরকালের অভ্যাস ইহাদের রক্তমজ্জার মধ্যে আছে বলিয়াই সমাজ-বন্ধনের মধ্যেও ব্যক্তির স্বাধীনতা যত কম খর্ব্ব হয় ইহারা কেবলি তার চেষ্টা করিতে থাকে। রাজা থাক্ কিন্তু কিসে রাজার ভার না থাকে এই ইহাদের সাধনা, ধন আছে কিন্তু কিসে তাহা দরিদ্রের বুকের উপর চাপিয়া না বসে এই তপস্যায় তারা আজও নিবৃত্ত হয় নাই।

এমনি করিয়া ব্যক্তি যেখানে মুক্ত সেখানে তার আয়ও মুক্ত, তার ব্যয়ও মুক্ত। সেখানে যদি কোনো জাতি দেশহিত বা লোকহিত ব্রত গ্রহণ করে তবে তার বাধা নাই। সেখানে সমস্ত মানুষ আপনাদের ইতিহাসকে আপনাদের শক্তিতেই গড়িয়া তুলিতেছে, বাহিরের দৈব বা বিধাতার মারকে তারা শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছে না। পুঁথি তাহাদের বুদ্ধিকে চাপা দিবার যত চেষ্টা করে তারা ততই তাহা

কাটিয়া বাহির হইতে চায়। জ্ঞান ধর্ম্ম ও শক্তিকে কেবলি স্বাধীন অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী করিবার প্রয়াসই তাদের ইতিহাস।

আর পরিবারতন্ত্র জাতির ইতিহাস বাঁধনের পর বাঁধনকে স্বীকার করিয়া লওয়া। যতবারই মুক্তির লক্ষণ দেখা দেয় ততবারই নূতন শৃঙ্খলকে সৃষ্টি করা বা পুরাতন শৃঙ্খলকে আঁটিয়া দেওয়াই তার জাতীয় সাধনা। আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসের সেই প্রক্রিয়া চলিতেছে। নীতিধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা আমাদের কৃত্রিম ও সঙ্কীর্ণ বাঁধন কাটিবার জন্য যেই একবার করিয়া সচেতন হইয়া উঠি অমনি আমাদের অভিভাবক আমাদের বাপদাদার আফিমের কৌটা হইতে আফিমের বড়ি বাহির করিয়া আমাদের খাওয়াইয়া দেয়, তার পরে আবার সনাতন স্বপ্নের পালা।

যাই হোক্, ঘরের মধ্যে বাঁধনকে আমরা মানি। সেই পবিত্র বাঁধন-দেবতার পূজা যথাসর্ব্বস্ব দিয়া জোগাইয়া থাকি এবং তার কাছে কেবলি নরবলি দিয়া আসিতেছি। এমন অবস্থায় দেশহিত সম্বন্ধে আমাদের কৃপণতাকে পশ্চিম দেশের আদর্শ-অনুসারে বিচার করিবার সময় আসে নাই। সর্ব্বদেশের সঙ্গে অবাধ যোগবশত দেশে একটা আর্থিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং সেই যোগবশতই আমাদের আইডিয়ালেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই পরিবর্ত্তন পরিণতি লাভ করিয়া সমস্ত সমাজকে আপন মাপে গড়িয়া না লয় ততদিন দোটানায় পড়িয়া পদে পদে আমাদিগকে নানা ব্যর্থতা ভোগ করিতে হইবে। ততদিন এমন কথা প্রায়ই শুনিতে হইবে, আমরা মুখে বলি এক, কাজে করি আর, আমাদের যতকিছু ত্যাগ সে কেবল বক্তৃতায় বচনত্যাগ।

কিন্তু আমরা যে স্বভাবতই ত্যাগে কৃপণ এত বড় কলঙ্ক আমাদের প্রতি আরোপ করিবার বেলায় এই কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব রক্ষা করিতে গিয়া এই বৃহৎ দেশের প্রায় প্রত্যেক লোক প্রায় প্রত্যহ যে দুঃসহ ত্যাগ স্বীকার করিতেছে জগতে কোথাও তার তুলনা নাই।

নূতন আদর্শ লইয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত টানাটানিতে পড়িয়াছি তার একটা প্রমাণ এই যে, আমাদের দেশের একদল শিক্ষক আমাদের সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছেন। গৃহের বন্ধন আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে ও শক্তিকে এমন করিয়া পরাহত করিয়া রাখে যে হিতব্রত সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সে বন্ধন একেবারে ছেদন করিতে হইবে এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। বর্ত্তমান কালের আদর্শ আমাদের যে-সব যুবকদের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে তারা দেখিতে পাই সেই আগুনে স্বভাবতই আপন পারিবারিক দায়িত্ববন্ধন জ্বালাইয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া যারা মুক্ত হইল তারা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিতে চলিয়াছে কোন্ পথে? তারা দুঃখের সমুদ্রকে ব্লটিং কাগজ দিয়া শুষিয়া লইবার কাজে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল "সেবা" কথাটাকে খুব বড় অক্ষরে লিখিতেছি ও সেবকের তক্‌মাটাকে খুব উজ্জ্বল করিয়া গিল্টি করিলাম।

কিন্তু ফুটা কলস ক্রমাগতই কত ভর্ত্তি করিব? কেবলমাত্র সেবা করিয়া চাঁদা দিয়া দেশের দুঃখ দূর হইবে কেমন করিয়া? দেশে বর্ত্তমান দারিদ্র্যের মূল কোথায়, কোথায় এমন ছিদ্র যেখান দিয়া সমস্ত সঞ্চয় গলিয়া পড়িতেছে, আমাদের রক্তের মধ্যে কোথায়

সেই নিরুদ্যমের বিষ যাতে আমরা কোনোমতেই আপনাকে বাঁচাইয়া তুলিতে উৎসাহ পাই না সেটা ভাবিয়া দেখা এবং সেইখানে প্রতিকার-চেষ্টা আমাদের প্রধান কাজ।

অনেকে মনে করেন দারিদ্র্য জিনিষটা কোনো একটা ব্যবস্থার দোষে বা অভাবে ঘটে। কেহ বলেন যৌথ কারবার চলিলে দেশে টাকা আপনিই গড়াইয়া আসিবে, কেহ বলেন ব্যবসায়ে সমবায় প্রণালীই দেশে দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। যেন এই রকমের কোনো-না-কোনো একটা প্যাঁচা আছে যা লক্ষ্মীকে আপনি উড়াইয়া আনে।

য়ুরোপে আমাদের নাজির আছে। সেখানে ধনী কেমন করিয়া ধনী হইল, নির্ধন কেমন করিয়া নির্ধনতার সঙ্গে দল বাঁধিয়া লড়াই করিতেছে সে আমরা জানি। সেই উপায়গুলিই যে আমাদেরও উপায় এই কথাটা সহজেই মনে আসে।

কিন্তু আসল কথাটাই আমরা ভুলি। ঐশ্বর্য্য বা দারিদ্র্যের মূলটা উপায়ের মধ্যে নয়, আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে। হাতটা যদি তৈরি হয় তবে হাতিয়ারটা জোগানো শক্ত হয় না। যারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া মিলিতে পারে তারা স্বভাবতই বাণিজ্যেও মেলে অন্য সমস্ত প্রয়োজনের কাজেও মেলে। যারা কেবলমাত্র প্রথার বন্ধনে তাল পাকাইয়া মিলিয়া থাকে, যাহাদিগকে মিলনের প্রণালী নিজেকে উদ্ভাবন করিতে হয় না, কতকগুলো নিয়মকে চোখ বুজিয়া মানিয়া যাইতে হয় তারা কোনোদিন কোনো অভিপ্রায় মনে লইয়া নিজের সাধনায় মিলিতে পারে না। যেখানে তাদের বাপদাদার শাসন নাই সেখানে তারা কেবলি ভুল করে, অন্যায় করে, বিবাদ করে,—সেখানে তাদের

ঈর্ষা, তাদের লোভ, তাদের অবিবেচনা। তাদের নিষ্ঠা পিতামহের প্রতি; উদ্দেশ্যের প্রতি নয়। কেন না চিরদিন যারা মুক্ত তারা উদ্দেশ্যকে মানে, যারা মুক্ত নয় তারা অভ্যাসকে মানে।

এই কারণেই পরিবারের বাহিরে কোনো বড় রকমের যোগ আমাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়া আজও সম্পূর্ণ সত্য হইয়া ওঠে নাই। অথচ এই পারিবারিক যোগটুকুর উপর ভর দিয়া আজিকার দিনের পৃথিবীতে আমাদের প্রাণরক্ষা বা মানরক্ষা প্রায় অসম্ভব। আমরা নদীতে গ্রামের ঘাটে ঘাটে যে নৌকা বাহিয়া এতদিন আরামে কাটাইয়া দিলাম, এখন সেই নৌকা সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। আজ এই নৌকাটাই আমাদের পরম বিপদ।

নৌকাটা যেখানে ঢেউয়ের ঘায়ে সর্ব্বদাই টলমল করিতেছে সেখানে আমাদের স্বভাবের ভীরুতা ঘুচিবে কেমন করিয়া? প্রতি কথায় প্রতি হাওয়ায় যে আমাদের বুক দুরদুর করিয়া ওঠে। আমরা নূতন নূতন পথে নূতন নূতন পরীক্ষায় চলিব কোন্ ভরসায়?

সকলের চেয়ে সর্ব্বনাশ এই যে, এই বহুযুগসঞ্চিত ভীরুতা আমাদিগকে মুক্তভাবে চিন্তা করিতে দিতেছে না। এই কথাই বলিতেছে তোমাদের বাপদাদা চিন্তা করেন নাই, মানিয়া চলিয়াছেন, দোহাই তোমাদের, তোমরাও চিন্তা করিয়ো না, মানিয়া চল।

তারপরে সেই মানিয়া চলিতে চলিতে দুঃখে দারিদ্র্যে অজ্ঞানে অস্বাস্থ্যে যখন ঘর বোঝাই হইয়া উঠিল তখন সেবাধর্ম্মই প্রচার কর আর চাঁদার খাতাই বাহির কর মরণ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অজানা

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দু'দিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা।
তার পরে তার খবর কি যে ধারিনে তার ধার গো,
তারপরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ।
সেই ত বাধায় সেই ত মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ,
এক-নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই ত মুক্তি,
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দ্দয়।
মানে না সে বুদ্ধিশুদ্ধি বৃদ্ধ-জনার যুক্তি,
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি।

ভাবিস্ বসে যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরবে ?
সেই কূলে কি এই তরী আর ভিড়বে ?
ফিরবেনা রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না ;
সেই কূলে আর ভিড়বে না।
সামনেকে তুই ভয় করেচিস ! পিছন তোরে ঘিরবে
এমনি কি তুই ভাগ্যহারা ? ছিঁড়বে বাঁধন, ছিঁড়বে !

ঘণ্টা যে ঐ বাজ্‌ল কবি, হোক্ রে সভাভঙ্গ !
জোয়ার-জলে উঠেছে তরঙ্গ !
এখনো সে দেখায় নি তার মুখ,
তাই ত দোলে বুক !
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ !

২৬ মাঘ
পদ্মাতীর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শরৎ

ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রৌঢ়। তার যৌবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ওদিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে। এখনো সব চুকিয়া যায় নাই কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার ঐ শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মত দেখাইতেছে; হায় রে, তোমার ঐ কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ঐ ভিজা পাতার বিবাগী হইয়া বাহির হওয়া! যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসরশয্যা তুমি রচিয়াছ। যা-কিছু ম্রিয়মান তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু গতস্যশোচনা তুমি তারই অধিদেবতা।"

কিন্তু এ শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়, আমাদের শরতের নীল চোখের পাঁতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্ত্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচি-গায়ের গন্ধের মত। আকাশে আলোকে গাছেপালায় যা-কিছু রং দেখিতেছি সে ত প্রাণেরই রং, একেবারে তাজা।

প্রাণের একটি রং আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি করা লাল নীল সবুজ হল্‌দে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রং নয়;

তা কোমলতার রং। সেই রং দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে। জন্তুর কঠিন চর্ম্মের উপরে সেই প্রাণের রং ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই সেই লজ্জায় প্রকৃতি তাকে রং-বেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মানুষের গা-টিকে প্রকৃতি অনাবৃত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল। প্রাণ জিনিষটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায়; অর্থাৎ যখন, যা আছে কেবলমাত্র তাই আছে, তার চেয়ে আরো-কিছুর আভাস নাই তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে, তখন লাল নীল সকল রকম রংই থাকিতে পারে কেবল প্রাণের রং থাকে না।

শরতের রংটি প্রাণের রং। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড় নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার, এই-হাসি, এই-কান্না। সেই হাসিকান্নার মধ্যে কার্য্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এম্‌নি হাল্কাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তার পায়ের দাগ-টুকু পড়ে না,—জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মত যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখে না।

ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিষ, হৃদয়ের জিনিষ নহে। প্রাণ জিনিষটা ছিপের নৌকার মত ছুটিয়া চলে তাতে মাল

বোঝাই নাই ; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসিকান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিষটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে,— তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মত নয়। যেমন ঝরণা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরণাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আট্‌কা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি চলি করে, বর্ষার মত সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায় শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশ-প্রাঙ্গণ হইতে তখন সভার আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর এক পার পর্য্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সেদিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে সেইজন্যই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরৎ বড় বড় গাছের ঋতু নয়, শরৎ ফসলক্ষেতের ঋতু। এই ফসলের ক্ষেত একেবারে মাটির কোলের

জিনিষ। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি দাদারা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, এই ইক্ষু, এরা যে ছোট, এরা যে অল্পকালের জন্য আসে, ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই দুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সূর্য্যের আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারের পানসত্রের মত—ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ ভরিয়া সূর্য্যকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া যায়—বনস্পতির মত জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই সব ছোটদের এই সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরটা শূন্য আকাশের নীচে হা-হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবি-দাওয়ার দলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, হে শরৎ, তুমি শিশিরাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গত এবং আগতের ক্ষণিক মিলনশয্যা পাতিয়াছ। যে বর্ত্তমানটুকুর জন্য অতীতের চতুর্দ্দোলা দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারি মুখচুম্বন করিতেছ, তোমার হাসিতে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

মাটির কন্যার আগমনীর গান এই ত সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছু দিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান

বাজিতে আর ত দেরী নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া,—তাকে ত ফিরাইয়া দিবার জো নাই;—হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ঐ পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্ব্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশমী রাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, "বসন্ত তার উৎসবের সাজ বৃথা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার পর পাতা খসিতে খসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে!"—তিনি বলিতেছেন, "ফাল্গুনের মধ্যে মিলন-পিপাসিনীর যে রস-ব্যাকুলতা তাহা শান্ত হইয়াছে, জৈষ্ঠ্যের মধ্যে তপ্ত-নিশ্বাস-বিক্ষুব্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লণ্ডভণ্ড অরণ্যের গায়ন সভায় তোমার ঝোড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের রুদ্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারি মৃত্যুশোকের বিলাপগান গাহিবে বলিয়া। তোমার বিনাশের শ্রী তোমার সৌন্দর্য্যের বেদনা ক্রমে সুতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিরূপ!"

কিন্তু তবুও পশ্চিমে যে শরৎ, বাষ্পের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে শরৎ, মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসি মুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাৎ আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া

আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড় উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, "তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধূয়া, তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টীকা টিপ্পনী

গত জ্যৈষ্ঠমাসের মানসী-পত্রিকাতে প্রকাশ যে, জনৈক তীর্থযাত্রী ৺কাশীধামে পদার্পণ করবামাত্র, এই সত্য আবিষ্কার করেছেন

সবুজ পত্র

যে—"যে পাদপে বিংশ শতাব্দীর বাংলায় 'সবুজপত্র' গজাইতেছে, সেই পাদপের মূল শতশতাব্দীর নিম্নতম স্তরে প্রোথিত,—যুগে যুগে কত সবুজপত্র তাহাতে গজাইয়াছে, পীতপত্রে পরিণত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার খবর কে রাখে?"

এ খবর অবশ্য কেউ রাখে না—কেননা, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির ঝরা-পাতার হিসেব রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং তা রেখেও কোন ফল নেই। শুষ্কপত্রের সুমুখে যাঁরা শ্রদ্ধাভরে জোড়হস্ত হয়ে থাকেন, তাঁদেরও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে সে পত্রের যদি কিছু মূল্য থাকে তো সে এই কারণে যে তা এককালে সবুজ ছিল। হরিতের স্মৃতি উদ্রেক করাতেই পীতের মাহাত্ম্য। সবুজপত্র যে কালবশে পীতপত্রে পরিণত হয় এবং অন্তিমে কালগ্রাসে পতিত হয় এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে তার সাক্ষাৎকারের জন্য কারও আর তীর্থযাত্রা করবার দরকার নেই। চোখ থাকলে ঘরে বসেই তার পরিচয় লাভ করা যায়। ভবিষ্যতে মৃত্যু আছে জেনে বর্ত্তমানে প্রাণ নিত্য নব-রাগে দেখা দিতে ভয় পায় না। তবে "যে পাদপে বিংশ শতাব্দীর বাংলায় সবুজপত্র গজাইতেছে তার

মূল যে শত শতাব্দীর নিম্নস্তরে প্রোথিত” এ কথা শুনে আমরা আশ্বস্ত হলুম। কেননা অনেকের ধারণা যে এ পত্র নোবেল প্রাইজের সঙ্গে সঙ্গে Ibsen-এর দেশ থেকে আনা হয়েছে। এরূপ সন্দেহ করবার অবশ্য কোনরূপ বৈধ কারণ নেই। যে দেশে ছমাস রাত আর ছমাস দিন সে দেশে পাতার রঙ সবুজ না হবারই কথা;—সম্ভবতঃ তা ছমাস নীল আর ছমাস পীত।

সে যাই হোক্, আমাদের দেশের সভ্যতার বট যে অক্ষয় বট তার একমাত্র কারণ এ নয় যে যুগে যুগে তার কোনও-না-কোনও শাখায় নব-কিশলয়ের আবির্ভাব হয়। এ বট যে অক্ষয় তার প্রধান কারণ এই যে—এই সনাতন বৃক্ষের গায়ে নানা দেশের নানা বৃক্ষের জোড়-কলম বসানো যায়। যুগে যুগে নব নব সত্য অঙ্গীকার করবার শক্তিতে হিন্দুর মন বঞ্চিত নয়। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী যদি কোনও নূতন সত্যকে মনে স্থান দিতে পেরে থাকে তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে বাঙ্গালীর আত্মা বলহীন নয় এবং বাঙ্গালীর জীবনও সম্ভবতঃ ফলহীন হবে না।

আসলে সত্য এই যে, আত্মার অক্ষয় বটের মূল কোনও দেশ-বিশেষের কোনও স্তর-বিশেষে প্রোথিত নয়—কাশীতেও নয় প্রয়াগেও নয়, কেননা এই বিশ্বই হচ্ছে সেই সনাতন বৃক্ষ—

“ঊর্দ্ধ মুলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বথঃ সনাতনঃ।

মানবাত্মা এই সনাতন অশ্বত্থের শাখামাত্র। এবং এই অসংখ্য শাখাসকল আপাতদৃষ্টিতে আকারে এবং বিস্তারে যতই পৃথক হোক না,—মূলতঃ এক। মানব-মনের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় একই

অনাদি রস সঞ্চারিত হচ্ছে, একই চৈতন্য নানা আকারে নানা বর্ণে বিকশিত হয়ে উঠছে এবং সকলের ভিতর একই প্রাণের বন্ধন আছে। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর বাংলার সবুজপত্রের আড়ালে যদি উনবিংশ শতাব্দীর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উঁকি মারে তাতে আক্ষেপের কোনও কারণ নেই।

তবে বাংলার সবুজপত্রের অন্তরে Ibsen-এর কোনও প্রভাব আছে কি না সে হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রশ্ন—এবং সে প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা অপারগ। কেননা Ibsen-এর সঙ্গে আমাদের কস্মিনকালেও বিশেষ পরিচয় ছিল না এবং বহুকাল যাবৎ ও ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আমাদের ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ভগ্নস্তূপের ভিতর তাঁর সমাধি হয়ে গেছে। ইউরোপে যে লেখকের অপমৃত্যু হয় তার প্রেতাত্মা যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘাড়ে চেপে বসে—এর প্রমাণ ত বঙ্গসাহিত্যে নিত্যই পাওয়া যায়। তাই বলে "সবুজপত্র" যে Ibsenism-এ ভরপুর—এ কথা আমরা স্বীকার করতে পারিনে। এমন কি Ibsen-এর নাটকেও Ibsenism-এর অস্তিত্ব আছে কি না সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ আছে। কেননা কোন দেশের কোন বড় লেখক কোনও Ism-এর বশীভূত নন। Ism হচ্ছে সমালোচকদের হাতেগড়া পদার্থ। যাঁদের কোনরূপ রসজ্ঞান নেই তাঁরাই সাহিত্য চুইয়ে এই ism নামক কষ নিষ্কাসিত করে সরস্বতীর মন্দিরের বহির্দ্বারে তারই কারবার করেন। এ কষ যদি "সবুজপত্রে"র শিরার ভিতর প্রবেশ করে থাকে ত সে যুগধর্ম্মের গুণে। কে না জানে যে স্বাধীনতার

আকাশবাণী আজকের দিনে বাতাসে ঘোষণা করে? "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কে আনে দেও"—এই বচনের দোহাই দিয়ে আমরা তা পাঠক-সমাজকে গ্রাহ্য কর্‌তে অনুরোধ কর্‌তে পারি।

সবুজপত্রের গল্প, কবিতা যে Ibsenism-এর কোঠায় পড়ে গেছে এ বিষয়ে সমালোচকেরা স্থিরনিশ্চিত। কিন্তু সাহিত্য আর্ট প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে উক্ত পত্রের মতামত যে কোন্ ism-এর অন্তর্ভূত—সমালোচকেরা আজও তা ঠাওর করে উঠতে পারেন নি। তাঁরা এই পর্য্যন্ত জানেন যে আমরা স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী—বস্তুতন্ত্রতার নয় এবং সেই কারণে আমরা "আনন্দ" "সৃষ্টি" ইত্যাদি কতকগুলি নামজাদা শব্দের অন্তরালে আমাদের অস্পষ্ট মনোভাব সকল লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করি। আমাদের ঐ মতামত সত্য হোক মিথ্যা হোক তা যে বিদেশী কিম্বা বিজাতীয় নয়—এর পরিচয় অলঙ্কারশাস্ত্রে পাওয়া যায়। নজির স্বরূপে নিম্নে মম্মটভট্টের মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:—

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং
হ্লাদৈকময়ীমনন্য পরতন্ত্রাম।
নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতি—
মাদধতী ভারতী কবের্জ্জয়তি॥

(কাব্যপ্রকাশ)

অন্বার্থ—

কবির সৃষ্টি ব্রহ্মার সৃষ্টির উপর জয়লাভ করে। কেননা ব্রহ্মার সৃষ্টি নিয়তিদ্বারা নিয়মিত, সুখদুঃখময়, পরমাণু-আদি উপাদান এবং কর্ম্মাদি-সহকারী-কারণ-পরতন্ত্র এবং ষড়্‌রসযুক্ত। অপর পক্ষে

কবির সৃষ্টি নিয়তির নিয়মমুক্ত, কেবলমাত্র আনন্দময়—কোনরূপ বাহ্যবস্তু কিম্বা বাহ্য ঘটনার অধীন নয় অতএব অনন্য-পরতন্ত্র এবং নবরসযুক্ত। এককথায় বস্তুতন্ত্রতা জড়জগতের ধর্ম্ম এবং স্বাতন্ত্র্য মনোজগতের।

দরিদ্র চারুদত্ত

ভাসের "দরিদ্র চারুদত্তের" সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে বহুদিন যাবৎ আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল, কেননা শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের পূর্ব্ব হতেই জানিয়ে রেখেছিলেন যে মৃচ্ছকটিক উক্ত নাটকের ভিত্তির উপরেই রচিত হয়েছিল। সম্প্রতি এই নাটকখানি আমার হস্তগত হয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, মৃচ্ছকটিকের সঙ্গে "দরিদ্র চারুদত্তের" আকারগত কোনও সাদৃশ্য নেই;—একখানি দশ অঙ্কের নাটক আর একখানি চার অঙ্কের। আমাদের মতে এরূপ হবার কারণ এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় ভাসের পূর্ণাবয়ব নাটকখানির আজও সাক্ষাৎ পাননি—যদিচ তিনি এ কথা স্বীকার করেন না। শাস্ত্রী মহাশয় ক এবং খ চিহ্নিত দুখানি হস্তলিখিত পুঁথি হতে "দরিদ্র চারুদত্তের" পাঠ উদ্ধার করেছেন। তিনি প্রধানতঃ খ পুস্তকের পাঠই অনুসরণ করেছেন, কেননা "ক" পুস্তক এত প্রমাদপূর্ণ যে তা নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু "ক" পুস্তকের যেটি সব চাইতে বড় ভুল কথা, সেইটি তিনি সত্য হিসেবে গ্রাহ্য করেছেন। সে কথা এই —"অবসিতং চারুদত্তম্"—অর্থাৎ এইখানেই চারুদত্তের শেষ হল। চতুর্থ অঙ্কের শেষে ভরতবাক্যের অভাব থেকেই শাস্ত্রী মহাশয়ের বোঝা উচিত ছিল, যে "দরিদ্র চারুদত্ত" ঐখানেই শেষ হয়

নি। তা ছাড়া মৃচ্ছকটিকের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে—তিনিই জানেন যে "হঞ্জে গেণ্‌হ এদং অলংকারএমং চারুদত্তং অভিরমিদুং গচ্ছম্‌হ"—এ কথা সে নাটকের শেষ কথা হতে পারে না।

"দরিদ্র চারুদত্তের" চতুর্থাঙ্কের অন্তে ঐ একই কথা আছে। "এহি ইমং অলঙ্কারং গহ্নিঅ অয্য চারুদত্তং অভিসরিস্সামো"। এ দুয়ের ভিতর যা কিছু পার্থক্য তা প্রাকৃতে। "ওলো এই গহনা পরে আমি অভিসার কর্‌ব"—দাসীকে সম্বোধন করে, নায়িকার এ উক্তিতে এ নাটকের সকল কথা ফুরোয় না বরং এ কথায় আশা দেয় যে এর পরেই গল্প জমে আস্‌বে। ঘটনা-চক্র অন্ততঃ কাব্যজগতে মাঝ-পথে আটকে যায় না—সে চক্র শেষটা হয় মিলন নয় বিয়োগে গিয়ে দাঁড়ায়; অন্ততঃ সব দেশের সেকেলে নাটকে তাই হত। তা ছাড়া অপর একটি কারণেও চতুর্থ অঙ্কে চারুদত্তের অবসান হওয়া আমার মতে অসম্ভব। এ নাটকখানি যদি চার অঙ্কে শেষ হত তাহলে মৃচ্ছকটিক দশ অঙ্ক হত না। এই দুই নাটকের প্রথম চার অঙ্ক মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে যিনি মৃচ্ছকটিককে নিজের রচনা বলে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন, কাব্যরাজ্যে তাঁর তুল্য চোর আর দ্বিতীয় নেই। তিনি "দরিদ্র চারুদত্ত" হতে ঘটনা, কথোপকথন, শ্লোকপ্রভৃতি সব অক্ষরে অক্ষরে চুরি করেছেন, এমন কি পাত্রপাত্রীদের নূতন নামকরণ কর্‌বার সাহসও তাঁর ছিল না। নায়ক সেই চারুদত্ত, নায়িকা বসন্তসেনা, বিদূষক মৈত্রেয়, চেটী রদনিকা—এক ভাসের সলজ্জক মৃচ্ছকটিকে শর্ব্বিলক নাম ধারণ করেছে; তার কারণ বোধ হয় মৃচ্ছকটিককার তাঁর গ্রন্থে লজ্জার নাম-গন্ধেরও

সংস্রব রাখতে চাননি। সুতরাং এ হেন গুণী যে স্বীয় প্রতিভা-বলে ছটি ছটি গোটা অঙ্ক রচনা করেছিলেন, প্রথম অঙ্কে যে সকল ঘটনার সূত্রপাত করা হয়েছে সেই সকল ঘটিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন,—এ হতেই পারে না। কবি শূদ্রক সম্ভবতঃ "দ্বিরদেন্দ্র-গতি, চকোরনেত্র, পরিপূর্ণেন্দুমুখ সুবিগ্রহ, দ্বিজমুখ্যতম, অগাধ-সত্ত্ব"—এ সবই ছিলেন। চোর কবি ত সুন্দর বলেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু শূদ্রক-নৃপ যে মৃচ্ছকটিক নামক প্রকরণের "চকার সর্ব্বং কিল"—এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। শূদ্রক যে "পরবারণ-বাহু-যুদ্ধ-লুব্ধ" ছিলেন এ কথা সহজেই বিশ্বাস হয়, কারণ কাব্যরাজ্যে তিনি যে বলের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে হচ্ছে বাহুবল। এ রাজ্যে তাঁর অপূর্ব্ব কীর্ত্তির যথার্থ নাম চুরি নয় ডাকাতী। এই রাজ-কবি দরিদ্র চারুদত্তের দেহে যে অতিরিক্ত গদ্যপদ্যাংশের যোজনা করে মৃচ্ছকটিককে অঙ্কে অঙ্কে প্রকরণভঙ্গ দোষে দূষিত করেছেন, আমার বিশ্বাস, খোঁজ করে দেখলে দেখা যাবে তাও শূদ্রকের স্বরচিত নয় কিন্তু চোরাইমাল। মৃচ্ছকটিকে প্রকাশ যে শূদ্রক দশদিন-সহিত শতাব্দ আয়ুলাভ করে, অন্তিমে অগ্নিপ্রবেশ করে-ছিলেন—সম্ভবতঃ এই চুরি পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে। সে যাই হোক, আমার ধ্রুববিশ্বাস দরিদ্র চারুদত্ত চার অঙ্কে অবসিত হয় নি। নাটকমাত্রেরই একটি পরমায়ু আছে যা অকালে খণ্ডিত হতে পারে না। অতএব শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তিনি মালায়লমের মঠে মঠে দরিদ্র চারুদত্তের খণ্ডিত অঙ্গের অনুসন্ধান করুন।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত “চণ্ডীদাসের পদাবলী” সাহিত্য-পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। “দরিদ্র চারুদত্ত” অঙ্গহীন বলে আমরা দুঃখ করেছি কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের “চণ্ডীদাসে” সে দোষ নেই, এ সংগ্রহ যদি কোন দোষে দুষ্ট হয় ত সে অতিকায়ত্ব। এ গ্রন্থে অনেকখানি মাল আছে—তবে তার কতটা খাঁটি আর কতটা বাজে বলা কঠিন। এই বাহুল্যের হেতু সম্পাদক মহাশয় নিজেই নির্ণয় করে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ—“আমি চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত যত পদ পাইয়াছি, বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করিয়া আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি”—এইরূপ বিনা বিচারে তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ করবার কৈফিয়ৎ স্বরূপে তিনি বলেনঃ—“আমি যে একজন খুব ভাল জহুরি এ বিশ্বাস আমার নাই। কষ্টিপাথরে কষিয়া খাঁটি সোনা ধরিয়া দিব, আর মেকি বাদ দিতে পারিবই, এমন স্পর্দ্ধা রাখি না।”

এমন স্পর্দ্ধা বোধ হয় কেহই রাখেন না, তবে চোখের আন্দাজ বলে একটা জিনিষ আছে যার সাহায্যে লোকে সোনা পিতলের পার্থক্য ধরতে পারে। রত্নপরীক্ষার জন্য অদ্যাবধি কোনওরূপ কষ্টিপাথর আবিষ্কৃত হয় নি, অথচ, কাচ থেকে মণির তফাৎ মানুষে নিত্যই করে থাকে, কেবল ঐ চোখেরই সাহায্যে। তিনি আরও বলেন যে “কোন্ গানটি চণ্ডীদাসের, কোন্‌টি নয়, অর্থাৎ কোন্‌টির ভিতর চণ্ডীদাসত্ব আছে আর কোন্‌টির ভিতর নাই এত বিচার করিবার শক্তি আমার নাই।”

এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন সাহিত্যের সংগ্রহকার মাত্রেই স্বল্পাধিক পরিমাণে পরীক্ষার দ্বারা, সাচ্চা ঝুঁটার ভেদ

নির্ণয় করতে বাধ্য। যিনি এ বিচারের দায় সম্পূর্ণরূপে এড়াতে চান—তিনি সম্পাদক নাম গ্রহণ কর্‌বার অধিকারী নন। যেমন রঙের বিচারে চোখ ভরসা, তেমনি গানের বিচারে কান এবং কবিতার বিচারে কান ও প্রাণ ভরসা। চোখ কান যে আমাদের নিত্য ঠকায় তা আমরা সকলেই জানি। সত্যাসত্যের বিচারে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অবশ্য সকল সময়ে গ্রাহ্য নয়। কেবলমাত্র কানের ও প্রাণের উপর নির্ভর করে, কোন্ গানটি চণ্ডীদাসের আর কোন্‌টি নয়, তা স্থির কর্‌তে গেলে, আমরা দু এক জায়গায় অবশ্য ভুল কর্‌ব, কিন্তু আগাগোড়া নয়। কেননা যে বস্তু নিয়ে বহুকাল ধরে নিত্য কারবার করা যায়, সে বিষয়ে মানুষের একটা instinct জন্মে যায়। আসল জহুরি সেই instinct-এর উপরেই নির্ভর করেন, কষ্টিপাথরের উপর নয়, কেননা নিকষের গায়ে সোনার রেখাও মানুষকে নিজের চোখ দিয়েই চিন্‌তে হয়।

যদিচ চণ্ডীদাসের চণ্ডীদাসত্ব কষে বার কর্‌বার মত কোনও কষ্টিপাথর আমাদের হাতে নেই, তবু এ কবির সঙ্গে আমাদের যে স্বল্প পরিচয় আছে, তার থেকেই আমরা ভরসা করে বল্‌তে পারি যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগসূচক যে সকল অপরিচিত পদ তাঁর গ্রন্থভুক্ত করেছেন, সম্ভবতঃ তার অনেক গুলিই চণ্ডীদাসের রচিত নয়। সুবলের বৃকভানু রাজার পুরীতে গমন, পঞ্চ-বালকের দশাবতারের অভিনয় প্রদর্শন, সুবলধৃত কৃষ্ণ-রূপ দর্শনে শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছাগমন, আহিরিণী-কর্ত্তৃক শ্রীমতীর ঝাড়ন্-ফুঁকন, তৎপরে সুবলকর্ত্তৃক রাজকুমারীর কর্ণে বিশ অক্ষরের কৃষ্ণমন্ত্রদান, এবং উক্ত উপায়ে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন, এই সকল

অদ্ভুত ব্যাপার যে সকল পদে বর্ণিত হয়েছে তা কখনই চণ্ডী-দাসের হাত থেকে বেরোয় নি। এ সকল পদের ভাষা চণ্ডীদাসের বাংলা নয়, তার চাইতে ঢের বেশি সংস্কৃত ঘেঁসা। এর থেকেই সম্পাদক মহাশয়ের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল যে ও-সব পদ. চণ্ডীদাসের লেখা কি না? তার পর এই রকম সব অপ্রকৃত ঘটনার প্রতি চণ্ডীদাসের যে তিলমাত্রও অনুরাগ ছিল, এর পরিচয় তাঁর পূর্ব্ব পরিচিত পদে আমরা পাই নি। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যের একটি কবিতায় চণ্ডীদাস বাজিকরের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সে বাজি লৌকিক বাজি—যে বাজির সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে—কিন্তু সুবলের দৌত্যে যে বাজির বর্ণনা আছে—সে হচ্ছে অলৌকিক বাজি। এইরূপ অলৌকিক ঘটনার সাহায্যে রাধিকার মোহ উৎপাদন করা কখনও চণ্ডীদাসের অনুমত হতে পারত না, কেননা তিনি জানতেন যে, এ জগতে আসল ইন্দ্রজাল হচ্ছে অন্তরের বস্তু—বাহিরের নয় এবং তিনি এ সত্যও জানতেন যে, রক্তমাংসের দেহধারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেই, পীরিতি বলিয়া এ তিন আখরের ত্রিশূল রাধার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, ঐন্দ্রজালিকের জাল-কৃষ্ণের দর্শনে নয়।

সে যাই হোক, উক্ত পদগুলি কোন হিসেবেই গ্রন্থমুখে স্থান পেতে পারে না। "সখী কেবা শুনাইল শ্যাম নাম"—এই ছত্রই চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম ছত্র, এই হচ্ছে বাংলার সাহিত্য সমাজের বদ্ধমূল সংস্কার। এ বিষয়ে বৈষ্ণব আলঙ্কারিক এবং ইংরাজি শিক্ষিতসম্প্রদায় উভয়েই সম্পূর্ণ এক-মত। পূর্ব্বোক্ত চিরাগত সংস্কারের উচ্ছেদসাধন করা সম্ভবপরও নয়, উচিতও নয়।

প্রথমে শ্যামের নাম শ্রবণ, পরে বিশাখাকর্ত্তৃক লিখিত পটে শ্যাম-মূর্ত্তি দর্শন, তৎপরে সাক্ষাদ্দর্শন, এই পারম্পর্য্যে রাধিকার পূর্ব্ব-রাগের ক্রমবিকাশের একটি ধারা পাওয়া যায়—যার সঙ্গে মানুষের মন সায় দেয়। সুতরাং আমাদের মতে, সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পদগুলি পরিশিষ্টে ফেলা উচিত ছিল। সম্পাদক মহাশয় বলেন—“এখন চণ্ডীদাসের নামের ছাপ দেখিলেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, বিচার করিয়া ত্যাগ করিবার সময় এখনও হয় নাই”—এ কথা আমরা স্বীকার করি। আমাদের বক্তব্য এই যে, যে পদে চণ্ডীদাসের নামের ছাপ আছে কিন্তু হাতের ছাপ নেই—সে পদকে প্রথম পর্য্যায়ে ভুক্ত করা সঙ্গত নয়। যে সকল উপেক্ষিত পদ এতদিন ঘরের কোণে গা ঢাকা দিয়ে ছিল সেগুলিকে টেনে বার করাতে আপত্তি নেই—কিন্তু তাদের স্বস্থান সাহিত্যের সদর নয়, মফঃস্বল।

সম্পাদক মহাশয় পদসম্বন্ধে যেমন “যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং” এই পদ্ধতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছেন, বানানসম্বন্ধে তা অক্ষরে অক্ষরে বিস্মরণ করেছেন। তিনি সজোরে বলেছেন—“আমি বানানগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছি”—এর কারণ তাঁর বিশ্বাস, তাঁর বই খোলবামাত্র, “ষখী কেবা যুনাইলে স্যামনাম” এই পদ আমাদের চোখে পড়লে আমরা তাঁকে গালি দিতুম। এ ভয় করবার কোনও কারণ নেই। ওপদ ওরূপে ছাপা হলে আমাদের চোখে নতুন লাগত বটে কিন্তু পড়তে কোনও বাধা হত না। বাঙ্গালীর রসনা ষত্বণত্ব হ্রস্বদীর্ঘের ভেদ স্বীকার করে না। সুতরাং যিনি যে ভাবেই লিখুন, আমরা একই ভাবে পড়ব। সকার

এবং ইকারের অদল-বদল করাতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই—কিন্তু অপর স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে শুদ্ধ করে নেওয়াতেই বিপদ আছে। প্রাচীন বাংলার বানান শুধরে নেওয়া অতি সহজ—কেননা অনেকের বিশ্বাস বানানের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করবার কষ্টিপাথর আছে এবং সে হচ্ছে সংস্কৃত; কিন্তু এ বিশ্বাস ভুল। বাংলা সংস্কৃতের অপভ্রংশ নয়, মাগধী প্রাকৃতের স্ববংশ সুতরাং সংস্কৃতের কষ্টিপাথরে কষে বাংলা কথার রূপ নির্ণয় করতে গেলে সে কথার উপর অত্যাচার করা হয়। যদি সম্পাদক মহাশয় পদবলীর বানান না শুধরে নিতেন, তাহলে আমরা অনেক বাংলা কথার প্রাকৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করতে পারতুম। সংস্কৃতের ছাঁচে ঢেলে বাংলা শব্দের আকৃতি ও প্রকৃতি নষ্ট করার নাম তাকে শুদ্ধ করা নয়। অনেক বাংলা কথার সংস্কৃত বানান প্রাকৃত ব্যাকরণের হিসেবে অশুদ্ধ বানান। দুঃখের বিষয় এই যে শুদ্ধ বাতিকগ্রস্ত লোকদের বিশ্বাস যে বাংলা ভাষার জাত না মেরে দিলে তাকে আর জাতে তোলা যায় না।

স্ত্রীশিক্ষা

আমরা শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পাইয়াছি তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। চিঠিখানি এই :—

একদল লোক বলেন স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে পুরুষের নানা বিষয়ে নানা অসুবিধা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামিসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত ইত্যাদি।

আবার আর একদল বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন খুবই আছে, কেননা আমরা পুরুষরা শিক্ষিত, আমরা যাহাদের লইয়া ঘর-সংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি।

দুই দলেই নিজেদের দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিচার করিতেছেন। নারীর যে পুরুষের মত ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে তাহা স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোনো উকিল স্বীকার করেন না। উকিলরা যে পক্ষ লইয়াছেন বস্তুত তাহা তাঁহাদের নিজেরই পক্ষ। মামলার নিষ্পত্তিতে যাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ তাঁহাদের কথা কাহারও মনে উদয় হয় না, এইটেই আশ্চর্য্য।

বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির

দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।

আবার যাঁরা স্ত্রীলোককে তাঁহাদের নিজের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন তাঁরা যেটুকু বিদ্যা স্ত্রীর জন্য উচ্ছিষ্ট রাখিতে চান তাহা হইতে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বের যথোচিত পুষ্টি আশা করা বাতুলতা।

যাঁহারা শিক্ষাদানে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সমভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাঁহারা সাধারণ পুরুষের পংক্তিতে পড়েন না; তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।

অতএব গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্ত্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।

কিন্তু যিনি এ কার্য্যে অবতীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত গতানুগতিক হইলে চলিবে না। সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। একথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী সামান্য ললনা নহেন, তিনি তাহার শঙ্কটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী, এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসার-পথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।

এই চিঠির মূল কথাটা আমি মানি। যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে,—শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে, তাহা নয়, জানিবার জন্যই।

মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিম্বা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানব-প্রকৃতিকেই দুর্ব্বল করি এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন একদল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন; যাহাতে দেখা যাইবে,— বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিম্বা নক্ষত্রলোকের নাড়ি-নক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড় বড় অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না, পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।

অথচ ইঁহাদের তর্কের যুক্তিটা এই যে, মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তাঁহাদের ভয়টা কিসের? পৃথিবীকে আমরা চ্যাপ্‌টা ভাবি কিন্তু তাহা গোল এ কথা জানিলে পুরুষের

পৌরুষ কমে না; তেমনি বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব নষ্ট হইবে এ কথা যদি বলি তবে বুঝিতে হইবে মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।

বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন এটা তাঁর একটা আশ্চর্য্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীব-লোকে এই যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুলমাষ্টার কিম্বা টেক্স্‌ট্‌বুক কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিম্বা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্য্য-প্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর বিধাতা এবং ইস্কুলমাষ্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদিবা কাণ্ট্‌ হেগেলও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে

ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে এ কথা মানিতে দোষ কি ?

মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে একদল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান।

এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পুরুষ আপন কর্ম্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছে কিন্তু মেয়েদের কর্ম্ম যেখানে, সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য্য বলিয়া মনে করেন না।

তাঁরা বলেন, পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই আনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বে পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না।

এতদিনের মানবের ইতিহাসে যদি এই কথাটাই সর্ব্ব দেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে, দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্দ্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে

পারিত না। কিন্তু আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব, দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে—এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিঁকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।

কিন্তু দায় আসিয়া পড়ে যখন স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ না হয়। সকল স্বামীকেই সকল স্ত্রী যদি স্বভাবতই ভালোবাসিতে পারিত তাহা হইলে কথাই ছিল না, তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ যতদিন সমাজ বলিয়া একটা পদার্থ আছে ততদিন মানুষকে অনেক বিষয়ে এবং অনেক পরিমাণে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে।

কিন্তু সেই নিয়ম সৃষ্টি করিবার সময় সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বভাবেরই অনুসরণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজ আপনিই এটা ধরিয়া লইয়াছে যে মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে এই দাবী করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে।—তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এইটেই তাদের আদর্শ।

এইজন্য মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই, সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে। যে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসিতে পারে নাই

তার সম্বন্ধেও তার ব্যবহারকে ভালোবাসার মাপকাঠিতেই মাপিতে হয়। সংসারকে সে ভালোবাসুক আর না বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে সেটা ভালোবাসার কষ্টিপাথর।

ভালোবাসার ধর্ম্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরবও তাহাতেই। যেটাকে আনুগত্য বলিয়া লজ্জা করা হইতেছে সেটা লজ্জার বিষয় হয়, যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে, কেবলমাত্র দায় থাকে। মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে। যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অবমাননা।

মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে—এই সুবিধাটুকু ধরিয়া অনেক স্বার্থপর পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে পুরুষ যথার্থ পৌরুষের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পীড়িত ও বঞ্চিত হইতে থাকে ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর কোনো দেশে আছে কিনা আমি সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের

চেয়ে অল্প নহে বরঞ্চ বেশি। এতকালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও দাসের হাতের খাটুনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অল্প লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ব্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানেনা, কাহার রথ টানিতেছে তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই সৌন্দর্য্য নাই। এই দাসত্বের বারো-আনা-ভাগ পুরুষের কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়; পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানবসমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু সংস্কার যতদূর পর্য্যন্তই যাক্ সৃষ্টির গোড়া পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে না এবং শেষ পর্য্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার "সঙ্কটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

BOUND BY BOSE & CO.
28, Girish Mu' ...
BHOWAL
3. 11. 66